শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন

ভূমিকা

সৌরীন ভট্টাচার্য

সংকলন

অভিজিৎ সেন
অনিন্দিত ভাদুড়ী

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

ভূমিকা

কেন লিখছি এই ভূমিকা? শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) আজকের পাঠকের কাছে বিস্মৃত লেখিকা বলে? সেই বিস্মৃতি ঘোচাবার অন্যতম উপায় ওঁর রচনা সংকলনের প্রকাশ। শৈলবালার বইপত্র দীর্ঘদিন ছাপা নেই বা ছিল না। কয়েক বছর আগে ওঁর শতবর্ষ উপলক্ষে 'শেখ আন্দু' উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সেই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণও যে খুব বেশি করে পাঠকের নজরে এসেছে তাও মনে হয় না। এবং শৈলবালা একালের পাঠকের কাছে আজো বেশ অপরিচিতই রয়ে গেছেন। এর জন্য অনেকাংশে দায়ী হয়তো এই সময়, হয়তো আমাদের পাঠ অভ্যাস। কারণ যাই হোক, কথাটা যেমনই শোনাক, মেনে নেওয়া ভালো যে আজকের পাঠকের মনে শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্য তেমন কোনো জায়গা নেই।

তাই যদি হয়, তাহলে ভূমিকা লেখার ভূমিকা কী? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের গবেষক-সম্পাদকেরা অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে আমাদের এমন কয়েকজন লেখিকার রচনা সংকলন ও সংগ্রহ পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন যাঁদের অনেকেই তাঁদের মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন বা হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। এর মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী কিংবা রাধারানী দেবীর মতো লেখিকাও আছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের পড়ার ধরনধারণে খুব কিছু পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করা শক্ত। এইসব লেখা পড়ার সময়ে আমাদের পাঠকসমাজ সাধারণভাবে এখনো পর্যন্ত এক ধরনের প্রশ্রয়-মেজাজে অভ্যস্ত। পাঠকের প্রত্যাশাও তৈরি হয় অনুরূপ একটা মেজাজের অনুষঙ্গে। ভাবি ঘর-গেরস্তালির কথা শুনব, সংসারে মেয়েদের উপর অবিচার-অবহেলার গল্প পড়ব। কারণ, আমাদের ওই মেজাজে 'মেয়েদের জগৎ' বলে এরকম একটা ব্যাপার বেশ খাপ খেয়ে যায়। মেয়েদের জগৎ যে জগতেরই অংশ, সে-জগতের বঞ্চনা-নির্যাতন, হিংসা-অত্যাচার-নিপীড়ন যে অন্দর-সদরের ভেদ তেমন মানে না, এসব কথা যুক্তিতে অনেক সময়ে গ্রহণ করলেও, মনে তেমন আমল দিই না। তাই মেয়েদের লেখা থেকে আমাদের প্রত্যাশা একটা ছোটো গণ্ডিতে দিব্যি আটকে যায়। আর কী পড়ছি, সে-পড়া থেকে কী কতটা পাচ্ছি তা এই প্রত্যাশা দিয়ে অনেকখানি নির্ধারিত হয়।

তা এইসব জটিলতা যদি থাকেই, তাহলে ভূমিকা লিখে তার কতটুকু কী করা যাবে? বা কতটা করার চেষ্টা সত্যিই উচিত হবে? ধরা যাক, শৈলবালা ঘোষজায়ার পঁচিশটি গল্পের এই সংকলন পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১৩২২ থেকে ১৩৭৯, অর্থাৎ সাতান্ন বছর সময়কালে ব্যাপ্ত রচনার একটা নমুনা পাঠকের হাতে দেওয়া হবে। বইটি প্রকাশের মুহূর্ত তো সমালোচনার মুহূর্ত হতে পারে না, সেটা উপস্থাপনার মুহূর্ত। উপস্থাপনা মুহূর্তের কথককে সংযমী হতে হয়, নইলে রচনা পড়ে

উঠবার আগেই পাঠকের বোধে ও বিচারে হস্তক্ষেপ করা হয়ে যায়। তাহলে সত্যিই কতটুকু বাকি থাকে ভূমিকাকথনের জন্য? শুধু পরিচয়? বিস্মৃত লেখককে শুধু পরিচিত করাবার দায়পালন? জীবনতথ্যের পরিচয়ে এক রকমের পরিচয় নিশ্চয় নিহিত থাকে। সে-পরিচয় অবশ্যই খুব জরুরি। আসলে যাপনেব ইতিহাসের সঙ্গে, তার ভাঁজে ভাঁজে লেখার ইতিহাস খুঁজে নেবার অভ্যেসটাই আমাদেব তেমন করে গড়ে ওঠেনি। আবার ওই কাজের নামে অনেক সময়ে এমন এক সরল বোধিনী প্রণয়ন গোছের কাণ্ড করে বসি আমরা যে তাও মনে হয় নিরর্থক। অথচ অন্তরঙ্গ বোধে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত লেখার মধ্যে পড়তে শিখলে পাঠক হিসেবে আমরা লাভবান হতে পারি।

শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখালেখির কথায়, এ কথা অবশ্যই খেয়াল করা দরকার যে, তিনি লেখা থেকে রোজগার করতেন। এবং যতটুকুই হোক সে রোজগারের তাঁর খুবই প্রয়োজন ছিল। অসুস্থ মানসিক রোগগ্রস্ত স্বামীর চিকিৎসার ভার তাঁকে সামলাতে হত। লেখা তাঁর কাছে অবশ্যই শুধু সময় কাটাবার ছল নয়, তা হয়তো কোনো লেখকের জন্যই নয়, কোনো লেখার জন্যই তা নয়। লেখা পর্যন্ত একটা কথাকে নিয়ে যেতে গেলে অন্য অনেক কাজ থেকে সময় বাঁচিয়েই তবে যেতে হয়। আর শৈলবালা ঘোষজায়ার পক্ষে সে কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। তাঁকে ভাত জ্বাল দেওয়া, কুটনো কোটা ইত্যাদি কাজের থেকে সময় করে নিয়ে তবে লেখার খাতায় হাত দিতে হত। এর জন্য অন্য কোনো টান চাই, অন্য কোনো দায়ের উস্কানি লাগে। এ সবের হাত ধরেই তবে একজন লেখক/লেখিকা লেখার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন। কোনো লেখককে চিনতে গেলে সেই লেখকের দায়ের ধরনটাকে ছুঁতে হয়। বর্তমান সংকলনের গল্পগুলো থেকে সে-ধরনটা ছোঁয়া যেতে পারে। বস্তুত, যাঁরা শৈলবালা ঘোষজায়া বলতে প্রধানত 'শেখ আন্দু' বোঝেন বা হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির কথা ভাবেন, তাদের জন্য এ সংকলনে লেখিকার অচেনা এক পরিচয় ধরা থাকবে।

শৈলবালার গল্প বলার ধরনের মধ্যে এমন একবকমের শিল্পহীনতার চাল আছে যা চোখে পড়ার মতো। মনেই হয় না কোনো গল্প সাজানো হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাবার ছল যেন। কিংবা সারাদিনের কাজের শেষে অবসর বেলায় সমবয়সীদের মজলিসে। চেনা মানুষের মধ্যে চেনাজানা সব মানুষের গল্পের ঝাঁপি একেবারে উপুড় করে ধরা। অনেক গল্পেই বেশ একটা শাদা-কালো ধরন আছে। খটকা লাগতেই পারে। নিষ্ঠুরতা, শঠতা, অত্যাচারের ফন্দি আঁটা ইত্যাদি ব্যাপার যেখানে আছে, সেখানে তা এত স্পষ্ট করে, এত পূর্ণ মাত্রায় আছে যে, মনে হতেই পারে লেখিকা এতে করে সত্যিই কতটুকু ঘরে তুলতে পারছেন। আসলে এত নিরাভরণভাবে সে গল্পগুলো বলা আছে যে প্রত্যয় জন্মাতে অসুবিধা হয় না। সংসারে অন্যায়-অবিচার যেভাবে যত স্পষ্ট করে ঘটে, তার প্রকাশের জন্য এই শাদা-কালো ছক অবশেষে মনে হয় সত্যিই বুঝি কার্যকর।

সরল গল্প বলার খুব সহজ একটা ভঙ্গি আমরা পাই 'ননী খানসামার ছুটি যাপন'

গল্পে। বলতে গেলে প্রায় কিচ্ছু নেই এই গল্পে, প্রায় কিছুই ঘটে না, নিতান্ত সাধারণ জীবনযাপনের ছবি। স্নেহনিবিড় সম্পর্কের দুই ভাই, ছোটো ভাইয়ের বৌদি, মা, এই নিয়ে সংসার। বড়ো ভাই বিদেশে মনিবের কাছে কাজ করে, ছোটো ভাই দেশের বাড়িতে চাষবাস করে। ছোটো ভাইয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে, বৌ এনে ঘরে যে তুলবে, তার জন্য সুবিধেমতো ঘরও নেই বাড়িতে। দুদিনের ছুটি কাটাতে বাড়ি আসে ননী, আবার ফিরে যায় তার কাজে। ছোটো ভাইয়ের জন্য যে ঘর তুলে দিয়ে গেল, এমনকী তাও নয়। তাই বলছিলাম কিছুই ঘটে না এখানে। ছবি, নিতান্ত ছবি। এটাকেই বলছিলাম শিল্পহীনতার চাল।

এই চালের মধ্যে থেকে শৈলবালা কিন্তু বেশ কিছু আদায় করে নিয়েছেন, হয়তো নিজেরও অজান্তে। 'ননী খানসামার ছুটি যাপন'-এ এমনকী একটুও বাঁকাচোরা কথাও নেই, কোনো খোঁচা নেই, কোনো তির্যক উক্তি নেই। ওই শিল্পহীনতার চালের মধ্যে এখন একটু একটু করে এসব জিনিস ঢোকাতে পারলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে। এর অনেক নিদর্শন আছে এই সংকলনে। 'বিজয়ার নমস্কার' বলা যায় এই ধারার মধ্যমণি। এক অসহায় বিধবার কাহিনী। প্রায় ওই শাদা-কালো ছ'কে সাজানো বলে মনে হবে। ভদ্রমহিলার নামই ব্যথা। এককালে নাম ছিল ব্যথাহারিণী। অনেকগুলি সন্তানের অকালমৃত্যুর পরে এই বেঁচে-যাওয়া মেয়েটির ওই নাম রাখা হয়েছিল। কিন্তু ব্যথা তার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে গেল। বিয়ে হয়েছিল বড়ো গৃহস্থ ঘরে। সে ঘরে গিয়ে ব্যথার এ কথা বুঝে নিতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি : "তাঁহাদের মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুণ্যবান এ পৃথিবীতে কেউ নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এক দিকে তাঁহারা যেমন ঘোরতর ব্যস্ত বিব্রত—অন্যদিকে ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা ও সুরা পানে তাহারা তেমনি পরম পটু।" ব্যথা এ পরিবারে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। "সে এক পাশে জড় সড় হইয়া, সকলের অবজ্ঞার পাত্রী 'গোবেচারী' হইয়া দিন গুজরাণ করিতে লাগিল।"

পরিবারে একদিন আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিল। পারিবারিক ব্যাবসার সংকট ও মামলা মোকদ্দমার পথে যখন প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থা তখন ছলে বলে জোর করে চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে ব্যথাকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে ব্যথা এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের গলগ্রহ। যা হয়, সে-বাড়ির 'দাসীবৃত্তি'তে তার দিন কাটে। কিন্তু ব্যথা লেখে। এখানেই তার জিত। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও ব্যথা লেখে, হাসির কবিতা লেখে। তা দু-এক জায়গায় ছাপাও হয়। এক পত্রিকার অভিজাত সম্পাদিকা ব্যথাকে তাঁর কাগজে লেখার অনুরোধ জানান, বাড়ি বয়ে এসে পাঁচটা টাকা অগ্রিমও দেন। 'অনাত্মীয়' ওই আত্মীয়দের কাছে তা অসহ্য। শেষমেশ এই নিরাশ্রয় থেকে ওই সম্পাদিকা অসুস্থ ব্যথাকে নিজের কাছে নিয়ে চলে যান। ব্যথা লেখার রাস্তায় জীবনের পথে ফেরে, মৃত্যুলগ্ন থেকেও। এই শাদা-কালো ছকের গল্পে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মিশেল তো চোখে পড়বেই। উপরন্তু শৈলবালার আরো একটা অপ্রত্যাশিত লক্ষণও আমরা এই গল্পে টের পেয়ে যাই। তা হল চণ্ডতা, ভায়োলেন্স। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার

আগে ব্যথা অবশ্যই বিধবা হয়েছিল। কীভাবে? পারিবারিক আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভাইয়ে ভাইয়ে বচসা ও পরিণতিতে একেবারে মারামারি। "ছোট ভাই এক 'ক্যাঁচা' আনিয়া ব্যথার স্বামীর কাঁধে আঘাত করিল। ব্যথার স্বামী এক ধারালো কাটারীর আঘাতে ছোট ভাইয়ের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। বড় ভাই কাটারী কাড়িয়া ব্যথার স্বামীর পা জখম করিয়া দিল।" ওই জখমের ঘা বিষিয়ে ব্যথার স্বামী মারা যায়। মাত্র তিনটি নিরলঙ্কার বাক্যের এই ভায়োলেন্স বাংলা গল্পের জগতে খুব চালু ব্যাপার নয়। এ জিনিস শৈলবালা কোথায় পেয়েছিলেন?

ভায়োলেন্স ব্যবহারের আরো বড়ো নজির 'লাফো'। আশ্চর্য এক সমাপতন। ব্যথার গল্পের সঙ্গে লাফোর গল্পের যোগ রয়েছে বিজয়া দশমীতে। বিজয়া দশমীর বিষণ্নতা তো আছেই। উপরন্তু, অত আদরের মূর্তি অমনি করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মধ্যে কি একটা প্রচণ্ডতার আভাস রয়ে গেছে? রুগ্ন ব্যথাকে যেদিন 'আনন্দ' পত্রিকার সম্পাদিকা ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁর কাছে নিয়ে চলে যান সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। গল্পের শেষ লাইনে ব্যথা ভদ্রমহিলাকে বিজয়ার নমস্কার জানিয়েছিল। তার তো দেবার আর কিছু ছিল না। আর 'লাফো' গল্পের শুরু, "সেদিন বিজয়া দশমী।" এ গল্পের কথক পাঁচ বছর যাবৎ রেঙ্গুনের বাসিন্দা। ঠিকাদারি তাঁর কাজ। কাজের উপলক্ষেই নানারকম লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও চেনা পরিচয়। স্থানীয় বাসিন্দা লাফোও তেমনি একজন। তবে লাফো কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। লোকে বলে 'পাগলা লাফো'। লাফো ঘাটের পাশের দেবদারু গাছে ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দেয়। কেন? বিজয়া দশমীর এক রাত্রে গল্পের কথকের কাছে লাফো তার গল্প বলে। লাফো রেঙ্গুনবাসী, কিন্তু সে মোটেই মগ নয়। সে বাঙালি। তার আত্মকথনে সে জানিয়ে দেয় : "বাবু সাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতাম, তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া—ঐ গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে—সে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।"

লাফো নিজের মা-বাবাকে দেখেনি। কাকার যত্নে সে মানুষ হয়। তাদের বাড়ি ছিল বাঁকুড়ার সোনাগঞ্জে। সে গ্রামের জমিদার রায়বাবুদের নায়েব ছিলেন লাফোর কাকা। লাফোর বাইশ বছর বয়সের সময়ে তিনি সে চাকরি ছেড়ে বাড়িতে চলে আসেন। জমিদারি দুই তরফে ভাগ হয়ে গেছে। কাকার আর সেখানে থাকতে মন চায়নি। ইতিমধ্যেই লাফোর তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন, একবার নয়, দু-দুবার। তার অদৃষ্টে কোনো বউই বেশিদিন বাঁচেনি। অল্প কিছু লেখাপড়া সে শিখেছিল। কিন্তু বিশেষ কিছুই কাজকর্ম করত না লাফো। কাকার অবসরের পরে রায়বাবুদের ছোটো তরফের ডাকে কাকারই ইচ্ছাক্রমে লাফো সেখানে গোমস্তার চাকরি নেয়।

এই কাকার দুই ছেলেমেয়ে। বড়ো ভাই শঙ্কর, লাফোর থেকে সাত বছরের ছোটো, আর ছোটো বোন শোভা দাদার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোটো। এই শঙ্করকে লাফো প্রাণাধিক ভালোবাসত, আর সেও ছিল তার একান্ত অনুগত। কাকা একদিন মারা গেলেন। লাফো

ছোটো বোন শোভার বিয়ে ঠিক করল। ইতিমধ্যে লাফো রায়েদের ছোটো তরফের কাজ ছেড়ে দিয়ে দু-ক্রোশ দূরের কুসুমপুরের দে বাবুদের জমিদারিতে কাজ নিয়েছে। পাশাপাশি দুই জমিদারের বিবাদ তো ছিলই। আর লাফো একজনকে ছেড়ে আর একজনের কাছে কাজ নেওয়ায় সেই বিবাদ আরো বেড়ে গেল। তাকে নিয়ে দু-পক্ষে রীতিমতো টানাটানি শুরু হল।

লাফো সোনাগঞ্জের পাট চুকিয়ে দিয়ে কাকিমা ও ভাই বোনকে একেবারে তার কাছে কুসুমপুরে নিয়ে আসার সংকল্প করেছিল। কিন্তু এই সময় শোভার ভাবী শ্বশুর-মশাইয়ের মৃত্যু হয়। কালাশৌচের জন্য বিয়ে এক বছর পিছিয়ে যায়। দে বাবুদের জমিদারির মধ্যেই লাফো নিজের মতো ছোটো একটি বাড়ি তুলে নিয়েছে। আশ্বিনের পুজোর পর ত্রয়োদশীর দিন সে সবাইকে সোনাগঞ্জের থেকে নিয়ে আসবে বলে ঠিক করেছে। এই সময় বিপদ।

ত্রয়োদশীর আগের বিজযা দশমীর রাত। লাফো কিস্তি আদায়ে বেরিয়েছিল। পথে শঙ্করের মুখে খবর পায়, "রায়েদের ছোটবাবু দুইজন নীচ শ্রেণীর প্রজাকে টাকা খাওয়াইয়া বশ করিয়াছেন, শোভাকে তাহারা ছোট বাবুর বৈঠকখানায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।" লাফোর মাথায় আগুন জ্বলে। সে ছোটোবাবুকে খুন কববার জন্য ছোটে। শঙ্করও যেতে চায় সঙ্গে। লাফো তাকে বারণ করে। দরকারে মরতে ভয় পাবে না, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে সে শঙ্করকে সঙ্গে নেয়। ঘুমন্ত রাতে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে লাফো সোনাগঞ্জের ছোটোবাবুর শোবার ঘরে পৌঁছে যায়। ছোটোবাবু দুধের মতো ধবধবে বিছানায় নিদ্রিত। পাশে দুই শিশু পুত্র ও পত্নীও নিদ্রিত। "কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া সেই কাদাশুদ্ধ পায়ে লাফাইয়া পালঙ্কে উঠিলাম, নিদ্রিত ছোটবাবুর মাথায় এক পদাঘাত করিলাম।" ছোটোবাবুর বুকে লাফোর হাঁটুর চাপ, হাতের শাণিত ভোজালি শূন্যে তোলা। শিশুরা কাঁদছে, স্ত্রী 'ডাকাত', 'ডাকাত' বলে চিৎকার করায় শাগরেদ শঙ্কর সবলে তার মুখ চেপে ধরেছে। শূন্যে তোলা ভোজালি নেমে আসবে ছোটোবাবুর বুকে, কিন্তু "চমকিয়া চাহিয়া দেখি, সবলে শঙ্করের হাত ছাড়াইয়া পত্নী পতির বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুল মিনতিতে বলিতেছে, 'রক্ষা কব বাবা, সর্বস্ব দাও (?)—আমার সর্ব্বনাশ করো না'।"

কার অপরাধে সে কাব সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। ভোজালি সরিয়ে নিয়ে লাফো পালঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে পড়ে। চারিদিকে হইচই। শঙ্কর ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ে। লাফো তাকে জোর করে তীব্র তিরস্কারে বের করে নিযে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু শঙ্কব ক্রমেই মরণের ভয়ে অভিভূত, আর তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ছাদের থেকে লাফ দেবার শেষ চেষ্টাতেও লাফো যখন শঙ্করকে তাতিয়ে তুলতে ব্যর্থ, তখন : "আমার চোখে তখন জগৎ জুড়িয়া খুনাখুনীর মেলা বসিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতেছে, আমার রক্ত-লোলুপ চিত্তে এক রাক্ষসী যেন হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে শাণিত ভোজালী ধরিয়া, আমি চক্ষের নিমিষে তাহার স্কন্ধে বসাইয়া দিলাম।"

শঙ্করের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেই মাথার চুল সবলে মুঠো করে ধরে লাফো ছাদ থেকে লাফ দেয়। তারপর একদিন কী করে যেন সে এই নতুন মুলুকে পৌঁছে যায়। পরে মাথা যখন একটু ঠাণ্ডা হয় তখন সে 'এই নির্জন প্রান্তরে একলা ঐ দেবদারু গাছের তলায়' বসেছিল। এই গাছ তখন ছোটো। "আমার বাক্সে তখনো বস্ত্রাবৃত শঙ্করের মাথা। সেটাকে অনেক রাত্রে গাছের তলায় পুতিয়া ফেলিলাম। পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া জমিকে শক্ত করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দিলাম।"

কাকিমা যতদিন জীবিত ছিলেন লাফো তাঁকে শঙ্করের কুশল বার্তা জানিয়ে গেছে। শঙ্কর তার কাছে আছে, 'আপনারা ভাবিবেন না'। লাফো খুব ভুল তো বলেনি কিছু।

ভায়োলেন্স বলতে যদি সরাসরি মোকাবিলা করার চেষ্টা বুঝি কিংবা সামনাসামনি সমস্যার মুখোমুখি হওয়া, প্রতিকূল অবস্থায় রীতিমতো চড়াও হওয়া, তাহলে বলতে হয় শৈলবালার হাতে ভায়োলেন্স অন্য চেহারাতেও খেলা করে। 'বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল' গল্পে জবরদস্ত ডেপুটিবাবু হাকিম দেবীপ্রসাদকে শায়েস্তা করার গল্প পাই। আদালতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই মানুষটি মদ্যপ, ফুর্তি করতে এক গেলাসের বন্ধুদের নিয়ে বাগানবাড়িতে রাত কাটান। তাঁর গৃহিণীর বারণ শোনাটা তাঁর কাছে পৌরুষের অবমাননা। কিন্তু এই গৃহিণী শুধু নাকে কাঁদেন না। তিনি সরাসরি ডেপুটিবাবুর মোকাবিলা করতে জানেন। তার জন্য অনেক পথ জানা আছে তাঁর। স্বামী যাতে মদের আলমারি খুলতে না পারেন, সেজন্য জানলা দিয়ে চাবি ফেলে দিযে তিনি প্রতিবেশী গৃহিণীর কাছে তা গচ্ছিত রাখেন। হাকিম সাহেব হুঙ্কার দেন, "যা খুশি তাই করছ, জানো, তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব, রক্তাবক্তি করব, খুন করব।" এর উত্তরে হাতে একটা রুল তুলে নিয়ে গৃহিণী ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিতে পারেন, "যা পারো কর, কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি! আমি তোমার মাথাও ভাঙ্গব না, রক্তারক্তিও করব না, খুনও করব না, কিন্তু এই রুল ছুঁড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মারব যে, পনেরো দিন যেন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার!"

এর পরের শনিবারে ডেপুটিবাবু আদালত থেকে সরাসরি বাগানবাড়িতে চলে যান। বাড়ি ঘুরে যাবার ঝুঁকি নিতে তাঁর আর সাহসে কুলোয়নি। কোচম্যানকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন যে বাড়ি ফিরবেন না।

বাবুকে ফিরিয়ে আনবার জন্য গৃহিণী একটু আধটু ছল চাতুরি আশ্রয় নিয়ে যখন ব্যর্থ হলেন, তখন তিনি সরাসরি নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে বাগানবাড়িতে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাপের বাড়ির পুরোনো আমলের বিশ্বাসী দারোয়ান। বাগানের দারোয়ানকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বাবুকে ডেকে আনলেন। বাবুকে ফেরাবার এ চেষ্টাও ব্যর্থ হলে গৃহিণী সরাসরি নাচের আসরে যাবার উপক্রম করলেন এবং তর্জনী তুলে দারোয়ানকে বললেন, "তুমি আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁসিয়ার হয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চোলো, মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকো,—হুকুম দিয়ে রাখছি,

যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি চালিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সামলাবে তোমার ডেপুটি মনিব! বলে রাখছি, লাটসাহেবের নাতিই হোক, নাৎজামাই-ই হোক, কারুর খাতির কোরো না—চলো ঐ নাচের মজলিশে—!" এবার কাজ হল। কর্তাবাবু সভয়ে ইয়ারবন্ধুদের কাছে বিদায় নেবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে আসরের দিকে গেলেন। পাঁচ মিনিট পার না হতেই তিনি ফিরে এসে গাড়িতে উঠলেন। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ডেপুটিবাবু পরদিন বাগানবাড়িটাই ছেড়ে দিলেন।

এ গল্প দজ্জাল মহিলার হাসির নক্সাগল্প হতে পারত। ভায়োলেন্সের জোরে এ গল্পের জাত বদলে গেছে। এ আর হাল্কা হাসির খোরাক নয়।

আমাদের অনভ্যস্ত কোনো ছাঁদ কি চোখে পড়ে?

সেপ্টেম্বর, ২০০০ — সৌরীন ভট্টাচার্য

সংকলন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

১৯৭২ সালের ২৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে য়ুনিভার্সিটি উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে বিগতদিনের ছ'জন বর্ষীয়সী লেখিকাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হয়েছিলেন যথাক্রমে, গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী এবং শৈলবালা ঘোষজায়া। সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি পুস্তিকা (লেখিকাদের আলোকচিত্র-সহ) প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিকা-পরিচিতি লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দেবী। শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে পরিচিতিতে তিনি যা বলেছেন (এর প্রায় সব তথ্যই শৈলবালা স্বয়ং পত্রযোগে প্রেরণ করেছিলেন)—সেখান থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

'...শৈলবালা ঘোষজায়ার আত্মজীবনীর যে উপাদান উনি পাঠিয়েছেন তার কতটা বলা যাবে কে জানে। ইংরেজি ১৮৯৪ সালের ২রা মার্চ; বাংলা ১৩০০ সালের ১৯শে ফাল্গুন কক্সবাজারে ওঁর জন্ম। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের চাকরি করতেন। সরকারী কাজে ঘুরতে ঘুরতে কক্সবাজারে যান। ওঁদের আদি বাড়ি বর্ধমান। মা হেমাঙ্গিনী দেবী কোন্নগরের মেয়ে। পূজ্যপাদ শ্রীঅরবিন্দ হেমাঙ্গিনী দেবীর জ্ঞাতি ভ্রাতা।...

'১৩১৪ সালে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে ঘোষ পরিবারে লেখিকার বিয়ে হয়।...স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি পড়তেন। পাশ করবার পর মাত্র আড়াই তিন বছর প্র্যাকটিস করবার পরই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। উন্মাদ রোগে দশ বছর ভুগে তিনি মারা যান।...

'শৈশবে ও বাল্যে শৈলবালা বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন।* পরবর্তী জীবনে শিক্ষা পান পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত হৃদয়ে সাহিত্য চর্চায় মন দেন। পাবিবারিক প্রতিবেশ অনুকূল ছিল না। লুকিয়ে রাত জেগে লিখতেন। এই সময়ই "শেখ আন্দু" লিখে স্বামীর হাত দিয়ে সেটি "প্রবাসী" অফিসে পাঠান ১৩২১ সালে। "প্রবাসী" বেশ কিছু সম্মান দক্ষিণা দিয়ে সেটি গ্রহণ করেন। ১৩২২ সালে "প্রবাসী"তে সেটি প্রকাশিত হয়।...তখনো স্বামী সুস্থ। তাঁর ছাত্রাবস্থাও কাটেনি।

'এই সময় কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ওপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে "সরস্বতী" উপাধি পান। সাহিত্য চর্চার জন্য নদীয়ার "মানদ মণ্ডলী" অযাচিতভাবে লেখিকাকে "সাহিত্য ভারতী" ও "রত্নপ্রভা" উপাধি দেন।...

'১৩২৬ থেকে লেখিকার জীবনে যে সংগ্রাম শুরু হয় তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর জীবন ছিন্নভিন্ন করে দেয়।...বাসস্থান, ব্যক্তি জীবন সবই বারবার বিপন্ন হয়। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনি মর্মস্পর্শী।...

* বালিকাবয়সে বিদ্যালয়ের স্মৃতি বর্ণিত আছে সংকলনভুক্ত 'পাঠশালার স্মৃতি' নামক আলেখ্যটিতে।

'"প্রবাসী" পত্রিকাকে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ গুরু বলে অভিহিত করেছেন। শৈলবালা ঘোষজায়ার আটাশিটি গ্রন্থের নাম আমার সামনে আছে। তিনি জানিয়েছেন বহু অপ্রকাশিত উপন্যাস, মাসিক পত্রে প্রকাশিত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস, আত্মজীবনী ও ছোট গল্প তাঁর কাছে আছে। বিস্তৃত আত্মজীবনীটি কোন প্রকাশক প্রকাশ করলে শৈলবালা খুশি হতেন। বইয়ের সংখ্যা ৫২/৫৩ হলেও সব বইয়ের নাম আজ আর তাঁর স্মরণে নেই।'

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল। শৈলবালা ঘোষজায়ার নাম বিস্মরণপ্রিয় আমাদের কাছে আজ আর ততটা সুপরিচিত বা প্রয়োজনীয় নয়। তাঁর ওপরে লেখা বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা এবং দু'একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্রের অংশবিশেষ ছাড়া বিশেষ কিছুই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়নি। তাঁর জন্মশতবর্ষে (১৯৯৪/১৪০১ব.) অন্তরঙ্গ প্রকাশনা থেকে 'শেখ আন্দু' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এবং শ্রদ্ধাভাজন শ্রীশিবনারায়ণ রায় এই নতুন সংস্করণের একটি সময়োচিত মুখবন্ধও লিখেছেন, তবুও বিস্মৃতির অতল থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়ত সম্ভবপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশাতেই তিনি হাল আমলের বাঙালি পাঠকমনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) অধুনালুপ্ত 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য অনেক খবরের ভিড়ে মিশে যাওয়া সংবাদকণাটি সেই সার্বিক বিস্মরণের পরিচয়ই বহন করে :

গত ২৯ সেপ্টেম্বর 'সাহিত্যিকা'র উদ্যোগে শৈলবালা ঘোষজায়ার স্মরণে একটি আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। কলকাতা তথ্যকেন্দ্র-এ অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় শ্রীলীলা মজুমদার ও মহাশ্বেতা দেবী ভাষণ দেন। ('অমৃত', ১৪ বর্ষ : ২৪ সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর, ১৯৭৪)

আশ্চর্যের বিষয়, 'দেশ'-এর মতো জনপ্রিয়, উচ্চাঙ্গের একটি সাহিত্যপত্রিকায় শৈলবালা ঘোষজায়ার প্রয়াণ-সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদনই প্রকাশিত হয়নি। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে (১৯৭৫) প্রয়াত বাণী রায়ের পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী রামায়ণী প্রকাশ ভবন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস বা ছোটগল্প সংকলনের কোনো পরিকল্পনা এই সময়ে হয়েছিল কিনা জানা যায় না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মৃত্যুর পরে তাঁর গল্পের নির্বাচিত একটি সংকলন প্রকাশের প্রয়াস এই প্রথম (যদিও তাঁর জীবদ্দশায় ১০টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। দ্র. গ্রন্থপঞ্জি)। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় শৈলবালার বইয়ের সংখ্যা দেওয়া আছে ৫২/৫৩, যদিও, তিনি বলেছেন, 'সব বইয়ের নাম আজ আর তাঁর স্মরণে নেই।' শৈলবালা ঘোষজায়ার গ্রন্থপঞ্জি অংশে আমরা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও ২২টি উপন্যাস, ৯টি ছোটগল্পের সংকলন, ১টি নাটক, এবং ২টি শিশুসাহিত্যের বইয়ের নাম উদ্ধার করতে পেরেছি, অনেকের সঙ্গে মিলিতভাবে লেখা একটি বারোয়ারি উপন্যাসের নামও এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ মোট ৩৫টি বইয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে। প্রদত্ত এই তালিকাটি কখনই সম্পূর্ণ নয়, কিছু বইয়ের নাম বাদ পড়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অসম্পূর্ণতার একটি প্রধান কারণ হল তাঁর লেখা বই এখন আর ততটা সহজলভ্য নয়। তাঁর পরিবারস্থ লোকেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও মাত্র দু'চারটে ছাড়া তাঁর

বিশেষ কোনো বই নেই। মহাশ্বেতা দেবী শৈলবালার লেখা অপ্রকাশিত একটি আত্মজীবনীর উল্লেখ করেছেন। শৈলবালা ঘোষজায়ার পরিবারের একাধিক সদস্যের কাছে প্রশ্ন করেও এই আত্মজীবনী-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পাওয়া গেলে এবং ভবিষ্যতে তা প্রকাশিত হলে বাংলা আত্মস্মৃতিমূলক রচনার ধারায় এটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসাবে গণ্য হবে।

বর্তমান সংকলনে গ্রন্থিত গল্পের সংখ্যা ২৫। প্রথম গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সংখ্যায় এবং তাঁর লেখা সর্বশেষ গল্প ওই একই পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৭৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। দুটি গল্পই সংকলনভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ঠিক কতসংখ্যক ছোটগল্প তিনি লিখেছিলেন তা জানা যায় না। নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত—কিছু গ্রন্থিত, কিছু-বা অগ্রন্থিত গল্পের মধ্যে প্রায় ৬০টির মতো হদিশ করা গেছে। ৩৫টির মতো গল্প আমরা বাদ দিয়েছি। যে-যে গল্পের প্রকাশতারিখ পাওয়া গেল মোটামুটি সেই অনুযায়ী কালানুক্রমিকতা বজায় রেখে গল্পগুলো গ্রন্থিত হয়েছে। 'দুই রূপ' ('বর্ষবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং 'ভোটযুদ্ধের জের' ('পূজারিণী' নামক সংকলনে প্রকাশিত) গল্পদুটির সন্ধান দিয়েছেন শ্রীমতী জয়ন্তী লাহিড়ী এবং ডঃ সুদক্ষিণা ঘোষ। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বানানের দিক দিয়ে মূলের অনুসরণ করা হয়েছে। শেষের দিকের কয়েকটি গল্প ব্যতীত অন্য কোথাও দ্বিত্ব বর্জন করা হয়নি। বর্তমান প্রেক্ষিতে গল্প হিসেবে এদের মূল্য কতটুকু সেই গ্রহণযোগ্যতার বিচার করবেন সমালোচক ও পাঠক। আমরা এই সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে শৈলবালা ঘোষজায়ার ভুলে যাওয়া গল্পগুলোকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছি এবং জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত শৈলবালার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। অন্যদের দৃষ্টি গল্পগুলোর প্রতি আকর্ষিত হলে আমাদের সামান্য প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

প্রকাশনা ও মুদ্রণ-ব্যাপারে আরও একবার আমরা শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবং শ্রীঅরিজিৎ কুমারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কাছে ঋণস্বীকার করছি। তাঁদের নিরলস উদ্যোগ ছাড়া ধারাবাহিকভাবে এইসব হারিয়ে যাওয়া লেখা অন্য কোনো প্রকাশক ছাপতে রাজি হতেন না। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্য তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় এবং অসুস্থ শরীর উপেক্ষা করে এই সংকলনের একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা রইল। কৃতজ্ঞতা জানাই চৈতন্য লাইব্রেরি ও হিরণ লাইব্রেরির কর্মীবন্ধুদের— তাঁরা শৈলবালা ঘোষজায়ার অনেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে। প্রবেশক চিত্রটি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন ড. সুদক্ষিণা ঘোষ। সংকলন ও সম্পাদনা-সম্পর্কিত বিচ্যুতির ব্যাপারে মনস্ক পাঠক তাঁর মতামত জানালে উপকৃত হবো।

২২শে শ্রাবণ, ১৪০৭ অভিজিৎ সেন
কলকাতা অনিন্দিতা ভাদুড়ী

সূচি

কর্পূরের মালা

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমার হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কুনুইয়ের ধাক্কায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদগ্রীব। যাত্রী পরিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদারদের হাঁকডাকে কানে তালা ধরিয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাৎলা ডিগডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ির ঠেলায় পিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌছিল।

ছবি আকুলক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার কথা শোনে? তাহার পানে কেহ ফিরিয়া তাকাইলও না।—আজ দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখিবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই; দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়,—সে স্বর্গ যদি বাহুবলের প্রভাবে, গুঁতাগুঁতির দ্বারা দুর্ব্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন বুদ্ধিমান তাহাতে ইতস্তত করে? কে এমন স্বার্থত্যাগী নির্ব্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ্য স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না! —আতঙ্ক-পীড়িতা বালিকার ক্ষীণ রোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

"কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমার—কেন কাঁদছ গা?" শ্যামবর্ণ, একহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদ্দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমলমূর্ত্তি, ছবির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদছ খুকি?—", চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়ী কটকীভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল; ছবি জলভরা বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চাহিল, আহা কি সুন্দর মমতাময় সরল মুখখানি। সদ্য শঙ্কিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবার স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্রপ্রশ্ন—।

সহসা পিছনের সজোর ধাক্কায়, সোলার পুতুলের মত ক্ষীণকায়া ছবি, ছিটকাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল,—ক্ষিপ্রহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বাম হাতের বেষ্টনে আগলাইয়া লইয়া, বিপুল বিক্রমে দক্ষিণ হস্তের অমিত প্রতাপে লোক ঠেলিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণ প্রাণপণে অন্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিজের ঘর্ম্মাক্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সরিয়া

দাঁড়াইল। লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি করুণা-কোমল কণ্ঠে সুধাইল, "কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি?"

থামিয়া থামিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ছবি বলিল, "আমার মা, মাসীমা, মেসোমশাই, ঝি—সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরে ছিলুম, তার পর মন্দিরে ঢুকে—", ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি? তোমাদের ছড়িদার কেউ নেই?"

"হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন—"

"তার নাম কি বল দেখি?"

"তা জানিনে, তার মাথায়, — ঐ তোমার মত চুল ছাঁটা নেই ত, — বড় বড় চুলে চুড়ো বাঁধা আছে।"

সরলা বালিকার এই অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দ্দেশে লোকটির মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল ; চারিদিকেই তো শত শত চূড়া-বাঁধা মাথা, তাহার মধ্য হইতে একটি চূড়া-চিহ্নিত পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই সহজ!

"আচ্ছা, পাণ্ডার নাম কি জান?"

"না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখতে ঢুকেছেন।"

"মন্দিরে ঢুকেছেন তো? আচ্ছা, তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরুলেই পাওয়া যাবে। তোমার নামটি কি খুকি?"

"আমার নাম ছবি।"

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে সেই স্নিগ্ধ লালিত্যময় সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল, 'ছবি বটে!'

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রীদল জলপ্রবাহ-বৎ যাওয়া-আসা করিতেছে। চলিতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল,— ছবি নত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে জড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবির-লাঞ্ছিত অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রূপে চোখ টেঁপাটেঁপি করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দিরদ্বারে ভিড়ে মিশিল, তারপর সহসা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবির হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মারিল। "আরে আমার যাত্রীর মেয়ে ভিড়ে হারিয়েছে, আয়!" সেই সর্ব্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটার আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল ; বহুকষ্টে এতক্ষণ সংযত ছিল, আর পারিল না, সদ্যকৃত ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই অসভ্যটার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল, "বিশ্বম্ভর পাণ্ডার হাতে গড়া চেলা, ছড়িদারদের সর্দ্দার সে, — রঞ্জন মিশ্র তার নাম, তার কাছে বেয়াদবি!"

অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান লোকটা যন্ত্রণাকাতর মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শান্ত-স্বরে আশ্বস্ত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"মেয়ে কই, মেয়ে কই"—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।— "ওগো এইদিকে একটি মেয়ে দেখেছ গা,— এই এতটুকু মেয়ে— পাৎলা চেহারা— সুন্দর মতন, কেউ দেখেছ গা—"

চারিদিকে প্রশ্নোত্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল!

"আরে এই হরুয়া — এই, এই ধারে ফের, আরে — এই বোকা, এদিকে দেখ, এই, কি খুঁজছিস্—"

"আরে মেয়ে হারিয়েছে ; মেয়ে হারিয়েছে, আমার যাত্রীর।"

"দেখ দেখি এই কি সেই?"—

"হাঁ, হাঁ, এই এই! —ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এইদিকে, এইদিকে আসুন আসুন, — এই যে গো, এই!"

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভারি ধূম পড়িয়া গেল, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে— ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া রঞ্জন ও ছবিকে ঘিরিয়া ফেলিল, রোরুদ্যমানা আকুলা বিধবা জননী ছবিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদ্য আশঙ্কা-মুক্ত আশ্বস্ত অন্তরে জগবন্ধুর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল!—

২

তাহার পর দিনকয়েকের মধ্যেই সেই পরিবারের সহিত অপরিচিত যুবার ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি জীব আছে, যাহারা নিজেরাও হাসিতে পারে না, আর পরের হাসিও সহ্য করিতে পারে না। গোপন অন্ধকারে, ব্যর্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করা যায় ; কিন্তু সেটা যে কেবল পরের চর্ম্মই ভেদ করিবে,— এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারে না, বরং সেটা বিপরীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যন্ত্রণার ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপর।—

দুষ্ট গ্রহের অনুকম্পায় রঞ্জনের সেইরূপ কতকগুলি সুহৃদ জুটিল। পাণ্ডার ছড়িদারেরা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল ; বাস্তবিক এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকার কে, —সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাহুত, অন্য পাণ্ডার এক লক্ষ্মীছাড়া ছড়িদার—সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজারা-করা যাত্রী পরিবারকে ছোঁ মারিয়া যে অসঙ্কোচে নিজের খাস দখলের অন্তর্ভূত করিয়া লইবে,— ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না! আর রঞ্জনের উপরই বা ইহাদের এত টান কেন রে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?—

বাস্তবিকই, সরল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইত তাহারই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত ; রমণীরা ছলছল নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা ছেলেটি কি মায়াবী! পুরুষেরা ভাবিত আরামের সঙ্গী

বটে। দরিদ্রের প্রতি চিরতাচ্ছিল্যশালী ক্রূর দাম্ভিক অন্তঃকরণও এই আত্মসম্ভ্রমে উদাসী সুকোমলকান্তি যুবাটির নম্র সরলতায়, অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতির রাখিত না, নিজেও খাতিরের জন্য লালায়িত ছিল না, কিন্তু সকলের উপরই তাহার অগাধ অপরিসীম ভালবাসা! রঞ্জনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখে নাই। সকলের হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমানভাবেই হৃদয় মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্ব্বরতার চিহ্ন ছিল না। নিজেদের ত্রুটি যাহারা সংশোধন করিতে জানে না, এবং পরের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাদের মত লোকের চক্ষুঃশূল ছিল রঞ্জন! কিন্তু উন্মুক্ত উদার-প্রাণ রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না ; সে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশের আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমায়িক ব্যবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ করিতে আসিত,— সেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিত।

অবসরে অনবসরে রঞ্জন মেসোমহাশয়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহদর্শনের সময় তাহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী। রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্প গুজব করিবেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রঙ্গদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জন সঙ্গে থাকিলেই ভাল হয়। না হইলে মেসোমশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর!

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া এতটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত। তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া, তাঁহাদের সব দেখাইয়া শুনাইয়া, কে জানে কেন, — রঞ্জন এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি।— আহা, ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবির কমনীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চিত ছিল ; তাহার প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ রীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানি সতর্কতার সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত। প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজসুরে দিব্য কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে,— সে সকলের নিতান্ত অগ্রাহ্যের বস্তু— তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুধাভরা বাক্যগুলা অকস্মাৎ নির্ম্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবির সহিত চোখাচোখী হইত তবে সে আকুল উৎকণ্ঠায়, ত্রস্তে চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত ; কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকে টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চরাইতেছে, কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে এ কি হইতেছে? এতটুকু একজনের কাছে এত কিসের...।

নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল, একি হইল।—

৩

বিকালে, বাসার বারান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুরি দিয়া মেসোমশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্ত্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের ঝুলি হস্তে, ছবির জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। খিড়কির পশ্চাদ্ভাগে পোড়ো জমিটায় ছেলেরা সকলে খেলা কবিতেছিল। সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, অন্য স্ত্রীলোকেরা তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

সদর দুয়ার পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্ত্তে মেসোমহাশয়ের মুখের কথা ঠোঁটের মধ্যে থামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "এস এস রঞ্জন, এস, কাল তোমায় দেখতে পাইনি কেন ঠাকুর?"

"বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি কচ্ছেন? আম? দিন আমায় আমি ছাড়াচ্ছি" — মেসোমশায়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া রঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাহাব পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল, "দেখুন তো বাবু, হয়েছে?"

"বেশ হয়েছে। আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখলে কোথা? কখনো বাংলা দেশে গিছলে?"

"না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।"

"বাঃ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান!"

রঞ্জন উপস্থিত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের মত অসঙ্কোচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসোমশায়ের পানে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনারা আমায় বড় ভালবাসেন। না?"

তাহার সুকোমল সরল প্রশ্নে ছবির জননীর মনে গভীর মমতার উৎস উথলিয়া উঠিল, জীবনের সহস্র শোক বেদনায় সন্তপ্তা রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য-স্নেহের তপ্ত অশ্রু খসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল!" মেসোমশাই সস্নেহে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রহস্যস্মিতহাস্যে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবির বে'র জন্যে ভাবছেন কেন? এক কাজ করুন,— জগবন্ধুর সামনে দুটো ফুল ফেলে, ছবিকে এই ছেলেটির হাতে উচ্ছুগ্যু করে দিন, ভাবনাচিন্তে সব চুকুক, আর রঞ্জনটিও আমাদের আপনার লোক হয়ে যাক।"

রঞ্জনের কপালের শিরা লাফাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে, তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পুরিয়া আম লইয়া রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবির জননী ভাবিলেন, "আহা, অমন আত্মি-সো জামাই হওয়া ভাগ্যের কথা!"

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, অন্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সে-সকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উদ্যত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি— সহসা কালান্তকের শরবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায়, অশুভক্ষণে সেই তুচ্ছ ব্যঙ্গ উচ্চারিত হইয়াছিল— রঞ্জনের অন্তরে সেটা সংঘাতিক বাজিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ভ্রূকুটী-ভঙ্গিমায় যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ব্যাপারটা ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ!— রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা ক্রমশঃ তাহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটি যাইত।

খিড়কির বাহিরে, খোলা জমিতে, বালির গণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ আস্ফালনে ছেলেরা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ও-দিকের রাস্তার ধারে বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া, একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আর খেলিতে পারে?— ছিঃ! তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রার্পিতের মত দুয়ার অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত রঞ্জন গভীর বিহ্বলতায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল— আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনের মস্তিষ্কে ঘণীভূত উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া উঠল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, "আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।"

কথাটা রঞ্জনের মর্ম্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর করুণার আকুল ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া তুলিল!— আহা তাহারো যে পিতা নাই!

সহসা তাহার স্বপ্নপূর্ণ চিত্ত আলোড়িত করিয়া তীব্র গ্লানির ধিক্কারে ক্ষণমধ্যে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সুখের আবেশে রচিত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুব্ধতাক্ষিপ্ত প্রাণ নিষ্করুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল— হায় হায়, সে করিতেছে কি?— করিতেছে কি! ভগবান জগন্নাথদেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভনময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিলে ঠাকুর! — রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত টলিতে টলিতে রঞ্জন পথে নাবিয়া পড়িল।

৪

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসোমশায়ের সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর ত হবে না।"

"হবে না। কেন বাবু?"

"কাল যে আমরা দেশে ফিরব, ঠাকুর।" .

নিমেষ-মধ্যে কে যেন রঞ্জনের হৃদ্‌পিণ্ডের শিরাগুলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোরে চিমটাইয়া ধরিল, কাল! — কালই— এত শীঘ্র! পীড়িত মর্ম্ম ভেদ করিয়া, বুকের

মাঝখানে, বার বার আর্ত্তপ্রশ্ন ধ্বনিত হইতে লাগিল— কাল, কালই, এত শীঘ্র! হায় দুর্ভাগ্য!

কোমরে কসিয়া চাদর বাঁধিয়া, সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঞ্জন মনে মনে ভাবিল, "আমারই অন্যায়।"

"আবার কবে আসবেন বাবু!"

"আবার!"— রহস্যচ্ছলে হাসিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "জগন্নাথ আবার যখন ডুরি ধরে টানবেন তখন আসব, কি বলেন দিদি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবির জননী মন্দির-পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা তা আর নয়! জগবন্ধু আবার যখন মনে করবেন, তখন আসব।"

ম্লানমুখে ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "তিনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকাব মনে পড়ে না!"

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ঠিক।"

"তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময় আসবেন বাবু।" কথাটা বলিয়াই দুঃসহকুণ্ঠা রঞ্জনের কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে মেশোমশাই বলিলেন, "রঞ্জন, তুমি আজ বিকালে আমাদের বাসায় যাবে?"

"না বাবু, পাণ্ডার জরুরী কাজ আছে।"

"তাই ত, তোমাব সঙ্গে যে তা হলে আর দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই যে রওনা হব।"

ব্যস্তভাবে ছবির জননী বলিলেন, "তা হলে এইখানেই—"

"হ্যাঁ, তাই হবে।"

সকলে মন্দিরে ঢুকিলেন। নির্দ্দিষ্টসময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আবার সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমহাশয় একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যদিকে সরিয়া গেল, কয়েক ছড়া কর্পূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে কবিতে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতেছিল। মর্ম্মান্তিক কাতরতায় তাহার সারা অন্তঃকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায়, কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না।

খানিক পরে মেসোমশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়ের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া ছেলেদের সকলেব গলায় এক-এক ছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে এক-এক ছড়া মালা বিলাইয়া— অবশিষ্ট মালা-ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "মা, এ মালাটি আপনার ছবিকে দিন।" মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন, "তুমিই দাও না ঠাকুর।"

ঠাকুর চকিতনেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না মা, আপনি দিন।"

রুমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "ছবি, ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।"—ঠাকুরের চোখের সামনে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল!

মাটীতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল, কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে

দিয়া ঠাকুর বলিল, "আমি আপনার ছবিকে আশীর্ব্বাদ করলুম্ মা।" চির প্রচলিত প্রথার অপব্যবহার!

"ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—"

গভীর দুঃখভরা হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওনা"— চট করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মম্ভরিতায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্বেষ-বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

৫

পরদিন মেসোমশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন, মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও, কর্ত্তব্যপরায়ণ রঞ্জন বিদায়ের শেষে মুহূর্ত্তে, তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্ম্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া, কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহা শূন্যতাকে কোনরকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কি না কে জানে!

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসোমশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি?—

কিছুই না!— হতাশার নিদারুণ নিষ্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। হায় মেসোমহাশয়ের আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী? কখনই না!

ক্রমে রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনের যাওয়া-আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস! পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ। তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল, জীবন্ত আশা বুকে করিয়া সে প্রত্যহ ষ্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই? যাঁহাদের খুঁজিতেছে তাঁহারা কই?

সুদক্ষ কর্ম্মচারী,— কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে-কড়া বচনে তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কানে সে কথা স্থান পাইল না। ক্রমে রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন— অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্য্যন্ত, তথাপি মেসোমহাশয়ের দেখা নাই। পূজার ছুটী আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই! হায়! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না! রঞ্জন গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে

পূজার ছুটীর পর যখন দাসত্বজীবী, ধনগর্ব্বী হাওয়া-খাইয়েরা দলে দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোনদিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না, তখন একদিন পাণ্ডার কাছে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ ষ্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

৬

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর-কন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সুরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ে সেই সবে, বিদায়ের করুণ রাগিণী বাজিতেছে,—সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, ব্যগ্র ঔৎসক্যের সহিত বিবাহবাটীর চারিদিকে ক্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে ; তাহার মুখে উজ্জ্বল আনন্দ, ও আকুল আতঙ্ক—যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে ; লোকটার ভাব দেখিয়া বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতরকার সমারোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদগ্রীব। কিন্তু না,— তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে,— চারিদিকে ঘুরিতেছে।— কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না,— বরং বন্দুকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি?—

কিছুক্ষণ পরে, বাডীর কোলাহলের ঘনঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। "শীগ্রী নাও, শীগ্রী নাও, ট্রেনের আর সময় নেই",— চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুণ মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ চড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীব ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহাব পানে চাহিতেছে? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা-আঁকা পীঁড়ির উপর বর ও বধূকে দাঁড় করাইয়া পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান কবিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ।—লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নিসম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! প্রচণ্ড উম্মত্ত হৃদপিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিযা ধরিয়া সযত্নে পদশব্দ লুকাইয়া সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকের মাঝে— সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে্ আসিল। কোলাহলময় জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল! চারিদিক মৃত্যু মলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোনদিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবধি আর তাহার কানে শুনা গেল না—শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ— না না, পবন অচল হৌক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক্— সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্ম্মভেদী ব্যর্থতার ঈষৎস্ফুরণ! না না, সে কিছুতেই হইবে না! কিছুতেই না! যুগ-প্রলয়ের মহা ঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহ্বরে ধীরে ধীরে সুপ্তি

লাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না!— ভগবান জগবন্ধু দেব! এখনো কামনা, এখনো একটি ভিক্ষা ঠাকুর, এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর—ওগো দয়াময়, এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও!

সুউচ্চ হর্ষনিনাদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝকঝকে চক্‌চকে ফিটনে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বর-বধূ সমারূঢ় হইল। গুরুগম্ভীর শব্দে মাটির অভ্যন্তরে কম্পন-হিল্লোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। অগ্রপশ্চাতে আরো কয়েকখানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল! লোকটার চক্ষু নিষ্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা, হস্ত-পদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিত-শূন্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোনদিকে না চাহিয়া, বরের গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "জগন্নাথদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, আপনার জীবন সফলতায় চির গৌরবময় হোক।"

বর নতমস্তকে নমস্কার করিল।

তারপরে আরো কঠিন হইয়া আরো অসঙ্কোচে— অবগুণ্ঠিতা বধূর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর-একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল, "এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত—তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক, ভগবান জগন্নাথদেবের নামে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।"

বক্তার ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার সহিত মহিমাময় বিজয়শ্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। মোহের দাসত্বের মুক্তিলাভে, আত্মজয়ের পূর্ণসন্তোষে মহা পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল! প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল। অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিস্ময়ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখন কুণ্ঠিতভাবে বক্তার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

ননী খানসামার ছুটি যাপন

১

বর্ষাকাল ; সমস্ত দিনই ঝুপ-ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার বৃষ্টি ধরিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বর্ষণেরই নবোদ্যম সূচনা জন্য। সমস্ত আকাশটা বৃষ্টি-সম্ভাবিত 'আমানি' মেঘে ধূসর-মলিনতায় লিপ্ত হইয়া ছিল। মাঝে মাঝে হু হু রবে

এক একটা দমকা বাতাস, শীতকম্পিত ওষ্ঠে আকুল হুঙ্কার ছাড়িয়া যাইতেছিল। সদ্য-বিগত গ্রীষ্মের তপ্ত আলিঙ্গন-মুক্তা বিশ্বপ্রকৃতি, এখন যেন নীরবে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বর্ষার জলে স্নান করিতেছে।

মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, বাম হাতে জুতা ও ছাতা লইয়া, এবং ঘাড়ে রঙীন টিনের ট্রাঙ্কসহ বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীপূর্ণ প্রকাণ্ড মোট বহিয়া, বলিষ্ঠ যুবক ননী হাজরা বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে সদরঘাটে আসিয়া, নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, চারি ক্রোশ পাকা রাস্তা হাঁটিয়া যখন তাহার নিজগ্রামে যাইবার মেঠো পথে 'আলের' মাথায় নামিল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুদীর্ঘ পথশ্রমে, ননীর সেই অসুরের মত কঠিন শক্ত দেহ যেন কাবু হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ মাঠের পথে নামিয়া, পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত আইলের উপর দিয়া সাবধানে সতর্ক পদক্ষেপে চলিতে চলিতে, তাহার পা দুইটা যেন ক্লান্তিতে অবশ হইয়া পড়িতেছিল,—কিন্তু হায়, তখন পায়ের খবর কে রাখে? ননী সামনের দিকে চাহিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে, নবোদ্যমে চলিতে লাগিল।

ছাতা এবং জুতা মাঝে মাঝে হাত বদলাইয়া বহন করার জন্য হাতে সে বিশেষ কিছু ক্লান্তি অনুভব করে নাই, কিন্তু ঘাড়ের মোটটা তো সেরূপভাবে বহন করিবার সুবিধা ছিল না। কাজেই, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড হইতে ঘাড়ের সমস্ত অংশ ব্যাপিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—পথে আসিতে আসিতে ননী অনেকবার ভাবিয়াছে যে এইবার কোন একটা চটিতে বা গাছতলায় মোট নামাইয়া একবার একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে, তারপর পুনশ্চ চলিবে,—কিন্তু পরক্ষণেই বাটী পৌঁছানর বিলম্ব কল্পনা করিয়া সে সমস্ত আরামের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছে!—"নাঃ, মরিয়া বাঁচিয়া যেরূপেই হউক যদি একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বাটী পৌঁছান যায় তো এক মুহূর্ত্ত পরে গিয়া কাজ নাই, আরাম-স্বস্তির লোভ মাথায় থাক", এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনকে শক্ত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে ননী সারা পথটা এড়াইয়া আসিয়াছে।—প্রতি পদক্ষেপেই সে ক্লান্তি-পীড়িত মনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে—"আর কি, এইবার তো পথ ফুরাইল!"

বৈকালের মেঘাচ্ছন্ন মলিন আলো ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। বৃষ্টি ফিনফিন করিয়া পড়িতেছিল। কোনরূপে মাঠের পথ পার হইয়া ননী যখন গ্রামের পথে আসিয়া উঠিল,—তখন সহসা আবার সজোরে ঝম ঝম করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল! ননী প্রমাদ গণিল,—এইবার বুঝি কোন গৃহস্থ-বাড়ীর দাওয়ায় উঠিয়া আশ্রয় না লইলে চলে না, বড় জোর বৃষ্টি আসিয়াছে। —কিন্তু বাড়ী পৌঁছাইতে যে বিলম্ব হইবে! ভাবিল, নাঃ থাক, এতটা পথ যখন আসিয়াছি, তখন এইটুকুতে আর মরিব না!—ননী হনহন করিয়া চলিল, বৃষ্টির ছাটে পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, তথাপি সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ছুটিল।

২

পশ্চিমপাড়ায় ননীর বাড়ী। বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া, দ্বার ঠেলিল,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ননী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "চারু, চারু—ওরে চারু, কবাটটা খুলে দে!"

চারুচন্দ্র ননীর একমাত্র ছোট ভাই, এই ভাইটি ছাড়া তাহার আর কোন সহোদর বা সহোদরা নাই। ননীর জননী এই দুইটি সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তারপর অনেক দুঃখ ধান্দা করিয়া বিধবা রমণী ছেলেদুইটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—এখন দুই ছেলে রোজগারী হইয়া সংসারটা বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। বড় ননীলাল বিদেশে মাসিক আট টাকা মাহিনার চাকরীতে, বখশীস ও পার্ব্বণী প্রভৃতি বাবদে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। ছোট চারুচন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া চাষ আবাদ করিয়া সম্বৎসরের ধান, কলাই ও গুড়টা জুটাইয়া লইতেছে। মাস কতক হইল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক সমশ্রেণীর উগ্রক্ষত্রিয় গৃহে তাহার বিবাহ হইয়াছে। ননীর বিবাহ তৎপূর্ব্বেই হইয়াছে—এখনও বধূর সন্তান হয় নাই।

ননীর আহ্বানের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সে আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল। পরক্ষণেই ভিতর হইতে হড়াশ করিয়া হুড়কা খুলিয়া ঘোমটা পরা একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ তরুণী ব্যগ্র বিস্ময়ে ঝুঁকিয়া উঁকি দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর মুখে একটা আকস্মিক আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল,—ননী সস্মিত বদনে বলিল, "আমি,—দোর খোল।"

দ্বার মুক্ত হইল, —মোট মাথায় ননীলাল হেঁট হইয়া সাবধানে ছোট চৌকাট পার হইয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ; বলিল, "চারু মাঠ থেকে এসেছে ?"

"এসেছিল, ফের বেরিয়ে গেছে।"

"মা কোথা?"

"মা গোপালপুরের খুড়ীর বাড়ী গেছে।"

"দাঁড়িয়ে ভিজো না, দোর বন্ধ করে দাওয়ায় এস" —বলিয়া ননীলাল অগ্রসর হইল। পত্নী সুষা দ্বার ভেজাইয়া দিয়া স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ননী রোয়াকে উঠিয়া হাতের জুতা-জোড়াটা এক পাশে ফেলিয়া, ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিল, 'তাই ত, চারু বাড়ীতে নেই—মোটটা—"

"তুমি একটু হেঁট হও না, আমি ধরে নামাচ্ছি।"

"পারবে? ভারি মোট কিন্তু।"

"তা হোক, দেখিই না।"

ননী হেঁট হইল, দুজনে ধরাধরি করিয়া মোটটা নামাইল ; সে তখন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবে খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়া, ঘাড়ের পিছনে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ওঃ, ঘাড় ফেরাতে পাচ্ছি না,—আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ছ ঘণ্টা মোটটা ঘাড়ে বইছি, সাধারণ কথা, বাপ! তুমি পার?"—বলিয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিয়া পরিহাস ভরে একটু হাসিল।

সুষা সে কথায় কান দিল না। আগ্রহান্বিত মুখে প্রশ্ন করিল, "তুমি কটার গাড়ীতে এসেছ? সারাদিন কিছু খাওনি?"

"না, কিছু খেয়েছি। বর্দ্ধমানে নতুনগঞ্জের বাজার থেকে জলটল খাবার কিনে খেয়েছি। ইচ্ছে করলে হোটেলে ভাত পেতুম,—কিন্তু মোট বইতে হবে বলে তা আর খাইনি।"

"পা ধুয়ে এস, তামাক সেজে দিই—"

"না না, তামাক থাক, পকেটে বিড়ি আছে তাই খাচ্ছি।"— বলিয়া ননী পকেট হইতে বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিল,—কিন্তু দেশালাইটা জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, জ্বলিল না। ননী দাঁতে বিড়ি চাপিয়া, ব্যর্থ চেষ্টায় দেশালাই কাঠি বাক্সটার গায়ে ঘসিতে ঘসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে দেশালাই আছে?"

"আছে—দিই"—বলিয়া সুষা ঘরে ঢুকিয়া শয্যা-নিম্ন হইতে দেশালাই বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া ননীকে দিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে ভদ্দরনোক হয়ে পড়েছ, এখন আর তামাক খাও না?"

"ভূতের আবার জন্মবার!—বারমাসই হল ঘুরে বেড়ান, তামাকের সরঞ্জাম কত সঙ্গে করে ঘুরি বল!"—বলিয়া ননী দেশালাই জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

"আচ্ছা, তুমি ক'টার সময় বর্দ্ধমানের ইষ্টিশানে এসেছিলে!"

"বেলা দশটায়।"

"তোমার মনীব যে এখন তোমায় ছেড়ে দিলেন! সেদিন ঠাকুরপো বল্লে, চিঠিতে তুমি নিকেছ যে এখন তুমি মনীবের সঙ্গে খড়গপুর যাবে, এখন আর আসবে না। সেই পুজোর পর তবে। তা হলে কি রকম হল?"

"মনীবের খুসী।"

"আমি তোমার গলাব আওয়াজ শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিনু।"

"ভেবেছিলে বুঝি আর কেউ এল?"

"আহা, যাও।—আমি মনে করেছিনু বুঝি ঠাকুরপোই মিছিমিছি ফিরে এসে দুষ্টুমি করছে, শ্বশুরবাড়ী যায়নি—আমি ঠাট্টা করেছিনু কিনা, তাই ফিরে এসেছে!"

"চেরো শ্বশুরবাড়ী গেছে বুঝি?"—বলিয়া মুখ হইতে বিড়ি নামাইয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিল; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে আজ আর বাড়ী আসবে না?"

"বাড়ী আবার আসবে কি!"

"শ্বশুরবাড়ীতে রাত্তির বাস ধরেছে বুঝি?"

সলজ্জ স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুষা বলিল, "ধরবে না!" তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনেকখানি ওকালতীর সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ননী বিস্মিত হইয়া বলিল, "এর মধ্যে কি গো, ছেলেমানুষ!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অস্ফুট স্বরে সুষা বলিল— "কচি খোকা!"

ননী সে কথায় কান দিল না, অন্যমনস্কভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, "আচ্ছা, সে কদিন অন্তর শ্বশুরবাড়ী যায়?"

"মাসে পাঁচ সাতদিন।"

"পাঁচ সাতদিন।—এইবার উচ্ছন্ন যাবে আর কি!"

"তুমি বোকো না বাবু! শ্বশুরবাড়ী গেলেই মানুষ অমনি উচ্ছন্ন যায়! আর বউ যদি এখানে থাকত?"

"থাকত, থাকতই, লাটসাহেব হত নাকি? এই যে আমি, বছরে ক'দিন এসে বাড়ীতে থাকতে পাই! তুমি বলতে পার না?—তা তুমি বলবে কেন, তুমিই ত আস্কারা দিয়ে তার মাথা খাচ্ছ—বাস্তবিক, এখনকার ছেলেপিলেরা সব কি হল গো!"

ব্যঙ্গস্বরে সুষা বলিল, 'তুমি কবেকার গো? তুমি কি ছিলে?"

"আমি!—কই আমার মুখপানে চেয়ে সত্যি করে বল দেখি আমি কি ছিলুম!" —ননী ঘাড় উঁচাইয়া পত্নীর পানে চাহিল।

"আমি জানি না, যাও!"—বলিয়া সুষা হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইল। বলিল, "তা এখন ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে এসে কিছু খাবে, না বসে বসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

নিঃশেষপ্রায় বিড়িতে একটা দীর্ঘ টান দিয়া, জ্বলন্ত বিড়িটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "গামছাটা দাও, জল ধরে এসেছে, ঘাট থেকে কাপড়টা কেচেই নিয়ে আসি—"

"আহা থাক না, আমি এর পর—"

"না না, কেন অনর্থক কষ্ট করবে, দাও আমিই কেচে আনি। কিন্তু সত্যি বলছি, চেরো কি অন্যায় করছে দ্যাখ দেখি! এবার তাকে একটু কড়কে দিয়ে যাব—"

"সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না কি?"

"সঙ্গে করে?"—চিন্তিত ভাবে ননী বলিল, "দ্যাখ, এ চাকরী পয়সার চাকরী বটে, যদি বুঝে চালাতে পারা যায়। কিন্তু সঙ্গ বড় খারাপ কি না, ওই সব অবুঝ ছেলেমানুষকে এসব মন্দ সঙ্গের সীমানায় যেতে দিলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। বিনোদ চাটুজ্যে সবজজের ছেলে নীরদ চাটুজ্যে মস্ত উকীল, তাঁর খাস খানসামা আমি, এ লোকেব কাছে পরিচয় দিতেই ভাল। কিন্তু আসলের খবর যদি শোন, তো, আমার সে মেহনতের পয়সা ছুঁতে তোমাদের ঘেন্না করবে! বাপ, সে সব জাযগায় কি জেনেশুনে আপনার লোককে ঢুকতে দিতে আছে? একেবাবে বয়ে যাওয়া, জাহান্নম যাকে বলে।"

"নিজে তো বারমাস তিরিশ দিন নিশ্চিন্দি হয়ে তাই করছ?"

"এখন অভ্যাস দুরস্ত হয়ে গেছে, জাহান্নমের তোয়াক্কা আর বড রাখিনে।"

"হ্যাঁগা, তুমি যে বলতে তোমার মনীব মহাদেবের মত—"

"এখনও তাই, তুষ্ট থাকলে সদাশিব,—আব রুষ্ট হলে ব্রহ্মাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দেবেন, একেবারে যমের বাবা বীরভদ্র।"

"ওগো কথা ছেড়ে ওঠ, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাকবে?"

"যাই—যাই। ভাল কথা, মোটের ভিতর একতাড়া পাণ আছে, দাও তো, ঘাট থেকে ধুয়ে আনব।"

"কেন, আমার হাতে কি 'কুট' হয়েছে?"

"ওগো তা হয়নি জানি। কিন্তু গোলামের ধাতে অত নবাবী বরদাস্ত হবে কেন? আমার মনীববাড়ীতে বলে, এর চাইতেও কত"...বাকী কথাটা উহ্য রাখিয়া ননী হেঁট হইয়া নিজেই মোট হইতে পাণের তাডা বাহির করিয়া লইয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে, দাওয়া হইতে নামিয়া খিড়কি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুষা কয় মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতে মনোনিবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরে ননীলাল ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল। ধৌত পাণগুলা সুষার হাতে দিয়া বলিল, "গোটাকতক সাজ দেখি।"

"সাজছি, আগে তোমায় খেতে দিই, কি খাবে? মুড়ি, চালভাজা, ছোলাভাজা সব আছে, নারকেল আছে। ভেঙ্গে দেব?"

"না না, এখন নয়, মা আসুক আগে, তা পর— মা তো এখুনি আসবে। ততক্ষণ একটু ভাল করে তামাক সেজে খাই, তুমি পাণ দাও।"

ননী চারুর হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া, দেশালাইয়ে কাঠকয়লা ধরাইয়া হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। সুষা পাণের বাটা চুনের ভাঁড় প্রভৃতি ঘর হইতে বাহির করিয়া—অদূরে বসিয়া পাণ সাজিতে লাগিল। ননীলাল সুখের আবেগে তামাক টানিতে টানিতে তাহার আকস্মিক আগমনের সুযোগ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহারই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ দিল। তাহার মনীব মেদিনীপুর হইতে কার্য্যোপলক্ষে আসানসোলে আসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিবার পথে সে কিরূপ কৌশলে তাহার অন্যতম সহযোগী মোহনচাঁদের মারফৎ মনীবের নিকট ছুটির আবেদন করাইয়া কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে, সে সমস্ত বলিয়া শেষ যখন তাহার বাড়ী আসার আগমন উপলক্ষে সহকর্ম্মীগণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কাহিনী বলিতে লাগিল,—তখন সুষা লজ্জারক্ত মুখে অসহিষ্ণু হইয়া বলিযা উঠিল,— "ছি ছি, থাম বাবু। তোমরা বড়—ওব নাম কি, এ হয়েছে!"

বাড়ীর দ্বার ঠেলিয়া কে ভিতরে প্রবেশ করিল। সুষা তখন মাথায় কাপড় টানিয়া বধূ হইয়া বসিল। ননী চাহিয়া দেখিল মাতা আসিতেছেন, সে হুঁকা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

ননীর মাতা রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে বিস্ময় আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তুই কতক্ষণ এসেছিস?"

ননী মাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া, দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ললাটে বক্ষে ও জিহ্বায় দিল। হাসিমুখে বলিল, "এই খানিকক্ষণ আসছি। তোমার শরীর বেশ ভাল আছে মা?"

মাতাপুত্রে স্বাগত প্রশ্নাদি বিনিময় অন্তে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলাপ হইল। মাতা ননীর আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন ভাত খাসনি? তা হলে এখুনি উনুন জ্বেলে দুটি ভাতে ভাত চাপিয়ে দি। ওবেলাকার ঝালের মাছ রান্না আছে, মৌরলা মাছের টক আছে, সন্ধে হলে সকাল সকাল খেয়ে নিবি। এখন তা হলে দুটি জল খা—"

"চালভাজা আছে বলছিল না?—দাও না তাই খাই, অনেকদিন ওসব খাইনি, —মুড়িই খেতে পাই না, তার আর—"

ইতিমধ্যে বধূর পাণ সাজা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা পিতলের রেকাবী করিয়া গোটাচার পাণ আনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হাতে দিল। স্বামীর হাতে দিল না, কারণ গুরুজন নিকটে থাকিলে সেরূপ হাতাহাতি দেওয়াটা নিন্দাজনক অশিষ্টতার কাজ!— শ্বাশুড়ী পাণ লইয়া বধূকে ব[illegible]কে জল খেতে দাও।

চারুর সেই রেকাবীটে করে দুটি চালভাজা তেল মেখে দাও। আর কাঁচা লঙ্কা আছে, দেবে রে ননী?"

"দিক না।"

"তবে দাও, হেঁসেল ঘরে বেদীর ওপর লঙ্কা আছে। সেইখানেই কাটারীটে আছে, নিয়ে আয় ত বাছা, মাচায় নারকেল আছে পেড়ে দিই।"

"আমায় বল না কোথায় আছে, পেড়ে নিচ্ছি"—বলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না থাক, আমি নাগাল পাব।"

"হ্যাঁ মা, চেরো শ্বশুরবাড়ী গেছে?"

"তোকে কে বল্লে?"—মাতার কণ্ঠস্বর একটু খাটো হইয়া গেল। ননী নখে মাটী খুঁটিবার ছলে হেঁট হইয়া রান্নাঘরের দিকে গোপন দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেখান হইতেও একজন প্রচ্ছন্ন হাস্যভরা মুখে, কৃত্রিম কোপব্যঞ্জক কটাক্ষে তাহাকে নিঃশব্দ ভর্ৎসনায় শাসন করিতেছে! তাই সহজভাবে হাসিয়া বলিল—"আর কিছুর জন্যে নয়, তবে কি না চাষবাসের সময়টা অনর্থক—"

মাতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, তা সেখানে একটি দিনও কামাই করে থাকে না। ভোর না হতেই চলে আসে। বাত থাকতে আসার জন্যে আমি বরং কত বকে মরি—"

বধূ রান্নাঘর হইতে চালভাজায় তৈল মাখাইয়া কাঁচা লঙ্কা ও গুড়সহ এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকটে নামাইয়া দিল, শাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া মাচার উপর হইতে নারিকেল পাড়িয়া লইয়া আসিলেন ; ননী নারিকেল ভাঙ্গিয়া কাটারির দাগ করিয়া মালা হইতে নারিকেলের শস্য ছাড়াইতে ছাড়াইতে হেঁট মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "চারুর শরীরটা এখন সেরেছে মা? একটু মোটাসোটা হয়েছে?"

"কই আর! তেমনিই রোগা আছে। আর বাবা, যে খাটুনী পড়েছে মাঠে—"

"হু"—ননী খানিকটা নারিকেল ছাড়াইয়া লইয়া বাকীটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "রেখে দাও মা, রাত্তিরে তোমার মুড়ি খাবার সময় ছাড়িয়ে দেব।"

"তুই আর একটু নে।"

"না, আমি ঢের নিইছি"—বলিয়া ননী জলযোগ করিতে বসিল ; উঠানে ও-পাশে গোয়ালঘরের চালার দিকে চাহিয়া বলিল, "হেলেদুটোকে চারু খড়-জাব দিয়ে গেছে?"

"সে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে। আহা দেখ ননী, এবার বক্না বাছুরটি যা হয়েছে, বড্ড পবিষ্কার। ঠিক ওর মার মত।"

"ক দিনেব হোল মা?"

"ও মাসের দশরার দিন হয়েছে, আর আজ মাসের পনেরুই, এই ঠিক একমাস পাঁচ দিন।"

"দুধ কতটা করে দ্যায়?"

"দু বেলায় প্রায় আড়াই সের। ডেড়সের করে বাঁড়ুজ্যেদের রোজ দিই, আর এক সের করে ঘরে রাখি। তিন মনিষ্যির ঢের হয়, আর ঐ দুধের দামে খোল ভূষী কিনি, রাখালের চরাণী পয়সা দিই।—হ্যাঁরে, তুই সেখানে দুধটুধ পাস?"

"দুধ বড় একটা পাইনে, তবে অন্য পাঁচ সামগ্রীর তো অভাব নেই—"

"আহা তা ত বটেই বাবা, সে হোল রাজার ভাণ্ডার! তা হ্যাঁরে ননী, মনীবরা যত্ন-ছেদ্দা করে? ভালটাল বাসে কেমন?"

চালভাজা চিবাইতে চিবাইতে লঙ্কায় কামড় দিয়া ননী বলিল, "চাকরকে ভালবাসা, মা, কাযের খাতিরে। গা ঘামিয়ে, প্রাণ উচ্ছুগ্যু করে যতক্ষণ খাটব, ততক্ষণই আদর, তারপর একটু এদিক ওদিক হলে পাঁচ বছরের ছেলেটিও চোখ রাঙিয়ে ঝেঁপে উঠবে। তবে আমায় বড় একটা কেউ কিছু বলবার বাগ পায় না,—আমি ত গতর রেখে খাটি না। আমি হামেহাল খাড়া থাকি, দিনকে দিন বলি না, রাতকে রাত বলি না। ধর, দুপুর রাত্রে খেটে খুটে শুইচি, হয়ত তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময় বাবু ডাকলেন। তক্ষুণি উঠে পড়নু। ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছি না—চোখে এক ঝাপটা জল দিনু, বাবুর ঘরে গেনু—হয়ত বল্লেন সোডা ভেঙ্গে দে। সোডা ভাঙ্গনু, গেলাসে ঢালনু, বাবুর খাওয়া হোল, তারপর চুরুট সরিয়ে দিন—তবে ছুটি। আবার সেই ভোর পাঁচটা হোতে না হোতে এক ডাকে উঠে কাযে লাগতে হবে। পয়সা কি আর অম্নি হয় মা!"

"আহা তা নয় বাবা!"—দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ ছলছল নয়নে মাতা পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ননী একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল যে, পুত্রের দাসত্ব জীবনের এই সমস্ত দুঃখ কাহিনী মাতার পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক নহে। আবার—ননী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, গৃহ মার্জ্জন-রত আর একজনের ঝাঁটাব শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ সেও কাণ ঠাড় করিয়া তাহাব কথা শুনিতেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা উলটাইয়া লইয়া ননী বলিল, "আমি এখন খুব মোটা হইচি, নয় মা?"

"কি যে খঁড়িস বাবু! কোথায় মোটা হইচিস?"

"না মা, মোটা হইচি বই কি। এবার অনেক ভাল ভাল জায়গা বেড়িয়ে এনু কি না, কটক—পুরী।"

"দক্ষিণ গিয়েছিলি? জগবন্ধু দর্শন কবে এলি?"

"জগবন্ধু দেখা হয়নি বটে, তবে দূর থেকে মন্দিরটে দেখে এসেছি।"

"ওমা! জগবন্ধু দেখলিনে কিরে?"

"ফুরসুৎ পেনু না মা। সাতদিন ছিনু বটে, কিন্তু হলে কি হবে, চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কি হুকুম হয়। আর, আমার মনীব সায়েবী মেজাজেব লোক, ওসব মোটেই মানেন না। একদিন এক পাণ্ডা দেখা করতে এসেছিল, ওরে বাবা, তাকে যা করে উঠেছিলেন! আমরা বলি, এইখানেই বুঝি নিকেশ হল—"

'হ্যাঁরে, ওঁরা ওসব মানেন না কেন?'

"ওরা মানে উনিই; মেয়েদের তো ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেদ্দা আছে। উনি বলেন, আমি যতক্ষণ ঠাকুর দেখব ততক্ষণ আমার বিলিয়ার্ড খেলা হবে,—বিলিয়ার্ড খেলা সে একরকম সায়েবী খেলা, তুমি মেয়েমানুষ বুঝবে না।"

ননী উঠিয়া ছাচার জল বহিবার নালীর কাছে গিয়া ঘটির জলে হাত ধুইয়া, ঢক-ঢক করিয়া জল খাইল। তারপর ঘটিটা নামাইয়া রাখিয়া মাতার নিকট হইতে পাণ লইয়া মুখে পুরিল।

বধূ বিছানা ঝাড়িয়া ঘরদ্বার ঝাঁট দিয়া সমস্ত ওজ্‌লা জড় করিয়া বাহিরে আসিয়া উচ্ছিষ্টপাত্রে ফেলিয়া, সেই বাসনগুলা সব গুটাইয়া লইয়া, দাওয়ায় গোময় লেপন করিয়া দিল। তারপর রান্নাঘর হইতে ঘড়া ও ঘটি বাহির করিয়া উঠানে রাখিল। ননীর মাতা পুত্রকে বলিলেন, "তুই তা হলে বসে থাক, আমরা কাপড় কেচে আসি।"

"যাও।"—বলিয়া ননী তামাক সাজিতে বসিল।

৪

গা ধুইয়া আর্দ্রবস্ত্রে জলপূর্ণ কলস লইয়া বধূ যখন বাড়ী ঢুকিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দাওয়ায় উঠিয়া বধূ দেখিল, ইতিমধ্যে দীপ জ্বালা হইয়াছে, এবং দীপালোকের নিকট বসিয়া ননীলাল রাশিকৃত ফুল লইয়া সূঁচ সূতায় নিবিষ্টচিত্তে মালা গাঁথিতেছে। ননী পদশব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইল, বধূর হাস্যরঞ্জিত মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বসে থাকি না, ব্যাগার খাটি। একটা হাস্নুহেনার চারা এনেছিনু, পাঁদাড়ে পুঁতে দিতে গেনু, দেখি বিস্তর যুঁই আর বেলফুল ফুটে রয়েছে, চাট্টি তুলে নিয়ে এনু। আহা সহর বাজার হলে এই ফুলগুনির দাম চার আনা তো বটেই!"

"তা কুঁড়িগুণো তুলে এনেছ কি কর্ত্তে?"

"কুঁড়ি নয়, এগুণো ফোটবার মুখী হয়েছে। এই যুঁইয়ের কুঁড়িতে মালা গেঁথে জলে ভিজিয়ে রাখলে সন্ধ্যার পর এ একেবারে টোপপর হয়ে ফুটে উঠবে দেখো। দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কাপড় ছাড়। মা কই?"

"মা রাত্তিরে খুড়ীর কাছে শোবে, তাই বলতে গেছে।"

"ওঃ"—ননী দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "তাই ত, একবেড়ে ঘরে আর চলছে না। মরে-বেঁচে যা করেই হোক এবার অন্ততঃ একখানা ঘরও তুলতে হবে।"

"না তুল্লে চলবে কেন? দুদিন পরে, ধর, ছোট বৌটি আসবে। আজ না হয় ঠাকুরপো দত্তদেব বৈঠকখানায় শুচ্ছে, এরপর তো আর তা হবে না।"

"তা ত বটেই। আর ঘর না হলে ঘরের লক্ষ্মী ঘরেও আনতে পাচ্ছি না। যা করেই হোক, অঘ্রাণ মাসের মধ্যেই ঘরটা তুলে ফেলতে হবে। মাঘ মাসে ছোট বউকে আনা হবে, আর বেশীদিন কি বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখা যায়?"

"তা কি যায়? বিয়ের জল পেয়ে ছোট বউ মস্ত বড়টা হয়ে পড়েছে। রথের সময় মা এনেছিল, দেখলাম প্রায় আমার মত মাথায় হয়ে গেছে।"

"সত্যি নাকি? তা হোক, তুমি এখন কাপড় ছাড় দেখি।"

"দাঁড়াও, উনুনে আগুনটা দিয়ে আসি, মাচা থেকে ঘুঁটে পাড়তে হবে।"

"আচ্ছা, আমি দিয়ে আসছি"— বলিয়া ননী ফুল মালা সূঁচ সূতা সব ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূ বিব্রতভাবে বলিল, "আঃ, কি যে ছেলেমানুষী কর, মা দেখলে এখুনি কি বলবে বল দেখি।"

"মাকে সে আমি বুঝিয়ে দেব, তুমি এখন কাপড় ছাড় তো"—বলিয়া ননী সত্য সত্যই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিপন্না বধূ মিনতি করিযা ফিরিবার জন্য অনুরোধ

করিল, কিন্তু ননী সে কথা কাণে তুলিল না, রান্নাঘরে গিয়া মাচার উপর হইতে দুড়-দাড় শব্দে ঘুঁটে নামাইয়া উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

অগত্যা বধূ কাপড় ছাড়িয়া, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া, গোহালঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া, মশক দংশনে বিক্ষুব্ধ গোরুগুলির জন্য একটু ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেখান হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ননী রান্নাঘর হইতে ডাকিল, "উনুন ধরে গেছে গো!"

মাতা তখন বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া উঠানে ঢুকিয়াছিলেন। তিনি রান্নাঘর হইতে পুত্রের আহ্বান শুনিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বউ কোথা? তুই ওখানে কেন রে?"

"একটু আগুন নিতে এসেছি"—বলিয়া ননী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বধূ গোশালা হইতে দীপ হস্তে বাহির হইলে শাশুড়ী একটু মিষ্ট ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "আমি এসে গোয়ালে সাঁজালি দিতুম বাছা, তোমার এত তাড়াতাড়ি করা কেন। যাক, বেশ হয়েছে, তুমি এখন দুধটা আগে আউটে নাও, তাপর ভাতের হাঁড়ি আমি এসে চড়াচ্ছি।"

বধূ মাথা নাড়িয়া নীরবে তথাস্তু জ্ঞাপন করিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল; শাশুড়ী কাপড় ছাড়িতে দাওয়ায় উঠিলেন। ননীলাল মাতাকে আগুন লওয়ার কৈফিয়ৎ দিলেও, বাস্তবপক্ষে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চাড় না থাকায় আসিয়া আবার ফুলের মালা গাঁথিতে বসিল। মাতা বলিলেন, "তুই যে এখন ফুল নিয়ে বসলি ননী!"

"কি করব মা, একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। চেরোটা বাড়ীতে নেই, যে দুদণ্ড পাঁচটা কথা কই। বাড়ী যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে। এবার যে বাড়ীতে এসেছি তা যেন মোটেই বুঝতে পাচ্ছি না; তাই ভাবছি একবার হেরিকেনটা নিয়ে দুগগোডাঙায় যাব কি?"

"না বাবা, এই রাত্তিরে! একে বর্ষাকাল, তাতে আওলের দিন, চাদ্দিকে বন বাদা, —কাল সকালেই তো সে আসবে।"

"তা'ত আসবেই—কিন্তু আজ"—কয়েকমুহূর্ত নীরব থাকিয়া ননী সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে মা। ঐ ধামার মোটের মধ্যে পচিশটে বোম্বাই আর পঞ্চাশটে ভুতো বোম্বাই আম আছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওসব ভাল আম চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই নিয়ে এনু গোটাকতক। কাল ঠাকুরদের দুটো দিও, খুড়ীকে গোটা চার দিও আর এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাকে যা দিতে হয় দিও। কাশীর প্যায়রাও গোটাকত আছে, একটা একটা সব দিও। আর দ্যাখ মা, ইষ্টিসনে নতুন বেগুন আর মূলো বিক্রি হচ্ছে দেখে, আট আনায় আধসের বেগুন আর মূলো কিনে নিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছিস। আজ রাত্তিরে তা হলে মূলো-বেগুনের একটু তরকারী হোক।"

"না না, সে তরকারী কাল দিনের বেলা হবে; তোমার সুদ্ধ হবে, চেরো থাকবে। আজ সে বাড়ী নেই, আজ ওসব তরকারী কেন? শুধু দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিতে বল, খাব এখন।"

"তা হলেই বা।"

"না মা, আজ ওসব ন্যাটা কোর না। চেরো থাকলেও বা যা হোক হোত, কিন্তু শুধু আমার জন্যে—না, সে আমি খাব না। বিদেশে পাঁচ-পুজ্যির বাড়ীতে থাকি মা, সময়

শিরে কত ভালমন্দ সামগ্রী খেতে পাই, কিন্তু সে সব মুখে তুল্‌তে আমার মন কেমন করে।"—ননীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। মাতা মৃদুনিঃশ্বাস ফেলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "তা হোক, তুই ত বাবা আমাদের কিছু অভাব রাখিস না, যখন বাড়ী আসিস তখন তো আশ পুরিয়ে সামিগগীরি আনিস।"

বহুক্ষণ ধবিয়া এইরূপ নানা প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিল। তারপর ননীর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, পুত্রকে আহার করাইয়া মাতা নিজে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং বধূকে আহারে বসাইয়া দিয়া প্রতিবেশিনী গৃহে শয়ন করিতে চলিলেন। ননী আলো ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া রাখিয়া আসিল।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা ও শ্রমক্লান্তির পর দুইটি অন্ন উদরে পড়িতেই, গভীর নিদ্রায় ননীলালের সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপবে সে দেহ ঢালিল। বধূর তখনও রান্নাঘর নিকান ও অন্যান্য খুচরা কাজ বাকী ছিল, সে তাহাই সারিতেছিল,—ননী চেষ্টা সত্ত্বেও আর চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পাবিল না, ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পবে পদতলে কাহার তপ্ত কোমল কর-সংঘর্ষণ অনুভব করিয়া 'ছ্যাৎ' করিয়া ননীব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—অভ্যস্ত সংস্কারবশে মনে হইল প্রভু বুঝি কক্ষান্তর হইতে ডাকিতেছেন। সে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, "আজ্ঞে যাই।"

পরমুহূর্ত্তেই ত্রস্তভাবে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সহসা দীপালোকে পদপ্রান্তে উপবিষ্টা তরুণীমূর্ত্তি দেখিযা সে চমকিয়া উঠিল। তাহার তন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, বিস্ফারিত চক্ষে ভাল করিয়া চারিদিক চাহিল,—নাঃ, এ ত প্রভু-নিবাসের ধবধবে চুণকাম করা প্রকাণ্ড হলঘর নয, এ যে তাহার নিজের সেই আবাল্যের পরিচিত গোময়লিপ্ত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীর! —আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিযা দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া ননী বলিল, "ওঃ, বড্ড ঘুমিয়ে গেছনু—তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"এই ত আসছি। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে পায়ে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছিনু, তুমি শোও না।"

"না, আব ঘুম হচ্ছে না। থাক, পায়ে আর তেল দিতে হবে না, তুমি শোও, অনেকটা রাত হয়ে গেছে না?"

"না, রাত আর কই বেশী হয়েছে? তুমি শোও শোও, আমি পায়ে একটু তেল দিয়ে দিই। সমস্ত দিনটা পথ হেঁটে এসেছ!"

"তা হোক, ওসব বদ অভ্যেস কিছু দরকার নেই, ওসব কি আমাদের পোষায়? তুমি শোও, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি"—বলিয়া ননী বাহির হইয়া গেল। সমস্ত আকাশ তখন মেঘশূন্য ও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সেদিন শুক্লাদ্বাদশী, নির্ম্মল আকাশে তখন চন্দ্রদেব পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিলেন। বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বনমল্লিকা ও রজনীগন্ধার মৃদু মধুর সৌরভ বর্ষার বাতাসে ধীরে ধীরে বহিয়া আসিতেছিল। চারিদিক একটা স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সময়টা বড় মধুর বড় নিবিড় শান্তিপ্রদ মনে হইল। ননী গভীর আরামে আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া একটা নিগূঢ় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল,—আঃ! এই সুষুপ্ত রজনীতে এই নিভৃত

পল্লীপ্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ীখানার মধ্যে সে এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত! এই দুর্লভ আনন্দময় অবসরটুকুর মূল্য যে কত তাহা মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে শুধু দাসত্বপীড়িত দরিদ্রের অন্তরাত্মা। যাঁহার অজস্র শক্তি স্বাধীনতা আছে, তিনি এ আনন্দের অবিকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন কি না তিনিই জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বিক্ষত দারিদ্র্যের বুক শুধু এই আনন্দের প্রলেপেই সান্ত্বনায় সুস্থ হইয়া উঠে—ইহাই তাহার অমৃত, ইহাই তাহার নির্জ্জীব অসাড়তায় চেতনাসঞ্চারের মৃতসঞ্জীবনী, ইহারই বলে সে সমস্ত জীবনব্যাপী নিন্দা তিরস্কার দুঃখ বেদনা অপমান লাঞ্ছনা হাসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়া দিন কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাই তাহার নিবিড় তৃপ্তির মর্ম্মভরা—আঃ।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে ননী উঠিয়া গ্রামস্থ লোকজনের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল। বধূ তৎপূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাসিপাট সারিয়া স্নান করিযা আসিয়াছিল। শ্বাশুড়ী প্রতিদিনই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, কিন্তু আজ পরের বাড়ীতে শুইতে গিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহার আসিতে বেলা হইতেছে দেখিয়া বধূ রান্নাঘরে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উনান ধরাইবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। বধূ উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিল, শ্বাশুড়ী আসিতেছেন বুঝি ;—না শ্বাশুড়ী নয়, দেবর। ছাতা ও চাদর হাতে গেঞ্জি গায়ে চারুচন্দ্র দ্বারের পাশ হইতে উঁকি দিয়া চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া ভ্রাতৃজায়া হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই ভয় নেই, এস।"

চারু কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কই?"

"দাদা তোমার বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তোমায় এর মধ্যে খবর দিলে কে, ঠাকুরপো?"

"গাঁয়ে ঢুকছি, ভটচাজমশাই বল্লেন"—বলিয়া চারু রোয়াকে উঠিল। 'শাঙার' উপর ঝুপঝাপ করিয়া গেঞ্জি চাদর ও ছাতাটা ফেলিল। কোঁচার কাপড় খুলিয়া কোমরে ফাঁশ দিয়া বাঁধিয়া হাঁটুর কাপড় গুটাইয়া বলিল, "বৌঠান, গাই-দোয়া বোক্নোটা দাও তো, গরুটা আগে দুয়ে নি।"

"ও গো কর্ত্তা, থাম। এই এলে, একটু বসে জিরোও।" চারু লজ্জিতভাবে একটু হাসিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌঠান, একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, ঠিক বলবে?"

বৌঠান বুঝিল কথাটা কি। কষ্টে হাস্য দমন করিয়া বলিল, "কি বলবে বল না?"

চারু রোয়াকের খুঁটিতে নখের আঁচড় কাটিতে কাটিতে ঘাড় হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে বলিল, "আচ্ছা, দাদা কাল আমায় না দেখে কি বল্লে?"

বধূ কপট গাম্ভীর্য্যে বলিল, "কি আর বলবে, আমি বল্লু তোমার ভাদর বৌয়ের জন্যে মন কেমন করছিল, তাই দেখা করতে গেছে। শুনে চাট্রি ফুল তুলে একটি মালা গেঁথে বল্লে, যাই ভাইকে দিয়ে আসি। বেরুচ্ছিল, তা মা বারণ কল্লে, বল্লে 'আওলের দিন, পথে সাপ খোপ আছে, রাত্তিরে আর যাসনি।' শুনে আর গেল না। হয় না হয় দেখে

এস, তোমার সেই বিয়ের টোপরের মাথায় এখনও যুঁইয়ের মালা টাঙ্গান আছে।"

কুণ্ঠিত হাস্যে চারু বলিল, "সত্যি বল না।"

"আমি মিছে কথা বলছি? আচ্ছা মা আসুক, শুদিও।"

" কি কথা বউ"—বলিয়া গৃহিণী দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বধূ তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা, ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাল রাত্তিরে দুগগোডাঙ্গা যাচ্ছিল না মা?"

"কে ননী তো? হ্যাঁ যাচ্ছিলই তো। আমি বারণ কনু, তাই গেল না। তোর সঙ্গে ননীর দেখা হয়েছে চারু? তুই কতক্ষণ এসেছিস?"

"আমি এই আসছি, পথে আসতে আসতে পশ্চিমের মাঠটা ঘুরে দেখে এনু কি না, তাই দেরী হয়ে গেল। ও দু কিতে এবাব বেশ ফুলিয়ে উঠেছে। এবার ওখানে খাসা ধান হবে। বৌঠান, বোক্নো দাও, আমি গাই বের করি।"—চারু সেখানে আর দাঁড়াইল না, পাছে ভ্রাতৃজায়া মাতাব সমক্ষেই আর কিছু ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলিয়া তাড়াতাড়ি সে গোহালঘরে ঢুকিল।

গাভী দোহন শেষ হইলে চারু গোহাল হইতে বলদ দুইটিকে বাহির করিয়া উঠানে বাঁধিল, তারপর ছানি কাটিতে বটি লইয়া বসিল। মাতাও ইতিমধ্যে গৃহের অন্যান্য কায সারিয়া গোহাল মুক্ত করিতে আসিলেন। প্রত্যহ গোশালা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলে গঙ্গাস্নানেব পুণ্য হয়, পল্লী অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেইজন্য ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাটীর গৃহিণী, দাসদাসী সত্ত্বেও প্রত্যহ স্বহস্তে গোশালা মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

ভীমপরাক্রমে ঘ্যাস ঘ্যাস কবিয়া প্রচুর পরিমাণে খড় কাটিয়া, ভিজা খইল মাখাইয়া, গরুকে জাব দিয়া, দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই বালতী লইয়া খিড়কির ঘাট হইতে জল তুলিয়া আনিয়া, গরুর ডাবা ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, ঘাট হইতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া গামছায় দেহের ঘাম মুছিতে মুছিতে চারু বাড়ী ঢুকিল। ধীরেসুস্থে এক ছিলিম তামাক সাজিযা রান্নাঘরের দাওয়ার নিকট আসিয়া বলিল, 'বৌঠান একটু আগুন দাও।"

বৌঠান তখন হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া উনানে জাল ঠেলিয়া বঁটি লইয়া বসিয়া তরকারী বানাইতেছিল। দেবরের কথায় বঁটি হইতে উঠিয়া উনান হইতে একখানা জ্বলন্ত কাঠ বাহির করিয়া দেবরের সম্মুখে সরাইয়া দিল। চারু কাঠখানা ঠুকিয়া কতকগুলা জ্বলন্ত অঙ্গার ভাঙ্গিয়া লইয়া সেটা আবার ফিরাইয়া দিল। কলিকায় আগুন তুলিয়া ফুঁ দিতে দিতে একটু ইতস্ততঃ করিযা সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "বৌঠান, সত্যি কথা বলবে?"

"কি বলব, বল না ভাই।"

"না, তামাসা নয় সত্যি সত্যি বল ত বলি।"

চারুর কথার ভিতর একটা অনুনয়ের কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। স্নেহবিগলিত-হৃদয়া বৌঠান তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না ঠাকুরপো, আমি তোমায় রাগাচ্ছিনু। তোমার দাদা কিছু বলেনি।"

বৌঠানের কথার মধ্যে পরিহাসের গন্ধ নাই দেখিয়া আশ্বস্ত চারুচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বলছ, দাদা রাগ করেনি?"

"ক্ষেপেছ তুমি; পাগল! এর ভেতর রাগ করবার কি আছে? তবে বাড়ী এসে আদুরে ছোট ভাইটির মুখখানি না দেখে মনটা বোধ হয় একবার কেমন কেমন করেছিল, তাই একবার দুগগোডাঙ্গা যাবার ঢেউ উঠেছিল। তা সেও তখুনি থেমে গেছল, মার কাছে আর কিছু বলেনি।"

"তোমার কাছে?"

"আমার কাছে?"—বৌঠান হাসিল, বেগুন বনাইয়া বেগুনের ভিতরটা পরীক্ষা করিতে করিতে উত্তর দিল—"আমার কাছে যদি কিছু বলে থাকে সেটা নেই বা শুনলে ঠাকুরপো। তবে মনে রেখো, তাব জবাবও তোমার দাদা পেয়েছে।"

"দুটো একটা কথা শুনতে পাই না বৌঠান!"

"শুনবে, আচ্ছা একটা কথা বলি, শোন—" বলিয়া ভাতৃজায়া মাঘ মাসে ছোট বধূর আনয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া গেল। চারু হুঁকা আনিবার জন্য আর উঠিতে পারিল না, সেইখানেই বসিয়া দুই হাতে কলিকা টানিতে টানিতে সাগ্রহে গল্পটা শুনিল।

এই দুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী ছিল না, কিন্তু 'একলার ঘর' বলিয়া বধূ বয়সে দেবরের অপেক্ষা দুই চাবি বছরের ছোট হইলেও কথা কহিত,—কেননা, না কহিলে চলিবে না। মান বাঁচাইয়া কথা কহিতে জানিলে কাহারও সহিত কথা দূষণীয় নহে। এই দুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়া, পরস্পরের পরিহাস-সম্পর্কীয় হইলেও,—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর স্নেহের অন্তরঙ্গতা ছিল। চারুচন্দ্র যে আবদাব মাতা ও ভ্রাতার নিকটা জানাইতে সঙ্কুচিত হইত, সে আবেদন বৌঠানের নিকট স্বচ্ছন্দে জানাইয়া, পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহার শরণাগত হইতে দ্বিধা বোধ করিত না,—'বৌঠান'ও তাই নিশ্চিন্ত-নির্ভরশীল দেবরটির ভার পরম যত্নে বহন করিত। তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল, স্বামীর অত্যন্ত স্নেহাস্পদ বলিয়া বৌঠান দেবরটিকে একটু বেশীরকম স্নেহই করিত।

চারুচন্দ্র দাদার অপেক্ষা বছর পাঁচের ছোট ছিল, কিন্তু দাদার ব্যবহারের গুণে মনে হইত, সে যেন তাহার অপেক্ষা আরও অনেক ছোট। দুই ভায়ের মধ্যে চেহাবার বৈসাদৃশ্যও ছিল অদ্ভুত ধরণের। ননীর চেহারা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গঠনের; বার মাস সহরে বাস কবার জন্য তাহার রংটাও বেশ কাচ-কাচ উজ্জ্বল বর্ণের ছিল। মোটের উপর তাহাকে বেশ নধর গঠনের যুবাটি দেখাইত। কিন্তু চারু ছিল, ননী অপেক্ষা লম্বায় চার আঙ্গুল বড়, এবং চওড়ায় তাহার দ্বিগুণ সরু,—সুতরাং ননীর পাশে সে দাঁড়াইলে তাহাকে যেন ননীর ভাই বলিয়া মনেই হইত না। তাতে বারমাস মাঠে ঘাটে ভ্রমণ এবং পল্লীবাসের জন্য তাহাকে অত্যধিক ময়লা ও কঠিন 'শিকরে' গঠনের লোক দেখাইত। তবে তাহার মুখে চোখে একটি সরলতা ও নম্র কোমলতার বেশ সুন্দর শ্রী ছিল, সেইজন্য তাহার মুখ দেখিয়া বয়স 'ঠাহর' করা কাহারও পক্ষে শক্ত কাজ ছিল না।

দেবর ও ভ্রাতৃজায়া বসিয়া কথা কহিতেছে, এমন সময় ননীলাল, 'মা', বলিয়া বাড়ী ঢুকিল

বধূ ঘোমটা টানিল; চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কলিকা রাখিয়া অগ্রসর হইয়া দাদাকে

প্রণাম করিল ; দাদা সস্নেহে ভাইকে বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ এইছিস রে? সেখানকার খবর সব ভাল ত?"

চারু মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "হ্যাঁ, সব ভাল। আমি অনেকক্ষণ এইচি।"

ভ্রাতার শরীরের উপর একবার স্নেহার্দ্র দৃষ্টির স্পর্শ বুলাইয়া ননীলাল ক্ষুণ্নভাবে বলিল, "তুই এমন কাহিল হয়ে যাচ্ছিস কেন রে চারু?—এমন সা জোয়ান ছেলে, দিন দিন রোগ হয়ে যাচ্ছিস কেন?"

"চারিদিকে যে অসুখ বিসুখ হচ্ছে,—সময় তো ভাল নয়"—বলিয়া চারু আর গোটাকতক বাজে কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "তুমি বেশ ভাল ছিলে দাদা?"

"হ্যাঁ ভাই"—বলিয়া ননী আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কলকেটা কোথা গেল রে?"

"আমি সেজে আনছি,"—চারু তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল—"তুমি কোথা গেছলে দাদা?"

"এই একবার চারিদিকে ঘুরে আসতে গেছনু। শেষে অধম্মের ভোগ, বাড়ুয্যেদের বাড়ীতে গিয়েছি, ছোটকত্তা ডেকে নিয়ে বসালে, তা পর মা ব্যাটায়, আঃ! ছি-ছি-ছি কি কেলেঙ্কারীর ঝগড়া গো! ছোটকত্তা পুরুষ মানুষ, কিন্তু এমন মেয়েমুখো, ছিঃ ছিঃ! —কাল বড় ভাই মরেছে, আর আজ সসচন্দে বড় ভাজকে, মাকে সব 'ভেন্ন' করে দিয়েছে! ওরে বাপু, কদিনের জন্যে এইছিস। মর্ত্তে কি একদিন হবে না? আমার তো গা বিষ বিষ কর্ত্তে নাগল। একবার মনে কন্নু বলি, তাপর ভাবনু, গুরু পুরুতের দ্বন্দ্ব, উভয়ে সমান সম্বন্ধ কাকে বলি ভাল মন্দ!—চুপই আচ্ছা!"

হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া হুঁকাটি দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া চারু বলিল—"তুমি জান না দাদা, ওদের সবাই সমান, আর গাঁয়ের নোকই কি কম? নাগবাবুদের এই টেকো বুড়োটা আছেন,—উনি যত মোটা মোটা মালাই গলায় দিয়ে বেড়ান, উনি বড় কম পাত্তর নন। বকাউল্লা মোচরমান সাধ করে বলে যে কত্তা সুদের সুদ হিসেব করে, এক এক মালা অ্যাকার দেন,—আর খাতকদের নিব্বংশ করেন!—তা মিছে কথা নয়, উনিই তো বাঁড়ুয্যেদের ছোটকত্তাকে নাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে এতখানি করালেন। নইলে বড়কত্তা বেচে থাকতে কেউ একদিন ওদের একটি টুঁ শব্দ শুনেছিল!"

"বটে! তাই ত বলি যে ছোটকত্তা তো বড় মন্দ নয়—"

"দাদা, হাতী হেন জন্তু সেও কাণ ভাঙ্গানীতে বশ হয়, ও ত ছেলেমানুষ। ঐ যে বাস্তু ঘুঘুগুনি আছেন, ওঁরাই ত ঝগড়া বিরোধ বাঁধিয়ে ভায়ে ভায়ে ভেন্ন-বেলোগ করিয়ে গাঁয়ে সর্ব্বনাশ কচ্ছেন, কোন ঘরটা ওদের জন্যে আস্ত আছে দেখ ত!"

"দ্যাখ চেরো"—ননী হুঁকা নামাইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল—"দ্যাখ চেরো, এই আমি তোকে বলে রাখছি,—আমি যদি মরে যাই তো,—তোর ভাজকে আর মাকে এক মুটো ভাত দিতে যেন কক্ষণো কাতর হসনি। কারুর কথা শুনে, আপনার নোককে পর করবার জন্যে নাচিসনি—"

"আহা, কি যে বল দাদা"—চারু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। ননীলাল দৃঢ়স্বরে বলিল—"নারে, মরণ কথা গাল নয়,—তাই তোকে আগে থেকে বলে রাখছি।" ননী হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এ-বেলা আর মাঠে যেতে হবে না?"

"এ-বেলা না গেলেও চলে কিন্তু ও-বেলা যেতে হবে, খানকতক জমী নিড়ুতে হবে"—

ননী রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আচ্ছা, ও-বেলা যাস। এবার সব জমীতেই তো দেখনু বেশ ধান হয়েচে—"

"হুঁ, সময়ে যদি বৃষ্টিটুকু হয় তো এবার চারপো ধান নিশ্চয়!"—বলিয়া চারু হুঁকা লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ননী রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল বধূ উনানে কড়ায় তরকারী সাৎলাইতেছে—ভাত হইয়াছে, তরকারী হইতেছে, অতঃপর ডাল চড়িবে। ননীকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বধূ হাসিয়া বলিল, "ভাইকে বুঝি সব তত্ত্বকথা শোনান হচ্ছিল?"

"তুমিও শুনেছ তো। ভালই হয়েছে, মনে রেখো।—এখন চারুকে কিছু জল-টল খেতে দাও দেখি, কালকের সেই বর্দ্ধমানের মেঠাই আছে, আর আম-টাম আছে, ছাড়িয়ে দাও।"

"দিই"—বলিয়া বধূ তরকারীতে জল ঢালিয়া তাহা ফুটিতে দিয়া উঠিয়া পড়িল, যথা নির্দ্দেশমত দেবরের জলযোগের আয়োজন করিতে করিতে বলিল—"তুমি সুদ্ধ খাও না কিছু।"

"না, আমায় তেল দাও, আগে চান করে আসি। মার এত দেরী হচ্ছে কেন? কতক্ষণ মা নাইতে গেছে?"

"অনেকক্ষণ, তবে মা বোধ হয় একেবারে জেলেবাড়ী থেকে মাছের ভাগা কিনে নিয়ে আসছে, তাই দেরী হচ্ছে।"

"ওঃ আচ্ছা। মার জন্যেও কিছু বানিয়ে রাখ,—আম, শশা, পেয়ারা—তুমিও এবার জল খাও না।"

"আচ্ছা সে হবে এখন, তুমি খাও তো।"

"চারুকে এইখানেই জল খেতে দাও না, সে সামনেটায় বসে জল খাক, আমি এইখানে বসে তেল মাখি—"

"তবে ডাক ঠাকুরপোকে। কিন্তু দ্যাখ, তুমি যেন আর ওকে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা নিয়ে কিছু বোলো না। বেচারী লজ্জায় মাটি হয়ে আছে, বাড়ী ঢুকছে চোরের মত উঁকি ঝুঁকি দিয়ে। ভাগ্যে তুমি ছিলে না,—না হলে বোধহয়, আচ্ছা এখানে ঠাকুরপোকে ডাক—" বলিয়া বধূ জলখাবারের পাত্র ও একঘটি জল রাখিয়া দিল। ননীলাল—"চারু —চারু" শব্দে দুই ডাক দিতেই, চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া রান্নাঘরের নিকটস্থ হইল। ননীলাল বলিল, "ঢের বেলা হয়েছে, জল খা।"

চারু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এর মধ্যে? তুমি খাবে না?"

"নাঃ, আমি আগে চান করে আসি ভাই, তুই খেয়ে দ্যাখ দেখি আমগুলো মিষ্টি কেমন।"

বধূ উনানের ফুটন্ত ব্যঞ্জন খুন্তি দিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঘোমটার ভিতর হইতে দেবরের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "নতুন বিয়ের পর থেকে মুখে সবই মিষ্টি নাগে,— কিছুই মন্দ নাগে না, না ঠাকুরপো?"

চারু কিছু বলিল না, লজ্জিত মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া আহারে বসিল। ননীলাল একবার গোপনে হাস্য-রুদ্ধ অধরে স্ত্রীর সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, তৈল মাখিতে বসিল।

এইরূপে একটি একটি করিয়া ছুটির দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল।

গ্রামের জমীদার পরাণ সিংহ বড় 'দ্যঁদে' লোক! পাশাপাশি দশ বারখানা গ্রামের তালুকদার তাঁহাকে যমের মত ভয় করিয়া চলে! মিথ্যা মামলা সাজাইতে, সত্যকার খুন জখম ঢাকিয়া ফেলিতে—এবং নির্ব্বিবাদে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া দিতে তাঁহার মত সুদক্ষ লোক আর ছিল না।

ননীর প্রভু নীরদ চাটুজ্যে মহাশয়ই পরাণ সিংহের প্রধান উকীল,—কেননা তিনি —'বোকতিতে কোরে দিনকে রাত বানাইয়া' বিপক্ষ পক্ষের উকীলের পিতৃপুরুষের নামও ভুলাইয়া দিতে পারিতেন কি না,—সেই জন্য পরাণচন্দ্র তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, এবং নীরদ চাটুজ্যের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপিত হইলে পরাণচন্দ্র বলিতেন, 'আহা, মানুষ গাঁটের কড়ি খরচ করে যদি কোন বিদ্যে শেখে তো, সে যেন ওকালতি শেখে। — হ্যাঃ, সার্থক শিক্ষে বটে—আমার হরে আর কেলোকে আমি ওকালতী শেখাবই। আহা কত মানের ব্যবসা বল দেখি, রাজা উজীর এসে পায় তেল মালিস করে, জজসাহেব হুকুমের ইসারায় কলম চালায়, এমন বিদ্যে কি আর আছে গা!—"

যাত্রার পূর্ব্বদিন ননীলাল তাই জমীদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। পরাণচন্দ্র তাহাকে প্রথামত খাতির যত্ন করিয়া,—শেষে ফিরিবার সময় বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার মেদিনীপুরের সেই সঙ্গীন মামলাটির সম্বন্ধে উকীল কতদূর কি করিতেছেন, —সে বিষয়ে সন্ধান লইয়া ননীলাল সেখানে পৌছিবার পরদিনই যেন তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত খুলিয়া লেখে, তিনিও দিন দশ পরে মেদিনীপুর যাইবেন—কিন্তু তাহার আগে 'নিট' খবরটা জানিতে পারিলে তিনি আশ্বস্ত হন। ননী স্বীকৃত হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন চারুর জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া, গৃহস্থালীর সমস্ত বন্দোবস্ত গুছাইয়া দিয়া রোদনোম্মুখী জননীকে প্রণাম করিয়া, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং দুইটি অশ্রুসিক্ত সকরুণ চক্ষুর নিকট নীরব বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ননী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিল। তাহার মনীব তখন মেদিনীপুরে ছিলেন, ননী সেইখানেই চলিল। বাড়ীতে বলিয়া গেল,—সেখানে যাইয়াই সে পৌছান সংবাদ পাঠাইবে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৩

আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন

(সত্য ঘটনা)

আজকাল আত্মিক তত্ত্ব লইয়া চারিদিকেই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষপাতী মানুষ এ জগতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের সংস্কার মার্জ্জিত, যাঁহারা শিক্ষা, সাধনা ও আত্মানুশীলন বলে সাধারণ মানবজ্ঞানের উর্দ্ধে বিচরণক্ষম,—তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দর্শন কাহিনীর মধ্যে সত্যানুসন্ধান-ব্রতীদের আলোচনার মালমশলা অনেক সংগৃহীত হইতে পারে। এই শ্রেণীর একটি পূজ্যপাদ বৃদ্ধের প্রত্যক্ষ-দর্শন ব্যাপার আজ মানসী ও মর্ম্মবাণীর পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

পূজনীয় প্রত্যক্ষদর্শী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বয়স বর্ত্তমানে ৬৫ বৎসরের উপর। প্রথম জীবনে ইনি কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক শিক্ষকগণের ছাত্র ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেটে প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপর গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মজীবনে ইঁহার সততা, সৎসাহস, তেজস্বিতা ও বিশ্বস্ততার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইহার সদগুণের জন্য ভূতপূর্ব্ব মহারাজ আফতাবচন্দ বাহাদুর ও বর্ত্তমানের মহামান্য শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইনি উপস্থিত শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু বর্দ্ধমানের অশেষ গুণালঙ্কৃত গুণগ্রাহী মহারাজ বাহাদুরের কাছে ইঁহার গুণের সম্মান আজিও বিশেষ আদরণীয় হইয়া আছে।

ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গেও এই জ্ঞানতপস্বী সাধকের বিশেষ উচ্চাঙ্গের পরিচয় আছে। শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক, দৃষ্টান্তশতক প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের ইনি সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ কবিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। "বাসি ফুলহার" নামে ইঁহার একখানি কবিতাপুস্তক সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের উচ্চতা ও মিষ্টতায় বইখানি "অম্লান পঙ্কজমালা" বলিয়া বিজ্ঞসমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বর্দ্ধমান রাজবংশের আদ্যোপান্ত পরিচয়, রাজপরিবারের প্রধান প্রধান ঘটনা ও বৈষয়িক বিবরণ ও এতদঞ্চলের বহু বিস্মৃতপ্রায় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বিপুল অধ্যবসায়ে ইনি একটি সুবৃহৎ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। বহিখানির নাম "রাজবংশানুচরিত"। বহিখানি পড়িলে দেশের একটি মহাগৌরবশালী অভিজাত বংশের এবং দেশের পূর্ব্ব অবস্থার সম্বন্ধে এমন বহু সারবান বিবরণ জানা যায়, যাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। বর্দ্ধমান মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, দয়াদাক্ষিণ্য ও মহাপ্রাণতার পরিচয় পড়িতে পড়িতে আনন্দ, কৌতহল, সম্ভ্রম, গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, এবং সে সকল স্মৃতির বিবরণ-সংগ্রহকর্ত্তার নিপুণ অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময় জাগে।

পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানে দৃষ্টিশক্তি-হীনতার জন্য এই সাধক লেখনী নিশ্চল রহিয়াছে। না হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্য ইঁহার আরও কত সাধনার দান লাভে অলঙ্কৃত হইত কে জানে?

ইনি বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন। ইহাঁর একটি স্বপ্নের দৃশ্য কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে বাস্তবের সহিত মিলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে ইনি নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছেন, যথাসাধ্য অবিকল লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"প্রায় বত্রিশ বৎসর আগের কথা, তখন আমি এই বর্দ্ধমানেই আছি। একদিন রাত্রে খুব গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোথায় এক সহরের মধ্যে একটি পাথর বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তার উপব দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছি। রাস্তার দুইপাশে নানারকম ঘরবাড়ী ও দোকানশ্রেণী রহিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় নির্ব্বিবাদে স্পষ্ট অনুভব হইল যেন সেগুলা আমার বহুদিনের পরিচিত।

সেই পাথরের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে কিছুদূর আসিয়া একটি সুদৃশ্য বারান্দাযুক্ত দোতলা বাড়ীর সামনে পৌঁছিলাম। বাড়ীখানি রাস্তার পাশেই। স্বপ্নে মনে হইল যেন বাড়ীখানা আমার নিজের।

স্বচ্ছন্দে বাড়ীর ভিতব ঢুকিলাম। চকমিলানো বারান্দাযুক্ত সুন্দর অন্তঃপুর। বারান্দার পাশে কক্ষশ্রেণী। উঠানের একপাশ দিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ডান পাশে কুয়া। তার কিছু দূরে পায়খানা। সিড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, দ্বিতলের চকমিলানো বাবান্দায় পৌঁছিলাম। বারান্দারও চারিপাশে কক্ষশ্রেণী। এ-বারান্দা ও-বারান্দার চারিদিক ঘুবিলাম, সমস্ত ঘরগুলা ঘুবিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। কি উদ্দেশ্যে ঘুরিতেছি তাহা কিছুই মনে হইল না। শুধু সবই আমার বহুদিনেব পবিচিত, আমার নিজের বাড়ীঘর—এইটুকুই মনে হইতেছিল।

চারিদিক ঘুরিয়া আবার যেন আমার সেই নিজের বাড়ী হইতে বাহিব হইলাম। সেই রাস্তা ধরিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া, বেলেপাথরের পাচিল ঘেরা সুন্দর পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো একটি পুকুর দেখিতে পাইলাম। এই পুকুরটি পর্য্যন্ত আসিয়া সেই পাথরের রাস্তাটি শেষ হইয়াছে। পুকুরেব বাম পাশ দিয়া একটা মেটে রাস্তা বাহির হইয়াছে, আমি সেই রাস্তা দিয়া আবার অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

কিছু দূর গিয়া, কতকগুলি সিড়ি দেখিতে পাইলাম। সিঁড়িগুলি রাস্তার পাশ দিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। আমি সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির একপাশে একটি বটগাছ রহিয়াছে। গাছটির গোড়া পাথর দিয়া বাঁধান।

গাছটি ছাড়াইয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়িটি শেষ হইয়াছে। সম্মুখেই সুদূর-বিস্তৃত একটা বালি ঢাকা নদী রহিয়াছে। নদীর জল কিছুমাত্রই দেখা যাইতেছে না, সমস্তই বালি-ঢাকা। তবু যেন আমি বুঝিলাম, সেই বালি-ঢাকা বিশাল-বিস্তার স্থানটি নদী।

এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখিয়া সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত স্বপ্নটা প্রত্যক্ষদৃষ্টের মত স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। বর্দ্ধমান রাজসরকারের কার্য্যের জন্য পশ্চিমের অনেক সহরে ঘুরিয়াছি। অনেক স্থানে অনেক রকমের পাথরের রাস্তাঘাট দেখিয়াছি, কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখিলাম সে-স্থান জীবনে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। অথচ ঘুম ভাঙ্গিবার পর সেই জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেন মনে হইতে

লাগিল স্বপ্নদৃষ্ট স্থান ও বাড়ীঘরগুলি বাস্তবিকই কখনও দেখিয়াছি, সেগুলি আমার বিশেষ পরিচিত। কিন্তু কোথায় কখন দেখিয়াছি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

কিছুদিন পরে স্বপ্নের কথা ভুলিলাম। এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, গয়াধামবাসী কোন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা ববযাত্রীদল বর লইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলাম। প্রকাশের পিতা পরলোকগত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত সৌখীনগোছের লোক ছিলেন। গানবাজনায় তাঁহার বড় ঝোঁক ছিল। গায়ক বাদক দলও আমাদের সঙ্গে চলিল। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, গায়ক, বাদক সম্প্রদায় লইয়া আমাদের দলটি বেশ বড় রকমেরই হইয়াছিল।

বৈবাহিক মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট বাসার উঠিয়া আমরা প্রথমে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিলাম। তারপর বৈকালের দিকে বৈবাহিক মহাশয়ের প্রেরিত একজন গয়ালীর সঙ্গে আমরা দলশুদ্ধ সকলে সহব দর্শনে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমাব ভাগ্যে গয়াক্ষেত্র দর্শনের সুযোগ কখনও ঘটে নাই—এই আমার জীবনে প্রথম গয়াদর্শন। আমি চারিদিক দেখিতে দেখিতে বন্ধুদেব সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। গয়ালী মহাশয় পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের আগে আগে চলিলেন।

অনেকগুলি রাস্তা ঘুরিয়া, নানা স্থান দেখিয়া শেষে আমরা একটি পাথর বাঁধানো রাস্তায় আসিয়া পৌছিলাম। বাস্তাটি চলিতে চলিতে চারিদিক চাহিয়া সহসা আমি কেমন বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন বাস্তাটা আমার বিশেষ পরিচিত, এ রাস্তা দিয়া আমি পূর্ব্বে কোন সময যাতায়াত কবিয়াছি, এবং নিশ্চয় যে কোন সময হউক, এ রাস্তা আমি দেখিয়াছি—এ বাস্তা আমার আদৌ অপরিচিত নয়।

আবার মনে হইল, তাই বা কিরূপে সম্ভবে? ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও গয়াধামে আসি নাই। পূর্ব্বে এ পথ দিয়া হাঁটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাবিতে লাগিলাম, তবে বোধহয় অন্য কোন স্থানে এইবকম ধরণেব রাস্তা দেখিয়া থাকিব।

ইতিপূর্ব্বে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম। অনেক শহবে অনেক পাথরের রাস্তা দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক এইরকম রাস্তা সে সকল স্থানের মধ্যে কোথায় কখন দেখিয়াছি, কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। অথচ এই রাস্তাটা যে আমি বিশেষ কবিয়া পূর্ব্বে দেখিয়াছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, কিছুই মনে পড়িল না। মনে মনে বড় সংশয় বোধ হইতে লাগিল।

অবাক হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই এই রাস্তা ও দুইপাশের সমস্ত বাড়ীঘর দোকানপত্র সমস্তই আমার পূর্ব্বপরিচিত। এ রাস্তা দিয়া নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আমি কোনও সময় আসা যাওয়া করিয়াছি।

বিস্ময়, সংশয় এবং কৌতূহলে আমি নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্যমনস্কভাবে নীরব গম্ভীর হইয়া পথ হাঁটিতেছি দেখিয়া সঙ্গীরা কেহ কেহ পরিহাস করিলেন, কেহ বা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে রাখাল, তুমি কি এত ভাবছ বল দেখি?'

বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারিলাম না ; কিন্তু ভাবনাটা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলাম, পথটা আমার এমন পরিচিত হইল কি করিয়া? আমি কস্মিনকালেও যখন গয়ায় আসি নাই, তখন নিশ্চয়ই এ পথ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। কিন্তু ঠিক এইরকম একটা পথ আমি কোথায় দেখিয়াছি, বেশ মনে পড়িতেছে, কিন্তু কোথায়? সেই পথের সঙ্গে এই পথটার সৌসাদৃশ্য বড় অদ্ভুত!

চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম সেখানে রাস্তার বাম পাশে, একটি সুদৃশ্য বারান্দাযুক্ত দ্বিতল বাড়ী রহিয়াছে। বাড়ীখানির দিকে চাহিয়া তাহার সম্মুখ-দৃশ্য চোখে ঠেকিবামাত্র হঠাৎ বিদ্যুতের মত দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই স্বপ্নটির স্মৃতি আমার মনে পড়িয়া গেল!—চকিতে মনে হইল, এই ত ঠিক! এই সেই বাড়ী, এই সেই পথ। এই সমস্ত দৃশ্যই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি।—বাস্তব জীবনে এ-স্থান আমি কখনও চোখে দেখি নাই। এ স্থানটার বর্ণনা কখনও কাহারও মুখে শোনা দূরে থাক—কখন কল্পনাও করি নাই। শুধু সেই স্বপ্নে মাত্র এইসব দৃশ্য আমি দেখিয়াছি।

স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে সমস্ত মনে পড়িয়া গেল। অভাবনীয় বিস্ময় ও আনন্দের উত্তেজনায় আমি প্রায় চীৎকার করিয়াই সঙ্গীদের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলাম, 'ওহো তোমরা দাঁড়াও, একটা মজার কথা শোন—এই বাড়ী আমার—'

আমার উত্তেজনা দেখিয়া সঙ্গীরা সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন বর্ষণে পরিহাস কৌতুক করিতেও বন্ধুদের কেহ কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। সাতকড়ি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি?'

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, 'এই রাস্তা, এই বাড়ী আমি দু তিন বছর আগে একদিন স্বপ্নে দেখেছি। এর আগে আমি কখনো গয়ায় আসিনি, কিন্তু সেই স্বপ্নে এইসব দৃশ্য আমি এত স্পষ্ট করে দেখেছি যে, সব আমার মনে আছে। স্বপ্নে আমি এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছি; এর কোথায় কোন ঘর কোন বারান্দা দেখেছি সব আমার মনে আছে —আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা শোন।'

আমার উত্তেজিত চীৎকারে সেই নিরাপদ আনন্দযাত্রার মাঝে হঠাৎ ছন্দোভঙ্গ হওয়ায় আমাদের "গাইড" গয়ালী ঠাকুরটি এতক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তাহার অর্থ তিনি কতদূর কি বুঝিলেন, সে সংবাদ অন্তর্য্যামীই জানেন। সহসা এই সময় ছুটিয়া আসিয়া একেবারে আমায় চাপিয়া ধরিলেন, 'কেয়া বাবুজি, তুম ইয়ে মকানমে আয়ে থ্যে? হাম ইয়ে মকান কিরায়া লিয়া মে। হামারা যাত্রীলোক আকে ইয়ে মকামমে রহতে হঁয। বোলো বাবু, তুমহারা নাম কেয়া?'

তারপর তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নামধাম তলব করিয়া খাতাপত্র মিলাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি ধমকাইয়া তাঁহার সে উৎসাহ ঠাণ্ডা করিয়া বলিলাম, 'তুমি এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছ? আচ্ছা বল দেখি, এই বাড়ীর ভিতরদিকটা ঠিক এই রকম কি না?'—বলিয়া আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিলাম।

গয়ালী অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, আমার বর্ণনা সমস্তই নির্ভুল। তারপর সে অত্যন্ত কাতরতার সহিত অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল যে, আমি যখন পূর্ব্বে এ বাড়ীতে আসিয়া বাড়ীর অবস্থা সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছি, তখন আর আমার অস্বীকার করা

উচিত নয়—আমি তাহারই অধিকারভুক্ত যজমান। অতএব তাহার হাতেই আত্মসমর্পণ করা এবার আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

সঙ্গীরা তখন খুব কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন। গয়ালীকে থামাইয়া তাঁহারা আমায় বলিলেন, 'স্বপ্নে আর কি দেখিয়াছ বল।'

আমি সেই পাথরের রাস্তার শেষ সীমায় যে পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো পাথরের প্রাচীর বা পাড়-বেষ্টিত পুকুর দেখিয়াছিলাম, সেই পুকুর, মেটে রাস্তা, এবং তাহার কিছু দূরে সিঁড়ি ও সিঁড়ির পাশে যে পাথরের গোড়া বাঁধানো বটগাছ দেখিয়াছিলাম, সমস্ত যথাযথ বলিলাম। গয়ালী ঠাকুরটি উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য ও কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, প্রত্যেক বিবরণই অক্ষরে অক্ষরে ঠিক এবং আমি যখন ইতিপূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে আসিয়াই সবই দেখিয়া গিয়াছি তখন আমি তাঁহারই যজমান। তিনি ছাড়া আর কাহাকেও পাণ্ডা বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে।

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমি স্বপ্ন বর্ণনা করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে বালুকাবৃত নদীর কথা উল্লেখ করিতেই গয়ালী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'হাঁ বাবু, এই ত ফল্গু হ্যায়!'

আমি বলিলাম, 'তা আমি জানি না, তবে স্বপ্নে এই পর্য্যন্ত দেখেছি।'

আমার কথা শেষ হইলে সঙ্গীরা অনেকেই অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন—'স্বপ্নদৃষ্ট স্থানটা যখন বাস্তবের সঙ্গে মিলেছে, তখন এস, সকলে মিলে, নিজ নিজ চোখে আগাগোড়া সমস্ত দেখে আশা যাক।'

গয়ালীর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ভিতরের সমস্ত অংশ আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিলাম। ঠিক যেখানে যেরূপ বারান্দা, যেরূপ স্থানে সিঁড়ি প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম সবই ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। তারপর বাড়ীর বাহির হইয়া আমরা ফল্গুতীর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া সব দেখিয়া আসিলাম। আমার স্বপ্নদৃষ্ট বর্ণনার সঙ্গে কিছুমাত্র কোথাও ভুল হইল না।

আমার সেদিনের সেই সঙ্গীদের অধিকাংশই আজ ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেবল দুইজন মাত্র জীবিত আছেন, তাঁহারা এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী। তাঁহারা বর্দ্ধমানেই আছেন। তাঁহাদের একজন বর্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন; দ্বিতীয় ব্যক্তি—বর্দ্ধমান রাজসংসারের আশ্রিত, তনখাভোগী, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ ঘোষ। ইঁহাদের কাছে সন্ধান লইলে এ ঘটনার সত্য সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।"

জানি না, স্বপ্নবিজ্ঞানবিদগণ পূজনীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই স্বপ্নকে বিচার করিয়া কি বলিবেন। তবে যাঁহারা মনে করেন জাগ্রৎ অবস্থায় মানুষের মন বুদ্ধি যে সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করে, স্বপ্নাবস্থায় তাহারাই স্মৃতিসংস্কারজাত দৃশ্য দেখিতে পায় মাত্র, তদতিরিক্ত আর কিছুই দেখা সম্ভব নয়,—তাঁহাদিগকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আশ্চর্য্য—অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, জ্ঞানের অতীত স্বপ্নটির কারণ কি, বিচার করিয়া দেখিতে অনুরাধ করি।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, চৈত্র ১৩২৮

বিজয়ার নমস্কার

ভাদ্র মাস। সমস্ত দিনের বৃষ্টির পর, সন্ধ্যায় সেই-সবে বর্ষণ বন্ধ হইয়াছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিয়া যাইতেছিল। আধ-ঝলসানো ভিজে কাঠে উপর্য্যুপরি ফুঁ দিতে দিতে, ব্যথা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অশ্রু-সজল চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "ঝি, খানকতক শুকনো ঘুটে এনে দাও না।"

রান্নাঘরের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া ঝি তন্দ্রার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল। অনুরোধ শুনিয়া বিরক্তস্বরে বলিল, "এই বর্ষার দিনে শুকনো ঘুঁটে পথে বসে কাঁদচে! গরজ থাকে, খুঁজে নাও গে।"

"অগত্যা।—" বলিয়া ব্যথা উঠিল। ঝির সামনে হইতে হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া উঠানের ওপাশে কয়লার ঘরে যাইতে যাইতে বলিল, "বেরালে যেন দুধ না খায় ঝি, একটু দেখো।"

দ্বিতলের বাবেণ্ডা হইতে চাকর হাঁক দিল, "গরমজল শীগ্গী দিয়ে যাও বেতাদি।"

দ্বিতলের হলঘর হইতে মেজবাবু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কেন? তুমি যেয়ে আনতে পার না, নবাব পুত্তুর!"

ব্যথা শুনিল, একটু ম্লান হাসি হাসিল! কয়লার ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া খান চার শুক্নো ঘুটে লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিল। বিপুল উৎসাহে, আবার উনান জ্বালিতে বসিল।

চাকরটি দুম দুম শব্দে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঝাঁঝিয়া বলিল, "জল দাও।"

"দিই বাপু, দাঁড়াও।"

চাকর ধমকাইয়া বলিল, "এখনো হয়নি? কি করছিলে অতক্ষণ?"

"নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলুম। দ্যাখ পাহাড়ি, আমার ধমক দিবার ঢের লোক আছে। তুমি আর বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপিও না বাপু?"

পাহাড়ী বড়বাবুর আদরের চাকর। বাড়ীর বাবু কয়টী ও তাঁহাদের গৃহিণী কয়টী ছাড়া আর কাহাকেও 'মনুষ্য জ্ঞান' করিয়া চলা, তার কোষ্ঠিতে লেখা নাই। ব্যথার কথা শেষ হইতে না হইতে রুখিয়া বলিল, "কিসের—'শাকের আঁটি' বল ত? 'ইষ্টুভ' জ্বেলে জল গরম কর্ত্তে বললে,—ওদিকে বড়-মা আমায় বারুণ করলেন,— ইসপিরিট খরচ করিসনি। আমি কি করব বল ত? মুনিবের কথা রাখব, না চাকরের কথা শুনব?"

ব্যথা নিরুত্তর রহিল। অন্নদাসত্বের পায় মাথা বিকাইয়া চলা ভিন্ন যাহাদের অন্য গতি নাই,—আত্মীয় অভিমানে 'মানের কান্না কাঁদিতে বসা' তাহাদের সাজে না। বাড়ীর ঝি-চাকরদের অবহেলা,—এমন কি অপমানগুলাও নিঃশব্দে তাহাদের সহ্য করা চাই! রাগিয়া প্রতিবাদ করা? ফল কি? যাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অনাত্মীয়ের আশ্রয়ে আশ্রয়লাভ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই, অন্যায্য অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহাদের কই? এই ঝি চাকরগুলা নিশ্চিত জানে, স্বাধীনতা ও পদমর্য্যাদায় তাহারা প্রভুগোষ্ঠীর আশ্রিতা এই ব্যথার চেয়ে উচ্চ জীব। আজ এ বাড়ী ছাড়িলে কাল তাহারা

অন্যত্র চাকরী জুটাইবে। কিন্তু ব্যথার এই অর্থহীন—অর্থাৎ নগদ মুদ্রাহীন, আত্মীয়-সম্পর্কের অন্নদাসত্ব, এটার নড়চড় হইবার যো নাই। প্রভুরা অবশ্য খুসী হইলে আশ্রিতাকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারেন, কিন্তু ব্যথার পক্ষে নিজ হইতে নিজের পথ দেখিবার ক্ষমতা নাই। কারণ, বাংলা মুল্লুকের মেয়ের পক্ষে তাতেই জাতিনাশ অনিবার্য্য। এদেশের প্রত্যেক মেয়ের জাতি—শুধু পরের রসনার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের উপর নির্ভর করে বই ত নয়? সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে হউক,—যাইলেই হইল! ও জিনিষটা যাইবার পক্ষে পয়সাকড়ির খরচও নাই,—বিচার, বিবেচনার আবশ্যকও নাই। রাজ-বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরাইবার সময় জল্লাদকেও একবার রাজার দোহাই দিতে হয়! কিন্তু এদেশের মেয়েদের জাতি-চ্যুত করিবার সময় সে সব কোন বালাই নাই। কারুর দোহাই ত নয়ই, কাউকে একটা কৈফিয়ত দিবার আবশ্যকতাও নাই! সুতরাং বিশেষ সুবিধাজনক ব্যাপার! অতএব তাহাকে যা খুসী, স্বচ্ছন্দেই বলা চলে।

ব্যথাকে নীরব দেখিয়া পাহাড়ী কি ভাবিল, কে জানে। একটু থামিয়া সংযত স্বরে বলিল, "বাজারের হিসেবটা এখন লিখবে?"

ব্যথা সংক্ষেপে বলিল, "অপর কাউকে দিয়ে লেখাও গে।"

চাকর নরম সুরে বলিল, "কে লিখবে? বড়-মা, মেজ-মা, পিসিমা সবাই তাস খেলচেন। ওরা কি কেউ লেখে কোনদিন?"

অতএব অন্নদাস বলিয়া ব্যথাই একা চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছে! বাড়ীর সকলের সমস্ত ফরমাস তাহাকে খাটিতে হইবে,—গৃহস্থালীর সকল দিক দেখিতে হইবে, বামুনের অনুপস্থিতে বৃহৎ পরিবারের রন্ধন পরিবেশনের ভার লইতে হইবে। তারপর বাড়ীর যে ঝি-চাকর যখন যে কাজে অনুপস্থিত থাকিবে,—তার অধিকাংশ কাজেই ব্যথার ডাক পড়িবে। অথচ ব্যথার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলা নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্যথা হাজার কাজে যোড়া থাকিলেও— কেউ সেগুলার একটাতেও হাত দিবে না। যতক্ষণে ব্যথা ছুটি পাইবে, ততক্ষণে আসিয়া সে সব কায সারিবে। কেন না, বাড়ীর অন্য সকলের অবস্থার সঙ্গে ব্যথার অবস্থার পার্থক্য অনেক।—সে উপায়হীনা! সে পরনির্ভরশীলা! ইহাদের অনুগ্রহ —তা সে যত বড় নিগ্রহ অত্যাচারে পূর্ণ হউক না কেন,—সেই অনুগ্রহ ছাড়া আজ এ পৃথিবীতে ব্যথার দাঁড়াইবার স্থান নাই।

বিদ্যুচ্চমকের মতই নিজের অবস্থা-স্মৃতি ব্যথার মনে পড়িল। নিজের অজ্ঞাতেই ব্যথা করুণ হাসি হাসিল! ভিক্ষা এবং অনুগ্রহের দান ভিন্ন, যাহার বাঁচিবার উপায় নাই, —ধর্ম্ম হউক, সমাজ হউক, লোকাচার হউক, বা স্বয়ং অদৃষ্টই হউক, যাহাদের নিজ শক্তিতে অন্ন সংগ্রহের পথগুলা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে—'লাথি ঝাঁটা খাইয়া "চুপটি করিয়া" ঘৃণিত জীবন যাপনই' পরম নিরাপদ। আশ্রয়দাতার দাসদাসীর কটূক্তিতে রাগ করা, ব্যথার অবস্থার পক্ষে লজ্জা ও মূর্খতার বিষয়!

নিজেকে সামলাইয়া ব্যথা মৃদুস্বরে বলিল—"সকলের খাওয়া হলে তবে আমি ছুটি পাব। তখন আমি লিখব। সাড়ে সাত টাকার বাজার খরচ, এক মিনিটে লেখা হবে না ত? জল নিয়ে যাও।"

চাকর অপ্রসন্নভাবে বলিল—"হিসেব লেখা না হলে আমি ছুটি পাই না। ওদিকে

বড়বাবু ছোটবাবু সবাই পা টেপবার জন্যে হাঁকাহাঁকি করেন। আমার পরাণটা গেল!—"

ব্যথা এবার সত্যসত্যই রাগ ভুলিল। সহানুভূতিকরুণ কণ্ঠে বলিল, "কি করব বাবা? আমার দুটো ছাড়া হাত নেই, আর হেঁসেলের কাজেই এখন এ দুটো যুড়ে রাখতে হয়েছে। হিসেব লিখি কি করে?"

"সেই ত—", বলিয়া চাকর গরম জল লইয়া প্রস্থান করিল। ব্যথা ঝোল তরকারী ঢাকা দিয়া হেঁসেল গুছাইতে লাগিল।

২

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের উঠান হইতে দ্বারবান হাঁকিল,—"ঝি, বাহার আসো। কোন মায়ি আসছে. ইনকো অন্দরমে লিয়েঁ যাও।"

সুখ-তন্দ্রার ব্যাঘাতে ঝি খুসী হইতে পারিল না। কিন্তু বড়লোক মনিবদের অতিথি কুটুম্বিনীদের সসম্মান অভ্যর্থনা না করিলে, উপায় নাই। চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহিরের দিকে ছুটিল।

মিনিট পাঁচ পরেই ব্যথা শুনিল, বাহিরে কোন এক অপরিচিত নারীকণ্ঠের কি একটা অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে ঝি উগ্র বিরক্তিভরে ঝঙ্কার দিতেছে,—"বোথা দেবী আবার কে? বোথা-টোথা এখানে কেউ নাই।"

অপরিচিত নারীকণ্ঠে সবিস্ময়ে প্রশ্ন হইল, "সে কি? এই ত এ্যাটর্ণী ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ী?"

"হে! তা বলে বোথা দেবী এখানে কে আছে?"

"ব্যথা দেবী! এখানে থাকেন না তিনি?"

"না গো বাছা, না। এখানে বোথা দেবী নাই!"

ব্যথাকে খোঁজে কে? ব্যথা আশ্চর্য্য হইল! চট করিয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, অনাড়ম্বর শুভ্র- পরিচ্ছদ-ভূষিতা এক প্রৌঢ়া ভদ্র-মহিলা। তাঁহার চোখে সোণার চসমা, পায়ে জুতা। সঙ্গে এক দাসী।

ব্যথা নমস্কার করিয়া বলিল, "কাকে খুঁজছেন?"

"ব্যথা দেবীকে! তিনি কি এই বাড়ীতে—?"

"কোথেকে আসছেন?"

"আনন্দ-পত্রিকা অফিস থেকে।"

ব্যথা ব্যথিতভাবে ঈষৎ হাসিল। ঝির দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি দয়া করে রান্নাঘরটায় বোস গে। কেউ খেতে এলে আমায় ডেকে দিও।—"

মহিলাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "নমস্কার! এদিকে আসুন।"

মহিলাটি প্রতি-নমস্কার করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যথার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যথা দেবী কই?"

"আসুন, পরিচয় দিচ্ছি।"

"আপনি কি?—" তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে ব্যথার দিকে চাহিলেন।

ঈষৎ সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যথা বলিল, "আসুন।"

রান্নাঘরের অদূরে ভাঁড়ারঘরের পাশে একটি ঘর ছিল। স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র ঘর। একটা তক্তপোষেই যেন সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া গিয়াছে। তক্তপোষের উপর একখানি ছোট শতরঞ্চি ও আধ-ময়লা চাদর, আধ-ময়লা ওয়াড় পরানো একটী বালিশ এ-প্রান্তে পড়িয়া আছে। একটা অল্প দামের মশারি দেয়ালের প্রেকের উপর ভর দিয়া কষ্টে সৃষ্টে ঝুলিতেছে। ঘরের এক কোণে দেবদারু কাঠের একটি বাক্সের পিঠে একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপর এক গোছা খবরের কাগজ সুবিন্যস্তরূপে পাতিয়া, তার উপর খান দুই-চার বহি ও দোয়াত কলম সাজান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ দেবদারু কাঠের বাক্সে বসিয়া সময়ে সময়ে ট্রাঙ্ককে লেখা-পড়ার টেবিলরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ঘরটির মাঝে, দৈন্যের সঙ্গে যেন একটি শান্ত-শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

চকিত দৃষ্টিতে গৃহের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মহিলাটি সসঙ্কোচে বলিলেন, "এটি আপনার ঘব?"

একটু হাসিয়া ব্যথা বলিল, "অস্থায়ী আড্ডা। এই তক্তপোষে বসুন।"

মহিলাটি বসিলেন, তাঁহার দাসী দুয়াবের বাহিরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যথা দেবদারু কাঠের বাক্সটির উপর বসিল।

মহিলাটি স্মিত মুখে বলিলেন, "পৃথিবীর আড্ডাটা আমাদের সকলকারই অস্থায়ী; কিন্তু বিনা-খবরে হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করে তুললুম, মাপ করবেন—"

"মাপ করুন, বিবক্ত হওয়ার ফুরসৎ আমার একটুও নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই নানা কাজ। আপনার দরকার কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?—" ব্যথা হাসি হাসি মুখে মহিলাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আপনাকে দিদি বলে ডাকলে আপনি অপরাধ নেবেন না ত?"

"না। সৌভাগ্য বোধ করব। আপনাব হাসির কবিতাগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই অনুরোধ করতে এসেছি, এইরকম কবিতা অনুগ্রহ করে মাঝে মাঝে দিতে হবে।"

"অবসর পাই ত' চেষ্টা করে দেখব। আমার সময় বড্ড কম।"

"কি কি কাজে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, জানতে পারি?"

"গৃহস্থালীর ব্যাপার।"

"আব?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্যথা বলিল, "গৃহস্থালী ব্যাপারের পর 'আর' বলবার মত কিছু বাঙালীর মেয়ের জীবনে আছে না কি? অন্ততঃ আমার জীবনে ত নাই।"

"ত্রৈলোক্যবাবু আপনার কে হন?"

"কেউ নন। খুব দূর একটা সম্পর্ক আছে মাত্র। আসলে আমি এঁদের একটা আশ্রিতা গলগ্রহ মাত্র।"

"তাই না কি? আমরা আপনার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করেছিলুম।"

জোর নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যথা ম্লান হাস্যে বলিল, "পরের সম্বন্ধে যথেচ্ছ ধারণাটা কল্পনা কর্ত্তে আমরা সবাই অসম সাহসী। আচ্ছা, আজ তবে,—"

ইঙ্গিত বুঝিয়া মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনি বড় ব্যস্ত আছেন দেখছি। আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করে আসছে রবিবারে একবার পায়ের ধুলো দিতে রাজি আছেন?"

বিব্রত হইয়া ব্যথা বলিল, "আমি ততটা স্বাধীন নই।"

ঠিক সেই সময়ে রান্নাঘর হইতে ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বলি, অ-ভালমানষের মেয়ে! ন্যানঠোন নিয়ে যে ঘরে ঢুকলে, সারারাত গপ্পই করবে না কি? এদিকে বারান্দায় যে আঁধারে নোকগুণো হোঁচট খেয়ে মরছে।"

ব্যথা যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আসুন। আর আমাব দাঁড়াবার সময় নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না। অন্ন-বস্ত্রের জন্য যাদের পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়, তাদের পক্ষে সৌজন্য শিষ্টতাব নিয়ম মেনে চলবার সৌভাগ্য নেই। আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আমি ক্ষমাভিক্ষা করছি।"

মহিলাটি অনেকখানিই অপ্রস্তুত—এবং বোধ হয় কতকটা হতবুদ্ধি হইয়াই পড়িয়াছিলেন। ত্রস্তে বলিলেন, "না—না, ক্ষমা চাওয়ার কোন দরকার নাই, আমায় লজ্জা দেওযা হয় মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, এইসব ভিড়ের মাঝে বসে, আপনি কখন হাসিব কবিতা লেখেন? রচনা আসেই বা কি করে?"

চলিতে চলিতে স্নিগ্ধ হাস্যে ব্যথা বলিল, "তা জানিনে! জানবার সময়ও বড় একটা পাইনে। নিজের কাগজ কলমের দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধা দেখে নিজেরো সময় সময় একটু আশ্চর্য্য লাগে বটে, কিন্তু কোত্থেকে কি যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পাবিনে।"

"লেখেন কখন?"

"অশ্রান্ত দুঃখকষ্টেব অত্যাচারে মন যখন নেহাৎ অবসাদে ভবে উঠে, তখন।"

"তখন?"

"হা। একঘেয়েমি সহ্য করা যখন শক্ত হয়ে উঠে, তখন আত্ম-বিস্মৃতির এই উপলক্ষগুলা মন্দ লাগে না। সব দিন ঘুম ভাল হয় না। আমার ঘুমটা স্বভাবতঃই কিছু কাহিল।"—ব্যথা সকৌতুকে হাসিল। বলিল, "সেই সময়ে একটু একটু লিখি। আচ্ছা, আপনার কাজে লাগে ত' পাঠিযে দেব।"

জামার ভিতর হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া, মহিলাটি বলিলেন, "আপনার কাগজ কলম ডাকটিকিটের খরচ আছে। কিছু মনে করবেন না, এই সামান্য টাকা কটা তারি জন্যে...। দয়া করে এটুকু নিন।"

বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে ব্যথা মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নোটখানা ব্যথার হাতে গুঁজিয়া দিযা তিনি বলিলেন, "নমস্কার।"

"নমস্কার। কিন্তু আমার কাগজের দাম এত হবে না।" ব্যথার কণ্ঠস্বর বেদনায় জড়াইয়া উঠিল। মহিলাটি মুহূর্ত্তেব জন্য ব্যথার মুখের দিকে চাহিলেন। কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "নমস্কার। আপনার কাজে যান। দয়া করে কবিতা পাঠাবেন।"

দাসীকে সঙ্গে করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দু' মিনিট পরেই বাহিরের ফটক হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ী সশব্দে চলিয়া গেল।

ব্যথা মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। রান্নাঘর হইতে আবার চীৎকার উঠিল, "নেনঠোনটা দিয়ে যাবে, না কি গো?"

ব্যথার সংজ্ঞা ফিরিল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে উঠিল। রোয়াকের উপর এক প্রৌঢ়া নারী দাঁড়াইয়া, ঈর্ষাদীপ্ত নয়নে ব্যথার দিকে চাহিয়া ছিলেন। ব্যথা কাছে আসিতেই তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "ঐ চশমা জুতা পরা, উনি কে গা?"

ব্যথা ভয় পাইল। না বলিলে নিস্তাব নাই, কিন্তু সত্য বলিলেও পরিত্রাণ নাই। অথচ সত্য প্রকাশ করিলে এখনি বাড়ীতে একটা বিশ্রীরকমের হৈ চৈ গোলমাল যে লাগিয়া যাইবে, এবং চাই কি ব্যথার একমাত্র আশ্রয়টাও যে এখনি হাতছাড়া হইতে পারে, এ সত্য ব্যথা ভুলিতে পারিল না। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি চিনিনে।"

"চিনিনে কি-রকম? এতক্ষণ ধরে হাসি গল্প হোল,—অত কথা হোল। আবার টাকাও দিলে ত দেখলুম। টাকা কিসের?"

"ওঁর কতকগুলো কায করে দিতে হবে, তারই টাকা দিয়ে গেলেন। আপনি এখন খাবেন পিসিমা? ভাত বেড়ে দেব?"

বড়পিসিমা পবচর্চ্চা ভুলিযা গেলেন। আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া দুশ্চিন্তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "খাবো ত। কিন্তু আমায় ভাত দিয়ে, উপরে গিয়ে ছেলেটিকে ধরবে? আর কারু কাছে ত সে থাকবে না।"

পরিত্রাণ পাইয়া, ব্যথা মহাহর্ষে হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিল, "তার আর কি হয়েছে। আপনি খেতে বসুন, আমি ওপরে গিয়ে খোকাকে নিচ্ছি।"

৩

ব্যথার জীবনের অতীত অধ্যায়টি বেশ একটু বৈচিত্র্যে রঞ্জিত। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে মাবা যাইবার পর ব্যথা যখন বাপমার এক সন্তানরূপে টিকিয়া গেল, তখন বড় দুঃখ ও আনন্দেই তাঁহারা কন্যার নাম রাখিলেন "ব্যথাহারিণী"।

কিন্তু বেশীদিন সুখ সম্ভোগ সহিল না। পাঁচ বছব বয়সে বাপ এবং দশ বছর বয়সে মা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিজেব আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া মা, সর্ব্বস্ব খোযাইয়া ভিটামাটী বন্ধক দিয়া, বিপুল ব্যয়ে দূর গ্রামে এক বড় গৃহস্থ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গেলেন। শোনা গেল ঘরটি খুব নামজাদা। সে গৃহে কন্যা দিতে পাবিলে কন্যার নাকি অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হইবে না। সুতরাং অন্নবস্ত্রের অভাব যখন নাই, তখন অন্নবস্ত্র দানের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার প্রকৃতির পবিচয় লইবার আবশ্যকতা কি? বরেব সংবাদ কেহ লইল না। মহা আড়ম্বরে 'বড় ঘরে' ব্যথার বিবাহ হইয়া গেল।

মহা আদরযত্ন। বিপুল জাঁকজমকের তত্ত্বতাবাস দেখিয়া শুনিয়া মা খুব স্বস্তিতে মারা গেলেন।

ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতে ব্যথার সুখস্বপ্ন স্বপ্নে পরিণত হইল। ব্যথা দেখিল এই বড় ঘরের বড়বাবু হইতে ছোটবাবু পর্য্যন্ত সকলকারই মেজাজ বিশেষ 'বড়' রকমের। তাঁহাদের মত সধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুণ্যবান এ পৃথিবীতে কেউ নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একদিকে তাঁহারা যেমন ঘোরতর

ব্যস্ত বিব্রত—অন্যদিকে ব্যভিচার পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা ও সুরাপানে তাহারা তেমনি পরম পটু। অযোগ্যের হাতে পড়িলে অর্থের যে কতদূর দুর্গতি হইতে পারে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিনের পর দিন নিত্যনূতন আকারে দেখিয়া ব্যথা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রশ্ন করিয়া জানিল বড়লোকত্ব রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থাই না কি মিথ্যাবাদিতা, অর্থের অসদ্ব্যয় এবং প্রবঞ্চনা!!

ব্যথার পূর্ব্ববর্ত্তী যাতৃগুলি 'বড়লোকী' আবহাওয়ার কল্যাণে নিখুঁত 'বড়লোক' হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাক্যবৈভবের প্রসাদে গরীব প্রতিবেশী মহলে, তাঁহারা বিশেষ খ্যাতিপন্না 'বড়লোক গিন্নি'র সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অত মিথ্যা বলিতে ব্যথার জিহ্বায় আটকাইত। সে একপাশে জড়সড় হইয়া, সকলের অবজ্ঞা পাত্রী 'গোবেচারী' হইয়া দিন গুজরাণ করিতে লাগিল।

কিসে কি হইল, ব্যথা কিছুই জানে না। হঠাৎ একদিন শুনিল বাবুদের সকল বৈভবের মূল, বস্ত্রের ব্যবসায়ে না কি আগুন লাগিয়াছে। অন্য অংশীদাররা ইহাদের বিরুদ্ধে জয়াচুরীর অপবাদ দিয়া কয়েক হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে।

তুমুল মামলা চলিল। বিস্তর টাকা খরচ হইল। উকীল মোক্তারদের মধ্যে জনকতক অর্থপিশাচ না কি 'সাপ হইয়া কামড়াইয়া রোজা হইয়া ঝাড়িতে' বসিয়া এক মহা অনর্থ বাধাইয়া দিলেন। মামলা হার হইল।

প্রতিপক্ষের মাথা ফাটাইবেন বলিয়া বাবুরা মহা আস্ফালন করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তারপর মামলা ও ব্যবসার কথায় নিজেদের মধ্যে পরস্পরেব বুদ্ধিত্রুটি উল্লেখে কি যে দু'একটা বচসা হইল, ঠিক বোঝা গেল না,—হঠাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে মারামাবি সুরু হইয়া গেল! ছোট ভাই এক 'ক্যাঁচা' আনিয়া ব্যথার স্বামীর কাঁধে আঘাত করিল। ব্যথার স্বামী এক ধারালো কাটারীর আঘাতে ছোট ভাইয়ের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। বড় ভাই কাটারী কাড়িয়া ব্যথার স্বামীর পা জখম করিয়া দিল।

পুলিশ আসিয়া মৃতদেহ পোষ্টমর্টম করিতে পাঠাইল। আহতকে হাসাপাতালে এবং বাকী ভাই তিনটিকে হাজতের অতিথিরূপে প্রেরণ করিল।

ক্যাঁচার আঘাত বিষাইয়া পচন ধরিল। কুড়িদিন পরে হাসপাতালেই ব্যথার স্বামী মারা গেল। পাঁচ মাসের শিশুপুত্র কোলে করিয়া ব্যথা বিধবা হইল। সৌভাগ্যবশে মৃত ছোট দেবরটির বিবাহ হয় নাই।

জেল খাটিয়া তিন ভাই দেড় বৎসর পরে বাড়ী ঢুকিল। সংসার তখন হতশ্রী, আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। ছোট দুজন চাকুরীর সন্ধানে দেশান্তর গেল। বড় ভাই সংসাব গুছাইতে মন দিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল, বিধবা ভ্রাতৃ-বধূর মাতৃদত্ত সম্পত্তিগুলি আইনসঙ্গত উপায়ে আত্মসাৎ করা। দ্বিতীয় কায হইল কু-চিকিৎসায় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ সংহার করা।

কাযদুটি শেষ হইলে পুত্রশোকার্ত্তা ভ্রাতৃবধূকে 'নিজের পথ' দেখিতে আদেশ করিলেন। অনাথা অর্থহীনা নারী এবং সম্পত্তিশূন্য মাতৃহীন শিশুর মত নিষ্ঠুর গলগ্রহ এ সংসারে কে আছে? এক দ্বাদশীর তৃতীয় প্রহরে ভ্রাতৃবধূ সংসারের সব কাজ সারিয়া যখন সবেমাত্র আহারে বসিয়াছে, তখন "গরু আসিয়া ধান খাইতেছে, সংসারের অন্ন ধ্বংস করিবার রাক্ষসী তাহা দেখে নাই" এই সূত্র অবলম্বনে তিনি এমন কুৎসিত ভাষায়

ভ্রাতৃবধূকে গালাগালি করিলেন, যে, অভাগিনী সেইখানে ভাত রাখিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া পড়িল।

সেই গ্রামেই ব্যথার দূর সম্পর্কীয় এক পিসতুত ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ী। ভাই সেই সময় শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন। ব্যথা ভাইয়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভাইটি কিঞ্চিৎ আধুনিক ভাবাপন্ন। তিনি অন্যায়ের 'তোয়াক্কা' রাখিয়া চলিতে জানিতেন না। কর্ত্তব্য-অনুরোধে ভগিনীর ভাসুরকে একবার 'নামে মাত্র' জাঁনাইয়া ভগিনীকে গঞ্জনা অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজালয়ে লইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাসুর মহাশয় নিজের ধার্ম্মিকতার সাফাই গাহিয়া ব্যথার নামে জঘন্য কুৎসা রটাইয়া দিয়া দশের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এরূপ দুশ্চারিণীকে তার মাতৃদত্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করাই পরম ধর্ম্ম। অতএব তিনি ঐ হতভাগিনীকে এক পয়সার সম্পদও দিবেন না।"

পিসতুত ভাই ব্যথাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া প্রথমেই মূর্খ বোনটির পড়াশুনার বন্দোবস্তে মন দিলেন। বেশী বয়সে, অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে পড়াশুনাটা প্রথমে বিভীষিকার মত লাগিল। কিন্তু ক্রমে সহিয়া গেল। খানিকটা অগ্রসর হইবার পর ব্যথা নিজের উৎসাহেই আগাইয়া চলিল। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক চলনসই রকম শিখিয়া ব্যথা যখন একটু মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছে, তখন পিসতুত ভাই দূর দেশে চাকুরী লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কলিকাতায় তাঁহার এক পিসীর আশ্রয়ে ব্যথাকে রাখিয়া গেলেন। সেই পিসীই ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা পুত্রবধূ।—ব্যথা তাঁহাকে পিসিমা বলিত।

আজ তিন বৎসর ব্যথা ইঁহাদের সংসারে বাস করিতেছে। সংসারের সব কাজেই সে লাগে। সুতরাং যখন যাঁর গরজ পড়ে, তিনিই তখন ব্যথাকে অনুগ্রহের চোখে দেখেন। কিন্তু তাই বলিয়া নিরুপায় গলগ্রহকে কেউ সম্মানের চোখে দেখিতে পারে না! সুতরাং বাড়ীর একজনের কৃপায় বাড়ীর আর দশজনের অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনাটা ব্যথার জন্য চলিয়াই থাকে। ব্যথার চোখে সময়ে সময়ে জল আসে; সঙ্গে সঙ্গেই সে কিন্তু হাসিয়া ফেলে! এই ক্ষুদ্র জীবনটার অঙ্কে দাঁড়াইয়া সংসারের কত ভোজবাজীই সে দেখিল!—সেগুলা কত অপ্রত্যাশিত, কত অদ্ভুত! সেগুলা যদি নির্ব্বাক সাক্ষী সাজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতে ও সহিতে পারিয়াছে, তবে এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলা অক্লেশে এড়াইয়া চলিতে পারিবে না কেন? বাড়ীর ঝি-চাকরগুলির মূর্খতা ও নীচতা, ব্যথার মত অভাগা আশ্রিতাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে না, ইহা স্বাভাবিক। বাড়ীর পিসিমাগুলির আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা চর্চ্চার পর, অন্য তত্ত্বচর্চ্চার অবকাশ নাই। সুতরাং ব্যথার মত দুর্ভাগার দুর্ভাগ্যময় অবস্থাকে সহানুভূতির দিক দিয়া, তাঁহারা বিচার-বিবেচনার বিষয়ীভূত করিয়া দেখেন না, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—এ বাড়ীর সদা কর্ম্মব্যস্ত,—গম্ভীর স্বভাব পিসেমশাইগুলি ব্যথার ছলছুতা খুঁজিবার চেষ্টায় একান্ত উদাসীন! বাড়ীর কোন নারীকেই তাঁহারা অপমান-লাঞ্ছিত করিয়া চলেন না।— এমন কি, অন্নবস্ত্র যোগাইতেছেন বলিয়া যেটুকু অপমান-লাঞ্ছনা করা পুরুষমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য,—সেটুকুতেও তাঁহাদের জ্ঞানগোচর নাই! কি যে আপন-খেয়ালে কাজকর্ম্ম করিয়া যান, কিছুই বুঝিবার যো নাই। মেয়েরা উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, অসাবধানে কোথায় কি অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটাইল, এবং তার জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর সম্মার্জ্জনী ব্যবস্থা

হওয়া উচিত,— সে সম্বন্ধে এই পিসেমশাইগুলি, না খোঁজেন স্মৃতি, না বোঝেন সংহিতা! এ হেন শাস্ত্র-জ্ঞান-বর্জ্জিত মানুষগুলিকে দেখিলে ব্যথার ভাসুর মহাশয়ের মত, মহা কঠিন, পৌরুষ-জ্ঞান-সম্পন্ন প্রবল প্রতাপ পুরুষ কি যে মনে করিতেন, ব্যথা ভাবিয়াই পায় না! তবে ফাঁসি কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর গোছের একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা যে করিতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

জ্ঞানোন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া, এ পৃথিবীতে ব্যথা যাহাদিগকে সব চেয়ে নিকটতম আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছিল, সব চেয়ে বেশী নৃশংস নির্য্যাতন লাভ করিয়াছিল— তাহাদের কাছেই। দূরের আত্মীয়রা ব্যথার অনেক উপকার করিয়াছেন—আশ্রয় দিয়াছেন, অন্নবস্ত্র যোগাইতেছেন, এজন্য ব্যথা কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারাও যে আত্মীয়,—যথেচ্ছভাবে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা করিবার ষোল আনা অধিকার যে ইঁহাদেরও হাতে আছে,—এ আশঙ্কা ব্যথা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারে না! তাছাড়া, এই অনুগ্রহশীল আত্মীয়দের স্কন্ধে সে যে একটা অনাবশ্যক উপসর্গ—অতিরিক্ত ব্যয়ভারের মতই চাপিয়া বসিয়া আছে,—নিজের এই হীনতা, জীবনটার এই শোচনীয়-জীবনযাত্রা,—ব্যথাকে গভীরতর লজ্জা ও বেদনা দান করিত—সর্ব্বদাই! হায় রে, সৎপথে থাকিয়া নিজের ভার নিজের স্কন্ধে বহিবার মত,—একটা পথও যদি এ পৃথিবীতে ব্যথার জন্য খোলা থাকিত...!

৪

মাঝে ক'দিন কাটিয়া গিয়াছে।

সেদিন আশ্বিনের বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা।

প্রকাণ্ড বাড়ীখানা আজ কোলাহলহীন। সদর দেউড়ীতে বসিয়া দ্বারবান এস্রাজে পূরবীর সুর ধরিয়াছিল। দূরে পূজাবাড়ীতে সানাইয়ে বিদায় রাগিণীর করুণ বিষাদ গান আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল।

সশব্দে একখানা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দ্বারে থামিল। দ্বারবান এস্রাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেদিনের সেই প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিলেন। আজ তাঁহার সঙ্গে দাসী ছিল না। দ্বারবান অন্তঃপুরের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আইয়ে মায়ি—"

প্রৌঢ়া মহিলা অন্তঃপুরে ঢুকিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। ইতস্ততঃ করিয়া অনুচ্চস্বরে তিনি বলিলেন, "কই, এঁরা সব কোথা?"

মুহূর্ত্তে ব্যথার শয়নকক্ষের দ্বার উদঘাটিত হইল।— সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্ষীণছায়ার মত একটা শীর্ণ অস্পষ্ট মূর্ত্তি দুয়ারের কাছে দেখা গেল। প্রৌঢ়া অনুমানেই চিনিলেন। সহাস্য মুখে নমস্কার করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "চিঠির জবাব পাইনি, সেইজন্যে জ্বালাতন করতে এলুম। খবর কি?"

দূরাগত প্রতিধ্বনির মতই একটা ক্ষীণ স্বর ধ্বনিত হইল, "নমস্কার! আসুন।"

দুয়ারের পাশের অনুজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ব্যথা সেইখানেই ধুলোর উপর বসিয়া পড়িল। সুগভীর শান্তি-কাতরতা-মাখা কণ্ঠে বলিল, "আমার চোখে সব ধোঁয়ার মত লাগ্ছে। আপনাকে দেখতে পাচ্ছিনে। আপনি খাটে বসুন।"

"না। আপনার সামনেই বসছি। আপনার অসুখ করেছিল?" নিকটে বসিয়া, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ব্যথার মুখের দিকে চাহিয়া প্রৌঢ়া প্রশ্ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার শীর্ণ শিথিল জ্বরতপ্ত হাতখানি সস্নেহে নিজের মুঠোর মধ্যে তুলিয়া লইলেন।

ব্যথা বসিতে পারিতেছিল না। শুইয়া পড়িল। ক্লান্ত-রুদ্ধ স্বরে বলিল, "অসুখ করেছিল। কদিন জানিনে। মাতালের মত করে ফেলে রেখেছিল। সেই সময় এঁরা কবে যে পুরী চলে গেছেন, কিছুই জানিনে। ওঁদের আমি বড্ড বিপদে ফেলেছি। কি যে মনে করছেন ওঁরা জানিনে। আমার সমস্ত ভার বইছেন, অথচ তাঁদের দবকার মত কাজে লাগলুম না! এম্নি অসময়ে অসুখ ধরলো। ভগবান! আমায় এই ক'টাদিন ভাল রাখলে না কেন?" ব্যথার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে বলিল, "পুরীতে তাঁরা রাঁধুনী পাবেন না হয়ত। কত কষ্টই হবে তাঁদের! নিজেকে নিয়ে কি যে করি আমি! জ্বালাতন!"

প্রৌঢ়া অনুমানেই তাহার কথার অর্থ বুঝিলেন। একটু নীবব থাকিয়া বলিলেন, "বাড়ীর সবাই পুরী বেড়াতে গেছেন? আপনাকে এখানে দেখছে কে?"

ধীরে উত্তব হইল, "দরওয়ান আছে, বুড়ী-ঝি বাড়ী আগলাতে আছে,ওই বেচাবাই দেখছে। ওবা আমাব জন্যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। মানুষকে যে কি দুঃখই দিচ্ছি, যে মনে করলেও কষ্ট হয! এব চাইতে মরা ভাল!—"

কথাটা নিতান্তই সাধারণ প্রচলিত একটা অতি সাধারণ জনপ্রিয় উক্তিমাত্র! যাহার আলস্য না হয়, তিনিই ও-কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, এবং বাঁচার চেয়ে মরাটা যে কোন হেতুবশে ভাল, সে প্রশ্নটা উত্থাপনও অনাবশ্যক। মহিলাটি একটু নীরব থাকিযা, ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "আপনি আমায একটু খবর দেননি কেন? এত অসুখ করেছে আপনার!"

ব্যথা হাসিল। করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমি নিজের খবর নিজেই রাখতে পারিনি যে! আপনার চিঠিগুলো এসেছে, সব বিছানায় জমা হযে পড়ে আছে। একখানিও পড়তে পারিনি! ভাগ্যিস কবিতা কটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, নইলে আর পাঠান হোত না। আর একটা লিখে রেখেছি, বোধ হয় ট্রাঙ্কের ওপর পড়ে আছে,—আপনি একটু খুঁজে নিন।"

"থাক থাক। আপনি ভাল হয়ে উঠুন আগে। উঃ, আপনি কি কাহিল হয়ে পড়েছেন! কথা বলতেও আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব, দেখছি।"

"হবে না?"—ব্যথা গভীর বিষাদভরে হাসিল। তীব্র বেদনা-নিষ্পীড়িত কণ্ঠে বলিল, "ধার আর ভিক্ষা—এই নিয়ে যাদের জীবনের কাববাব চলছে,—তাদের কথা বলবাব শক্তি জুটবে কোত্থেকে! দিদি, এবার মরে যদি —বেঁচে উঠতে পারি,—মরে বেঁচে উঠি যদি, তাহলে কথার মত সত্যি কথা, আপনাদের অনেক শোনাব! অনেক কথা বলবার আছে আমার,—কিন্তু এ জন্মটায় সেগুলো বলবার বোধ হয়—", সহসা ব্যথার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল, নিঃশব্দে মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার দুর্ব্বল দেহযন্ত্র বিকল করিয়া দিল!

মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বাড়ীতে কে আছ, একটু জল নিয়ে এস। ইনি মূর্চ্ছা গেছেন।—"

জলের ঘটি হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বুড়া-ঝি ঘরে আসিয়া মহা বিরক্তির

সহিত বলিল, 'বাবাঃ! আবার মূর্চ্ছা!—ওমা, এ কি গো, ধুলোয় নুটুচ্ছে যে! ... হয়ে গেল না কি! দ্যাখোদেখি বাপু কি আক্কেল! এ রাতে মরা ফেলবার লোক পাই কোথা? তাই বাপু মলি, হাঁসপাতালে গিয়ে মলি না কেন? হাসপাতাল যাব যাব করলি, গেলি না-ই বা কেন?'

ঝির হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া মূর্চ্ছিতার মুখে জল দিতে দিতে প্রৌঢ়া বলিলেন, "চুপ কর।"

ঝি ব্যাকুল হইয়া বলিল, "তা করছি। কিন্তু তুমি বুঝি হাসপাতালের ম্যাম্। আমাদের জাতধর্ম্মের কথা বোঝ ত সব। আর ত ওকে আমাদের ঘরে ঠাঁই দিতে পারি না। ওকে তোমাদের সেখানে নে যাও, মরে গেলে ম্যাথর দিয়ে ফেলিও।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, "কাকে ঘরে ঠাঁই দেবে না? ইনি তোমার মনীবদের আত্মীয়া নয়?"

"রাম রাম! সে সম্পর্ক আর রইল কৈ? ও তো সাহেব হয়ে গেছে গো! জানো না বুঝি? বলে সেই নিয়ে সেদিন বাড়ীতে হৈ হৈ হয়ে গেল, সে কি কাণ্ড! বাজার সরকার ভূতো মুখুজ্জি শুদ্ধু বললে,—বেথা-দি'র আর জাত নেই! ওনাকে আর 'জেতে' নেওয়া হবে না। ম্যাম যাকে এসে টাকা দেয়, সে মেয়ের কি জাত থাকে? তুমিই বল না বাছা। মেজকর্ত্তা রেগে উঠলেন,—তা রাগলে কি হবে? পাঁচজনের মুখে তো আর হাত-চাপা দেওয়া যায় না। সবাই বললে সাহেব হয়ে গেছে! ও-মেয়ে লাটসায়েবের দরবারের কাজ করে যদি ট্যাকা কামায়, তা হলে জাত থাকে কি?"

ভদ্রমাহিলা স্থির দৃষ্টিতে ঝি'টির মুখের দিকে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন। ধীরে বলিলেন, "কত টাকা কামিয়েছিলেন? লাটসাহেবের দরবারটা এসেছিল-ই বা কোথা?"

"তা জানিনে বাছা। রাজি-ঝি সে সব দেখেছে, বড়মা সইকে বললে, চশমা জুতো পরা ম্যাম এসে ট্যাকা দিয়ে গেছে। দ্যাখো-না বাক্স খুলে, চার টাকা জমা আছে। এক ট্যাকা খরচ করে পাহাড়িকে দু গণ্ডা বকসীস দিয়ে কাগজ কিনেছে, টিকিট কিনেছে,—সে মহামারী কাণ্ড!—তাইজন্যেই তো আমরা আর ওনার ঘরে ঢুকি না। ছোঁব কি করে বল? আমাদের তো জাত আছে! মেজমাও তাই বলে গেছে, ভাল হ'লে যেন্নে খুশী যেন চলে যায়। পাঁচটার বাড়ী, এখানে মেজমা আর ত ওনাকে রাখতে পারে না। ভাই-ঝি বলে এনে রেখেছিল, কিন্তুন 'রীতে' না থাকলে মেজমাই বা কি করে?"

ভদ্রমহিলা স্তব্ধ। ব্যথার সংজ্ঞালাভের সূচনা হইতেছিল, নির্নিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "রোগীকে কি খেতে দিচ্ছ?—"

ঝি সহসা অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া বলিল, "কি খেতে দেব? দু পয়সার খই বাতাসা এনে দিইছিনু, খায়নি। আমি আর কি করব? ও তো আর আমায় টাকা দিয়ে বাঁদী রাখেনি। আমি পরের চাকর, ঐ এনে দিইচি, ঐ ঢের!"

ভদ্রমহিলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ট্রাঙ্কের কাছে গিয়া একটা কাগজের কোণ ছিঁড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আমার নাম ঠিকানা লিখে রেখে যাচ্ছি। যদি তোমার মনীবরা এসে এর সন্ধান করেন, সেই ঠিকানায় খবর নিতে বোলো। আমি একে আমার বাড়ীতে নিয়ে

যাচ্ছি।" দোয়াতে কলম ডুবাইয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঠিকানা লিখিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য হইয়া ঝি বলিল, "বেথা-দি তোমার আপনজন কেউ হয় না কি গো?"

লেখা শেষ করিয়া তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ। আমার ছোট বোন। তোমার মনীবদের বোলো, আমার কাযের জন্যই আমি একে টাকা দিয়ে গেছলুম সেদিন। আমার সাত পুরুষের সঙ্গে লাটসাহেবের দরবারের কোন সম্পর্ক নেই। আর আমি নিজে মেম কি সাহেব, ম্যাথর কি মুদ্দোফরাস, কালো কি সুন্দর, বেঁটে কি লম্বা, —সে সম্বন্ধে তোমার যা প্রাণ চায় বর্ণনা কোর। আর তোমার মনীবদেরও বোলো, —মিথ্যে কথা বলে মেছোহাট গড়ে,—যত খুশী মহামারী কাণ্ড তাঁরা করতে পারেন করুন। আমি মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের বিলক্ষণ চিনি।"

ঝি সে কথার অর্থ কি বুঝিল কে জানে। একটু ভাবিয়া বলিল, "তা তোমাদের লোক, তোমরা নিয়ে যাবে যাও। কিন্তুন বিছানাটা তো আমরা দেব না, আমাদের আবার নূতন রাঁধুনি আসবে, তাকে তো শোবার জন্যে বিছানা দিতে হবে...।"

ঘৃণাব স্বরে উত্তর হইল, "রেখে দাও বিছানা। কিন্তু এর কাগজগুলো আমি ছাডব না। কেন না, তাব মানে তোমরা বুঝবে না। কাগজগুলো আমি নেব।"

সাগ্রহে উত্তর হইল, "নে যাও মা, নে যাও। ও ছেঁড়া কাগজের জঞ্জালগুলোয় উনুন-ধরানো ছাড়া আর কিছু হবে না। ও জঞ্জালগুলো নে যাও। আর তোরঙ্গটাও নে যাও। ওতে কিছু নেই মা, কিছু নেই—শুদ্ধু সেই গাদা গাদা ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল! না আছে একখান কাপড়, না আছে একটা গয়না! ও তোরঙ্গ নিয়ে আমরা করব কি? তবে...তবে... সেই ট্যাকা চাট্টে ওতে আছে মা, আছে।—"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অৰ্দ্ধ-মূৰ্চ্ছিতা রুগ্নাকে দুহাতে তুলিয়া ভদ্রমহিলা বাহিরে গিয়া গাড়ীতে তুলিলেন। দ্বারবান ব্যাপার কি বুঝিল না,— বখশীশের আশায় ছুটিয়া আসিল। ভদ্রমহিলা বলিলেন,—"একটু কায চাই বাপু, এস।"

ভিতরে গিয়া ট্রাঙ্কটি দ্বারবানের মাথায় চাপাইয়া দিয়া ঘরের চারিদিকের খুচরা কাগজগুলি একে একে গুছাইতে গুছাইতে, সহসা তাঁহার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা একটা খামে মোড়া চিঠি পাইলেন। সম্ভবতঃ ব্যথার অসুখের পূর্ব্বে কোনসময় চিঠিখানা লেখা হইয়াছিল, ডাকে ফেলা হয় নাই। চিঠিখানি ও সমস্ত কাগজগুলি হাতে লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। দ্বারবানকে পুরস্কার দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী দ্রুত ছুটিল।

গাড়ীর ঝাঁকানি খাইয়া, অৰ্দ্ধ-তন্দ্রাতুর ব্যথা চমকিয়া সভয়ে বলিল, "কোথা নিয়ে যাচ্ছেন দিদি?"

সস্নেহে উত্তর হইল, "ভগবানের রাজ্যের ভেতরেই যেখানে হোক দিদি! আমি বড় বোন কাছে রয়েছি, ভয় কি?"

আশ্বস্ত ক্ষীণ উত্তর আসিল—"কিছু না।"

আলোকোজ্জ্বল বাজারের পথ দিয়া গাড়ি ছুটিতেছিল। ভদ্রমহিলা গাড়ীর বাহিরে ঝুঁকিয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখান পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া,

ব্যথা তাঁহার একটা জিজ্ঞাস্যের উত্তর লিখিয়াছে ;—

"অভাগার এই হাসি, ছদ্মবেশী অশ্রুরাশি
কি জানিবে, হায় বন্ধু, তার ইতিহাস?
লাঞ্ছিত অদৃষ্ট সনে, যুঝিতে জীবন পণে
ক্লান্তি জুড়াবারে সৃজি,—ব্যঙ্গ পরিহাস!
বেদনাশ্রু রোধিবারে, উদগ্র বিগ্রহ তরে—
মৃত্যু অবসাদে করি তীব্র প্রতিবাদ।
সৃজি এ তরল হাসি, লয়ে অশ্রু বাষ্পরাশি
লয়ে বঞ্চিতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ!
হতভাগ্য এই হাসি!— এরে বল ভালবাসি?
ধন্য ভালবাসা!--মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
থাক কথা! কাজ নাই,—ভাল লাগে? ভাল তাই!
লহ অশ্রু বেদনা'র, শ্রদ্ধা নমস্কার।"

অশ্রু-ছল-ছল নয়নে ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া ভদ্রমহিলা ধীরে বলিলেন, "আজ বিজয়া। ব্যথা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি।"

কষ্টে চোখ খুলিয়া অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া অতি কষ্টে রুদ্ধ ক্ষীণ স্বরে ব্যথা বলিল, "বিজয়ার নমস্কার দিদি।"

সূক্ষ্ম-ধর্ম্মজ্ঞান

"রায় গিন্নি—রায় গিন্নি, ওগো শান্তিপুরের গিন্নি—"

বছর ত্রিশ বয়সের একটি যুবক, হরিনামের ঝুলিহাতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ী ঢুকিয়া,—বিকট সিংহনাদের কাছাকাছি উৎকট উচ্চনাদে হাঁকিলেন,—"...ও, শান্তিপুরের গিন্নি!"

বাড়ীর কোণে, খোড়ো চালের গোয়ালঘর হইতে ঝির সঙ্গে, দুধের বোকনো হাতে করিয়া একটি বৃদ্ধা বাহির হইয়া বলিলেন, "কি গো, গৌরগোপাল যে, এস, এস, কত ভাগ্যি।"

গৌরগোপাল মহোদয়ের আপাদমস্তকের কোনখানেই এতটুকু গৌরত্বের চিহ্ন ছিল না, এবং গোপালত্বের মধ্যে—ভগবান বাসুদেবের কংসধবংস-কালীন উগ্র সংহার মূর্ত্তিটার আঁচ যৎকিঞ্চিৎ অতিরিক্ত থাকিলেও অন্য বিশেষ কিছু সাদৃশ্য ছিল না। চেহারা লম্বায় বেশ দীর্ঘ, চওড়াতেও বোধ হয় এক সময় মানানসই রকম ভাল ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। মুখের গঠন সুশ্রী, কিন্তু ভাব বড় বিশ্রী-কর্কশ দম্ভময়,—সোজা কথায় 'ধবাখানা সরাজ্ঞানের তুল্য মূল্য উৎকট মুরুব্বিয়ানা জ্ঞাপক,—যা-হোক একটা কিছু বটে! পরনে কালাপেড়ে কাপড় ও থ্রি-কোয়াটার হাতাওয়ালা লংক্লথের পাঞ্জাবী। পায়ে খড়ম, গলায়

তিনকণ্ঠি মালা, বিষ্ণুভক্তির অব্যর্থ প্রমাণ-স্বরূপ নীরব সাক্ষ্যে শোভা পাইতেছে।

ঠানদিদি সম্পর্কীয়া, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার আহ্লাদ-গদ-গদ আহ্বানে গৌরগোপালের দন্ত-অলঙ্কৃত মুখ যেন অতিরিক্ত দম্ভের উগ্র-আতিশয্যে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সগর্ব্বে রোয়াকে পৈঁঠার দিকে পা বাড়াইয়া অনাবশ্যক উচ্চতায় কণ্ঠ চড়াইয়া প্রবল নিনাদে বলিলেন, "ভাগ্যি কি আর সাধে হয় রে বাপু, তোমার গুণে হয়; তুমি এখনও বেঁচে আছ তাই তোমাদের ছেলেদের বাড়ীতে দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে আসি, নইলে তুমিও যেমন!—আজকালকার দিনে কে কার খবব রাখে বলো তো, হুঁঃ।"

বিপুল আত্মশ্লাঘাময়ী আত্মমহিমার গর্ব্বে দিশেহারা-গোছ একটা অসাধারণ অবস্থার কাঁধে ভর দিয়া, শ্রীযুত গৌরগোপাল যেমন রোয়াকে পৈঁঠায় পা দিবেন, অমনি হঠাৎ নজর পড়িল,—খড়-কুটি-জঞ্জালে অপরিচ্ছন্ন পৈঁঠার উপর, গৃহপালিত বাছুরের বিষ্ঠার সঙ্গে কতকগুলি ছাগ-বিষ্ঠাও শোভা পাইতেছে! তৎক্ষণাৎ আঁৎকাইয়া উদ্যত-চরণ সামলাইয়া, ক্ষোভে-রোষে বজ্রনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "এ্যাঃ! ছি-ছি-ছি! বলি তোমরা হিন্দু না কি গো? বাড়ীর ভেতর ছাগলনাদি ছড়ানো! একটা ছাগলনাদি মাড়ালে, গঙ্গাস্নানের সকল পুণ্যক্ষয় হয়, আর তোমাদের বাড়ীময় এতো? তোমরা কোনখানে হিঁদু বল তো? এ যে হাড়ির বাড়ী হ'য়ে রয়েছে!"

পাপ পুণ্যের হিসাব-জ্ঞানে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন গৌরগোপাল মহাশয়, ছাগ-বিষ্ঠার প্রভাবে, পুণ্য লোকসানের আশঙ্কায় যত ক্রুদ্ধই হউন,—কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বে অন্ততঃ,—সাধারণ ক, খ, জ্ঞানটা যাঁহার আছে, এমন কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া যদি সে বাড়ীর চারিদিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইতেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন, শুধু ছাগল-নাদি মাত্র নয়, গৃহ-পালিত গরুবাছুরগুলিও এমন সুচারু বন্দোবস্তে গৃহে পালন করা হয়—যাহাতে সেই উপকারী জন্তুগুলি গৃহস্থের উপকার যত করিতে পারুক বা না পারুক, গৃহস্থের স্বাস্থ্যকে 'টাটকাজবাই' করিতে বাধ্য হয়,—অনেক উপায়ে-ই! জন্তুগুলির মলমূত্রের ক্লেদ-বাষ্প এমনভাবেই মানুষের আহার নিদ্রা বসবাসের স্থানের ঘনিষ্ঠ-সংলগ্ন! শুধু তাই নয়, তার উপর উপরন্তু আছে,—খড়-কুটি, ঘাস, পচা খোলভরা ডাবার দুর্গন্ধ, এবং বাড়ীর সমুদায় আবর্জ্জনা ও ক্লেদপূর্ণ প্রকাণ্ড আস্তাকুঁড়ের অসহ্য উৎকট-দুর্গন্ধবাষ্প' তা সেগুলার জন্য স্বাস্থ্য বিষাক্ত হইয়া মানুষগুলা যতই ভুগিয়া মরুক, গঙ্গাস্নানের পুণ্য তো হ্রাস হয় না, তাই যথেষ্ট! কিন্তু সমস্যা-আতঙ্ক শুধু ঐ ছাগ-বিষ্ঠা লইয়াই।

গৌরগোপালের ভর্ৎসনা-নিনাদের উগ্র ধাক্কায় বৃদ্ধা গৃহিণী তৎক্ষণাৎ চটিয়া উঠিলেন, তাঁহার ঝি-চাকর এবং পুত্রবধূদের উপর! গৃহিণীর আদরের-পোষ্য ছাগলগুলি, নিরঙ্কুশ প্রতাপে বাড়ীর সর্ব্বত্র রাজত্ব করিয়া বেড়াইবে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, কেহ বাধা দিতে চাহিলে বা অসন্তোষ জানাইলে,—পারিবারিক সম্পর্কের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহাকে লঘুগুরু দণ্ড লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আজ গৃহিণী তাহাদের উদ্দেশেই ছাগলের সমস্ত দোষ উৎসর্গ করিয়া, পৈঁঠা অপরিষ্কার থাকার জন্য যে তাহারাই দায়ী—সেটা মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন! কলিকালে ঝি চাকর বধূরা যে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল, সেজন্যও চেঁচাইতে ত্রুটি করিলেন না।

গরুর রাখালটা গোয়ালঘর হইতে ঝাঁটা হাতে ছুটিয়া আসিয়া পৈঁঠা পরিষ্কার করিয়া

দিল। গৃহিণীর আদেশে একজন ঝি জড়সড়ভাবে আসিয়া মহামান্য গৌরগোপালের জন্য পীঁড়া পাতিয়া দিল। গৌর বসিয়া মালা ঝাকাইয়া কালোয়াতী সুরে কীর্ত্তন শুরু করিলেন, "তোমার বৌরা কেমন ভদ্দর লোকের মেয়ে বল দেখি? চাকর-বাকরের 'ওপীক্ষেয়' গরু বাছুরের সেবা ফেলে রাখে? হোত আমাদের বাড়ীর বৌ, তাহলে তিনদিনে টিট করে দিতাম! আমাদের বড়বৌ আর ছোটবৌ কাযকম্ম সেরে রাত বারোটায় গোয়ালঘরে গিয়ে, গরম জল দিয়ে গরুর গা-চুঁচে দেয়,—তবে গিয়ে বিছানায় গড়াতে পারে। আমার শাসন এমন নয় বাবা!—"

শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ধাতের মিল থাকিলে, আসর জমে ভাল। গৌরগোপালের বধূ-শাসন-শক্তির পৌরুষ-প্রভাবের মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহিণী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের শাসন আছে—তা বৌরা ভাল থাকবে না? তোমাদের সে ছোটবৌ মরতে যাচ্ছে অমন সূতিকে রোগ হয়েছে, তবু ধুঁকে ধুঁকে সংসারের রান্না থেকে গরুর সেবা থেকে বাসন মাজা ঘর নিকানো সব করছে। ঐ করেই তো অত শীগ্রী টপ করে মোল,—ডাক্তারও বল্লে। কিন্তু কৈ করুক দেখি আমার বৌরা তেম্নি।—তা আর করতে হয় না, গতর সব কত! তাতে আবার সব 'রাংএর রাধা', বারমাসই রোগ! তোমাদের বাড়ীর বৌ আর আমাদের বাড়ীর বৌ,—বলে কিসে আর কিসে!"

বাস্তবিকই অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনের মধ্যে নানা অনাচারে জীবন যাপনের ফলে, পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য যেমন হইয়া থাকে, এ বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্যও তাই। কিন্তু সে স্বাস্থ্যহানির জন্য, লাঞ্ছনা ভোগ করে শুধু চির অবহেলার পাত্রী—বধূরা। বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে, অপেক্ষকৃত ভাল আবহাওয়ার মধ্যে যাহাদের শৈশব কাটিয়াছে, সেই পরের মেয়েগুলি এ বাড়ীতে আসিয়া আগেই স্বাস্থ্য হারাইয়াছে; তার জন্য দায়ী তাহারাই! বাড়ীর মুরুব্বিরা যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির দিকে চোখ দেন না, সেজন্য কোন কথাই চলিতে পারে না, যে হেতু তাঁহারা বধূ নয়, বাড়ীর কর্ত্তা! সুতরাং স্বেচ্ছাধীন স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা একছত্রী সম্রাট!

যাই হউক, আধ ঘন্টার উপর, এ-বাড়ী ও-বাড়ীর বধূদের দোষ-গুণের তীব্র সমালোচনার পর,—গৃহিণী বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে আজ রাঁধলে কি?"

গৌরগোপালের অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে আর একটি মহৎগুণ ছিল, তিনি কখনও 'ছোট কথা' বলিতে পারিতেন না। সুতরাং রান্নার সম্বন্ধে, এমন এক প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেন, যেটা তাঁহাদের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ভক্তির পাত্র কখনও অবহেলার জিনিস নয়, অতএব গৃহিণী অকপট ভক্তিভরে তাও সত্য বলিয়া মানিলেন।

সহসা গৌর তাঁহাদের গরীব ব্রাহ্মণ বিধবা রাঁধুনীটির উদ্দেশে একটা ইতর কটূক্তি করিয়া বলিলেন, "বেটী আজ বাড়ী চলে গেল। বুঝলে রায়গিন্নি, বেটীর আজকার ভারী দেমাক্ হয়েছিল, আজকালকার দিনে ছোটলোকদের যত তেজ কি না! কি বলবো, দাদা যে বড়বৌকে এবার চাক্‌রীস্থানে নিয়ে গেল; নইলে ছোটবৌ আঁতুড়ে যাবার সময় আমি কি রাঁধুনী রাখি?"

লম্বা চওড়া জাঁক-জমক ভরা, বিশেষণ লাগাইয়া গৌরগোপাল, প্রচণ্ড পুরুষত্ব-বিকাশক, অশ্রাব্য অকথ্য গালিগালাজ ঝাড়িয়া, তাঁহাদের রাঁধুনীটির উদ্দেশে যে অভিযোগ

ঘোষণা করিলেন, তাহা সহজ ভাষায় অনুবাদ করিলে এই অর্থ দাঁড়ায়,—গৌরের প্রথম পক্ষের একপাল ছেলের ঝক্কি পোয়াইয়া, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আঁতুড় তুলিয়া এবং অতিরিক্ত সাংসারিক কাযের খাটুনীর চাপে গরীব ব্রাহ্মণ বিধবার সম্প্রতি মাসখানেক স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সে ছুটি চায়। কিন্তু গৌরগোপাল মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া, তাহার মাহিনা আটকাইয়া রাখেন, কিছুতেই ছুটি দিতে রাজী হন নাই, তাই গৌরগোপাল রাঁধুনীর উপর চটিয়া, তাহাকে সাগু বার্লি পর্য্যন্ত খাইতে দেন নাই। কাল রাত্রে রোগ-যন্ত্রণাতুরা অনাহার-অবসন্না, অসহায়-আশ্রিতা কাতর আর্ত্তনাদে যখন বার বার চেঁচাইয়াছে, "ও বাবা গৌর, একবার ওঠো বাবা, আমায় একটুখানি জল দিয়ে যাও বাবা—", তখন 'বাবা গৌর' পাশের ঘরে সস্ত্রীক পুত্রকন্যা লইয়া গভীর আরামে বিছানায় শুইয়া, সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে নিঃশব্দে 'অপার্থিব মজা উপভোগ' করিয়াছে! যেহেতু ছোটলোকদের তেজ ভাঙ্গিবার—ইহাই সদুপায়!

গৌরগোপালের বীরত্ব গৌরবে গৃহিণী সকৌতুকে সায় দিতে ত্রুটি করিলেন না, —কিন্তু তবুও কি জানি কেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার মুখ দিয়া একটা প্রশ্ন বাহির হইল, "তারপর শেষকালে উঠে অবিশ্যি জল দিলে?"

"ক্ষেপেছ তুমি!" বজ্র নিনাদে সদর্পে গৌর বলিল, "গৌর সিংগীকে সে ছেলেই পাওনি রায়গিন্নি! আমি আবার উঠে তাকে জল দেব? কি গরজ? আমি সব চুপ করে পড়ে পড়ে শুনেছি, আর মনে মনে হেসে কুটি কুটি হয়েছি! সাড়া দিতে আমার বয়ে গেছে!"

গৌরগোপালের অসাধারণ মহত্ত্বে গৃহিণী আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন,— পুরুষের পৌরুষ বলে ত ইহাই!—হায়, তিনি কবে তাঁহার বাড়ীর অবাধ্য দাসদাসীদের এমন কি সুবিধা হইলে পুত্রবধূদের পর্য্যন্ত এম্নি সুকৌশলে জব্দে ফেলিয়া, গৌরগোপালের মত প্রভুত্বশক্তিকে ধন্য করিতে পারিবেন?

গৌর বলিলেন, "আজ সকালে তার বাড়ীর লোক এসে গরুর গাড়ী করে নিয়ে গেল।"

গৃহিণী বলিলেন, "মাইনে দিলে?"

একটু থামিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে গৌর বলিলেন, "ছোটলোক ব্যাটারা,—মাইনে কি ছাড়ে? দিয়ে দিলুম কিছু,—তবে সব নয়।"

২

এইসব ধরণের বহু বহু শ্রুতি-মধুর উপাদেয় আলোচনার পর সন্ধ্যার ঝোঁকে গৌর রায়গিন্নির বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র টহল দিতে বাহির হইলেন।

পথে একদল নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমস্ত দিনের দিন-মজুরী খাটিয়া, বাড়ী ফিরিতেছিল। গৌর মালা হাতে পথের পাশে দাঁড়াইলেন, কদর্য্য লালসামাখা, লোলুপ কটাক্ষে প্রত্যেক স্ত্রীলোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ বজ্রনাদী কণ্ঠস্বরে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ ভরিয়া,—নিজের ভদ্রত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া অসঙ্কোচে তাহাদের উদ্দেশে গাহিয়া উঠিলেন:

লাল জবা চাঁপা ফুল এধার ওধারে!
কোথা ফেলে গেলি, ভরা ভাদরে॥

ইহারা ছাদপেটা প্রভৃতি কাযের সময় একঘেয়ে ঐক্যতানে ঐরকম সব গান গাহিয়া থাকে। এ গান তাহাদের চির পরিচিত ; 'বাবু'-মহিমা অলঙ্কৃত মহাপুরুষের মুখে নিজেদের নিজস্ব গান শুনিয়া তাহারা আহ্লাদে কৃতার্থ জীবন হইয়া গেল! ইহাদের পাড়ায় গৌরবাবুর প্রসার অপরিসীম ; প্রত্যহই সন্ধ্যার পর সেখানকার স্ত্রীলোক-বিশেষের বাড়ীতে গৌরবাবুর গোপন-পদধূলি পড়ে। সুতরাং সেই পথের মাঝে,—তাহাদের সঙ্গে গৌরবাবুর এমন দরের রসিকতা রসালাপের তুফান ছুটিল, যাহা ভদ্র-সমাজের ধাতে অসহ্য।

ফোর্থক্লাসের বিদ্যায় বছরে দু-মাসের বেশী ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি না জুটিলেও,—গৌরগোপালবাবু,—বাবু ত বটে! ভগবানের রাজ্যের অন্নবস্ত্রের কাঙ্গালী দুর্দ্দশা-পীড়িত হতভাগ্য গরীবদের তিনি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া চলিলেও এবং রায়গিন্নির মত সমজদার শ্রোত্রী ও শ্রোতামহলে নিজের পৌরুষ কীর্ত্তনে, হাজার বাহবা লাভে দম্ভস্ফীত হইলেও—ইতর ইন্দ্রিয়পূজার স্বার্থে ইহাদের শ্রেণীবিশেষের জন কয়েকের জন্য তাঁহার নাড়ীর টান বেশ টনটনে সজাগ আছে!

যাহাই হউক, রসিকতার তুফানে চুবন খাইয়া জন্ম সার্থক করিয়া মেয়েগুলি নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। গৌরবাবুও মালা ঝাঁকাইয়া কৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক কি একটা গান গাহিতে গাহিতে নির্জ্জন সন্ধ্যাপথ মুখরিত করিয়া অন্যদিকে চলিলেন।

৩

কিছুদূর আসিয়া একটা পথের মোড় ফিরিতেই দেখা গেল, সন্ধ্যার আবছায়া-ঢাকা, পুকুর ঘাটের পথ হইতে গ্রাম্য পুরোহিতগোষ্ঠির মেয়ে বিধবা সরলা ব্রাহ্মণী এক ঘড়া জল কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে সপ সপ করিয়া আসিতেছে, সঙ্গে তাহার পাঁচ বছর বয়সের শিশু পুত্র। গৌর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গলা খাঁকারি দিয়া ডাকিলেন, "কে রে সরলা?"

বয়সের হিসাবে মেয়েটি গৌরগোপালের মত ব্যক্তির পক্ষে 'তুই-তো-কারীর' যোগ্য মোটেই নয়; কিন্তু গৌরবাবু, 'বাবু মানুষ',—তায় মেয়েটির পিতৃগোষ্ঠীর সম্মান্য যজমান, এবং গ্রামসুবাদে মেয়েটির কাকা সম্পর্কীয় মুরুব্বি, তাই নিজের মুরুব্বিয়ানাটুকু ষোলআনা ফলাইয়া, অতি হিতৈষীজনোচিত মমতা দেখাইবার জন্য 'তুই-তো-কারীটা' মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মেয়েটিও বড় দুঃখী ; দরিদ্র পুরোহিত পিতার সংসারে বড় দুঃখেই দিন কাটে। গৌরকাকার মত অবস্থাপন্ন হিতকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীদের একটা মৌখিক হিতৈষিতাও, সে হতভাগীর কাছে বড় বেশী মূল্যবান। অবজ্ঞার 'তুই' সম্বোধন, সে স্নেহ-সৌভাগ্য মনে করে।

সরলা নিকটে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকা, কাপড় কেচে আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। তুমি কাল হুগলী গিয়েছিলে?"

গৌর অলক্ষিতে একবার পথের এদিক ওদিক চাহিয়া, একটু নীচু সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ বাপু গেছলুম, রামকেষ্ট সা বল্লে, এই শনিবার দিনের মধ্যেই রেজিষ্ট্রী করে দিতে হবে। দ্যাখো বাপু, আর কথার নড়চড় করে আমায় খাত্তাই-এ ফেলো না, বুঝলে। আমি

কথা দিয়ে এসেছি, তোমায় শনিবার দিন হুগলী নিয়ে গিয়ে, রেজিষ্ট্রী করিয়ে দিতে পার্‌লে, তবে আমার দায় উদ্ধার! কি বলো, ভদ্দরলোকের কথাই জাত!"

সরলা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আড়াইশো টাকার ওপর আর কত বাড়িয়ে দেবে?"

গৌর সগর্ব্বে বলিলেন, "পুরোপুরি তিনশোই ঠিক করে এলুম। তোমার গৌরকাকা সে ছেলেই নয় বাবা, যে ঠকে ফিরবে। কতদিনের পতিত, এঁদো-পড়া দোকানঘর, ও কি টাকা দিয়ে কেউ নিতে চায় রে বাবা, ভাগ্যে আমি ছিলুম, তাই রামকেষ্ট সাকে রাজী করিয়েছি। আমি না থাকলে, কারুর বাবার সাধ্যি নাই যে তোর ও-ঘর বিক্রি করায়। এই তো এতদিন পড়ে ছিল, কেউ পেরেছিল বিক্রি করতে? দেখলুম না কি নেহাৎ তুই কষ্ট পাচ্ছিস তাই,—একটা পয়সার অভাবে ছেলেটার রোগে ওষুদ পর্য্যন্ত জুটছে না, তাই ... ...।"

সরলা কৃতজ্ঞ চিত্তে হিতৈষী কাকার কর্ম্মতৎপরতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকার ধর্ম্মের জয়গান করিয়া— শেষে একটু ক্ষুণ্নভাবে বলিল, "বিধবা বামণীকে তুমি যে কি দয়া করলে কাকা, সে বলবার নয়। তোমার ছেলেদের বাড় বাড়ন্ত হোক, কিন্তু সা-মশাইকে বলে কয়ে, আরও যদি ২।১শো বাড়াতে পারতে তবেই ন্যায্য দাম হোত। তখনকার দিনে, তোমার জামাই ও-ঘরখানা আটশো টাকায় কিনেছিল। আমার কপাল পুড়েছে। তাই এত কমে আজ বেচতে হচ্ছে, তবু যদি পাঁচশো টাকাও পেতুম—"

বাধা দিয়া উগ্র-অসহিষ্ণুভাবে গৌর বলিলেন, "সে কি আর সা' মশাইকে বলতে বাকী রেখেছি রে বাপু? তোরা মেয়েমানুষ, ঘরেব কোণে বসে থাকিস, পৃথিবীর খবর কি জানিস বল? আমি কি চেষ্টার ত্রুটী করেছি...।"

গোটাকতক কড়া ধমকে সরলার প্রার্থিত ন্যায্য দামের আশা ইহজন্মের মত ঠাণ্ডা করিয়া গৌর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "ও বিষয়ের দাম এখনকার দিনে ওর বেশী আর হবে না, এখন বিক্রি করবার ইচ্ছে কিনা তাই বল?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সরলাকে উত্তর দিবার অবকাশমাত্র না দিয়া গৌর অধিকতর উগ্রভাবে পুনশ্চ বলিলেন, "আর বিক্রির ইচ্ছেই যদি না ছিল, তবে আমাকে মাঝে রেখে মিছামিছি ধাষ্টেমো করলি কেন? যদি দিবিই না, তবে এ ঢলাঢলি করা কেন? মেয়েমানুষের জাতের মাথায় সাত ঝ্যাঁটা! মেয়েমানুষের কথায় থাকাই আমার ঝকমারী!"

ভয়ে সরলার প্রাণ উড়িয়া গেল! হিতৈষী কাকা দর্পিত-অনুগ্রহে যেটুকু দয়া করিতেছেন, সেটুকুও বুঝি যায়! ভীতি-জড়িত স্বরে বলিল, "না কাকা, তুমি রেগো না। আমি ঐ টাকাতেই দেব, শনিবারেই তোমার সঙ্গে হুগলী যেয়ে রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে আসবো। তোমার্‌ কথা কি ঠেলতে পারি," ইত্যাদি।

প্রসন্ন হইয়া কাকা বলিলেন, "তাই বল বাবা, কথার খাত্তাই কি সহজ কথা? তুই কি মনে করিস, আমি জোচ্চুরি করে তোকে ঠকিয়ে দিচ্ছি? তোর যাতে দু'প..সা হয়. সে কি আমি দেখব না...। তা হলে আমার ধর্ম্ম আর কৈ?"

ঝকমারী বচনের বুকনী ঝাড়িয়া গৌরগোপাল নিঃসংশয়ে সরলাকে বুঝাইয়া দিলেন, —হরিনামের মালা হাতে শপথ করিয়া তিনি বলিতেছেন—তিনি একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী দরিদ্র বন্ধু, মহাত্মা-লোক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার দুঃখে, তাঁহার বিশ্ব-প্রেমিক

প্রাণটা নাকি নেহাৎ গলিয়া গিয়াছে, তাই তিনি সরলার উপকারের জন্য, এত কষ্টে শহরে হাঁটাহাটি করিয়া রামকৃষ্ণ সাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া খরিদদার জুটাইয়াছেন, নচেৎ সরলা খাইতে পাইল আর না পাইল সে খোঁজ রাখিবার তাঁহার কি-ই বা গরজ? আর কি-ই বা বহিয়া গেল?

নিঃস্বার্থ পরোপকারী হিতৈষী কাকার জন্য অজস্র কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া সরলা বাড়ী গেল। গৌর অন্যত্র আড্ডা জমাইতে চলিলেন।

৪

তারপর দুদিন কাটিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যায় গৌরগোপাল নিজের বৈঠকখানাঘরে বসিয়া, প্রতিবেশীদের কাণ জ্বালাইয়া বিরাট উচ্চনাদে কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন :

"গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
ও তার, হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।"

হঠাৎ মস মস শব্দে জুতা পায়ে দুইজন ভদ্রলোক বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।—একজন রায়গিন্নির ছোটছেলে নিতাইবাবু, আর একজন গ্রামের একটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। দুজনেই হুগলী কোর্টে কি কাজ করেন।

রায়গিন্নির কাছে গৌরের প্রসার প্রতিপত্তি যতই থাক, রায়গিন্নির এই ছেলেটিকে গৌর বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। হঠাৎ ইহাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে চমক খাইয়া গৌর শশব্যস্তে যেমন উঠিবেন, অমনি দেখিলেন, বিধবা সরলা ব্রাহ্মণীও তাহাদের পিছু পিছু বৈঠকখানায় ঢুকিল।

গৌরগোপালের 'গৌর প্রেমের ঢেউটা' হঠাৎ যেন কঠিন পাহাড়ের বুকে আছাড় খাইয়া, দম আটকাইয়া সটান পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল। তিনি অবাক হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

নিতাইবাবু, একবর্ণও অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, সোজাসুজি বলিলেন, "রামকেষ্ট সার কাছে, সরলার হুগলীর দোকানঘরখানা কত টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছ গৌর?"

গৌর শুষ্ককণ্ঠে বিষম খাইয়া কাসিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সুরে বলিলেন, "কোন রামকেষ্ট সা?" নিতাইবাবু বলিলেন "হুগলীর আড়তদার।"

উদাসভাবে গৌর বলিলেন, "অ! তা সে তো সরলাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে, আমায় জিজ্ঞেস করার মানে?"

নিতাইবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "রামকেষ্ট সা এটার দাম কত টাকা দিতে চেয়েছে, তুমি বল।"

"সরলাকেই জিজ্ঞেস কর না, ও তো জানে। আমি তো আর লুকোচুরি খেলিনি, যে রাখ্ রাখ ঢাক ঢাক করব।—ওই বলুক না।"

সঙ্গী ভদ্রলোকটী বলিলেন, "কেন? তুমি নিঃস্বার্থ পরোপকারী, গরীবের বন্ধু—তুমিই বল না। দালালী তো ভাই, তুমিই করছ! রামকেষ্ট সা নাকি তিনশো টাকার বেশী এতে দেবেন না? তোমায় বলেছেন তো তিনি?"

কটমট চক্ষে চাহিয়া গৌর রুষ্টস্বরে বলিল, "কি tricks খেলবার মতলবে তোমরা এসেছ বলো তো?—চালাকি করবার জায়গা আর পাওনি নয়, তাই—"

ভদ্রলোক ব্যঙ্গসুরে বলিলেন, "রামঃ! তুমি কি পিতৃহীন নাবালক ছেলে, না—মুরুব্বিশূন্য অশিক্ষিতা নির্ব্বোধ বিধবা মেয়ে, যে তোমার সঙ্গে tricks খেলে চালাকী করে—এক নিঃশ্বেসে চারশো টাকা হজম করে, বেমালুম পার পেয়ে যাব? দ্যাখো তো ভাই, রামকেষ্ট সার এই চিঠি আর দলিল, এ ভদ্রলোক তিনশো দিচ্ছে, না—সাতশো টাকা দিচ্ছে?"

ভদ্রলোক চিঠি ও রেজেষ্ট্রীর জন্য প্রস্তুত দলিলখানি খুলিয়া গৌরবাবুর সামনে ধরিলেন, দলিলখানির লিখনকর্ত্তা স্বয়ং গৌরবাবুই ছিলেন,—হস্তাক্ষর অস্বীকারের পথ নাই! গৌরবাবু আড়ষ্ট হইয়া আড়চোখে চিঠিখানার দিকে চাহিলেন, রামকৃষ্ণ সাহা নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া নিতাইবাবুর উদ্দেশে জানাইতেছে যে, "সরলাদেবীর দোকানঘর খরিদ বাবদ তিনি সাতশ টাকা দিবেন, মধ্যস্থ গৌরবাবুর সঙ্গে এই কথাই পাকাপাকি ঠিক হইয়া গিয়াছে। গৌরবাবুর দালালী ফি তিনি আলাদা দিবেন। আগামী কাল শনিবারে,—রেজেষ্ট্রী হওয়া চাই। গৌরবাবুকে বলিবেন।"

নিতাইবাবু বলিলেন, "কি গৌর, সাতশ টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে, মালিক শুধু তিনশো টাকা পাচ্ছে, বাকী চারশো কি তোমার কমিশন?"

সরলা অসহ্য দুঃখে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া মাথা চাপড়াইয়া পাগলেব মত আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকা, আমি যে বিশ্বাস করে সব তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলুম! আমি এক পয়সার কাঙাল,—বড় হতভাগী!—আমার মত কাঙাল গরীব বিধবা পেয়ে কেমন ক'রে গলায় ছুরি দিতে বসেছিলে কাকা?"

অন্যায় অত্যাচারের দাসত্বে যে কাপুরুষ নিজের সমস্ত মনুষ্যত্ব বেচিয়া খাইয়াছে, সে যখন শক্ত পাল্লায় ঠেকিয়া ন্যায়ের গুঁতা খায়, তখন তাহার অত্যাচারী স্বভাব হাতের কাছে যে দুর্ব্বল জীবটাকে পায়, সেইটার গলা টিপিয়াই নিস্ফল আক্রোশ চরিতার্থ করিতে চায়!—গৌরগোপাল ধর্ম্মাভিমান কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান সব হারাইয়া ক্ষিপ্ত পশুর মত হঠাৎ সরলার উপর লাফাইয়া গর্জ্জিয়া হাঁকিলেন, "নিকাল '—' বেটী, দূর হ আমার বাড়ী থেকে।"

নিতাইবাবুর সঙ্গী ভদ্রলোকটি গৌরগোপালের পথরোধ করিয়া বলিলেন, "তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তোমার বাড়ী এসেছি বাবা, দুশ্চিন্তা নিস্প্রয়োজন! কিন্তু নিরপরাধ অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর জানোয়ারের মত—পিশাচের অত্যাচার করাটায়—তোমার গঙ্গাস্নান আর মালা ঠকঠকানি পুণ্যের কি বাড়বাড়ন্ত হয়, সেটা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রের পাতা খুলে একবার আমায় দেখিয়ে দাও ত বাপ! জন্মটা সার্থক করেই আজ বাড়ী ফিরি তাহ'লে!"

শৃঙ্খলাবদ্ধ বানরের মত নিষ্ফল ক্ষোভে দাঁত খিঁচাইয়া খ্যাঁক ম্যাক কবিয়া গৌর পাগলের মত উপর্য্যুপরি বলিল, "বেরো সব, বেরো আমার বাড়ীর থেকে, দূর হ—দূর হ আমার বাড়ী থেকে, এখনি বেরো।"

ভদ্রলোক হাসিমুখে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, বহু ধন্যবাদ! তোমার 'গৌর প্রেমের

ঢেউ' এবার নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মাণ্ডটাকে রসাতলে তলিয়ে দিক, আমরা খুসী হয়ে তারিফ করব। আপাততঃ—নমস্কার।"

তিনজনে বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।—

সে রাত্রে গৌরবাবুর বৈঠকখানায় আর গৌরপ্রেমের ঢেউয়ের উল্লাস-তরঙ্গ বহিতে শোনা গেল না। এবং তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গাস্নান পুণ্য কিসে ক্ষয় হয় আর কিসে অক্ষয় অমর হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ উপদেশ করিতে, রায়গিন্নির বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে পদার্পণ করেন নাই, এইরূপ শোনা যায়।

ভণ্ডের সার্থকতা

পৌষ মাসের সন্ধ্যার কনকণে ঠাণ্ডায় চারিদিক যেন আড়ষ্ট। কলিকাতা সহরের কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়া শীতের ভারে জড়-সড় হইয়া গুটি মারিয়া মাটার বুকে লুটাইতে ব্যগ্র। কলিকাতার কারখানাবহুল স্থানগুলির রাস্তা দিয়া চলিতে পথিকগণের নিঃশ্বাস ধোঁয়াটে বাতাসের বাষ্পচাপে বুকের ভিতর যেন আটকাইয়া যাইতেছে।

কম্বুলেটোলায় '...' ষ্ট্রীটে এটর্ণি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্য রং করা নূতন তেতলা বাড়ী বিদ্যুৎ আলো বুকে ধরিয়া গর্ব্বভরে হাসিতেছে। এটর্ণি মহাশয়ের আলোকোজ্জ্বল সসজ্জ অফিসঘর বা বৈঠকখানায় ল্যাজারাস কোম্পানীর খাস কারখানার তৈরী চেয়ার সোফা কৌচে গুটিকতক ধনী মাড়োয়ারী ও বাঙালী মক্কেল বসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এটর্ণি মহাশয়ের শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে।

সবুজ বনাত ঢাকা সুবৃহৎ সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের কাছে একটা গদী মোড়া চেয়ারে বসিয়া প্রৌঢ় এটর্ণি মহাদেব চট্টো চুরুট টানিতেছিলেন। মহাদেববাবুর চর্ব্বি-বহুল বেঁটে চেহারার মাঝে সুবিশাল ভুড়ি এবং আকণ্ঠ বেষ্টিত গরম কাপড়ের মোটা ইংরেজি পোষাকে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র হস্তপদমুণ্ডবিশিষ্ট সজীব ফুটবলের মত দেখাইতেছিল। বুকের উপর হীরকখচিত টাইপিনে আঁটা রঙিন রেশমী টাই দুলিতেছে। আঙুলে হীরার আংটি ঝক ঝক কবিতেছে। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। মুখের দাড়ি গোঁফ ক্ষৌর-মসৃণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখে লুব্ধ-চঞ্চল প্রখর দৃষ্টি। পুরু পুরু অধরৌষ্ঠ দুটি প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার ভারে যেন উল্টাইয়া পড়িতেছে! মানুষটির দিকে চোখ পড়িলেই মনে হয়, লোকটির সবদিক দিয়া বেজায় জাঁক—বিপুল দম্ভ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রবীণ এটর্ণির ডানদিকে বসিয়া তাঁহার নব-জামাতা নবীন এটর্ণি অরুণবাবু। তাঁহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য শ্বশুরের বেশ বিন্যাসের অনেক উচ্চে। অধিকন্তু ঝাড়ালো ভ্রূ, কামানো গোঁফ এবং ব্যারিষ্টারী ফ্যাশানের কেশ প্রসাধনে তাঁহার সুশ্রী তরুণ মুখমণ্ডল অধিকতর শ্রীমান। অরুণবাবুর অদূরে ভীমকান্তি অনন্ত কেরাণী বসিয়া আছেন।

এটর্ণি মহাদেববাবু মাড়োয়ারী মক্কেলদের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সসম্মানে তাহাদের বিদায় দিলেন। তারপর বাঙালী মক্কেলদের একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সেটার কি হল?"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "আপনি যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কান্তিবাবুকে ঠিক তেমনি গিয়ে বললাম—"

অনন্ত কেরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "কি কি কথা বলেছিলেন আগে বলুন—"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "বললাম কারবারে পাঁচ বছরের নোকসানে যা দেনা হয়েছে, তার অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর দশ বছরের লাভের অংশ আমাদের দিতে হবে।"

মহাদেব চট্টো বলিলেন, "হাঁ, তাতে কি বল্লেন?"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "তিনি জবাব দিলেন, পাঁচ বছরে পনের হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, কিন্তু দশ বছরের লাভ মাত্র বারো হাজার। অর্থাৎ এখনো দেনা তিন হাজার বাকি!"

অরুণবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "Impossible! কোর্টের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন ওসব বদমাইসকে সিধা করা যাবে না। আপনারা নালিশ করুন।"

বাঙালী মক্কেলটি বিপন্নভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই করব মনে করছিলাম, কিন্তু মা কান্নাকাটি করছেন, বলছেন উনি আমার স্বর্গগত পিতার বহুদিনের হিতৈষী বন্ধু, আজ সামান্য দু পাঁচ হাজার টাকার জন্যে তাঁকে নালিশ ফ্যাসাদে ফেলে জব্দ করা উচিত হবে না।"

অরুণবাবু বক্রহাস্যে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মহাদেববাবু উগ্রভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তাহলে আর আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ কেন? বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে যদি মেয়েলি sentimentই বেশী মূল্যবান মনে কর, তাহলে আইন আদালতগুলোর কোন দরকারই নেই। আমরা বাপু ওসব আধ্যাত্মিক বুজরুকি বুঝি না, আমরা ওসব কথায় কি বলব? হাঁ, এস আইনের দিকে, আমরা তোমার হয়ে লড়ছি। —না হয়, যা বোঝ কর।"

তিরস্কৃত ভদ্রলোকটি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। অরুণবাবু অন্য একটি মক্কেলের দিকে চাহিয়া শ্লেষমিশ্রিত বাক্য হাস্যে বলিলেন, "এ দুনিয়ার একদল লোক আসে ঠকাতে, আর একদল লোক আসে ঠকতে। নিজের জোরে যিনি প্রথম দলে স্থান নিতে না পারেন, struggleএর চোটে তাঁকে দ্বিতীয় দলে গিয়ে পড়তেই হয়। কোন কৃত্রিম ভাবুকতাই জীবনের সে লোকসানকে ঠেকাতে পারে না, কি বলুন মশাই?"

মক্কেলটি এই মন্তব্যে মহা চরিতার্থ হইয়া মহাহ্লাদে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে, যা বলেছেন, মশাই! এ দুনিয়ার নিয়মই হচ্ছে হয় ঠকো, নয় ঠকাও।"

তৃতীয় মক্কেলটি নিজের কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে মৃদু-হাস্যে বলিলেন, "তবে নির্ব্বিবাদে পরকে ঠকাতে হলে পকেটে কিছু পয়সা থাকা চাই। খালি পকেটে ঠকাঠকির কারবারে নামলেই বিপদ! কেননা ধরা পড়লে উদ্ধারের পথ থাকে না।"

মহাদেব চট্টো সুগম্ভীর মুখে বলিলেন, "উদ্ধারের আবার পথ থাকে না? সবদিকেই পথ। তবে ধার্ম্মিক পরমহংস হয়ে চল্‌তে গেলে কোনদিকে পথ দেখতে পাবেন না। নইলে বুদ্ধি থাকলে দেখতে পাবেন, পকেট খালিই থাক আর ভর্ত্তিই থাক, পয়সা চারদিকে

ছড়ানোই রয়েছে, শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। উপার্জ্জনের পথে ধর্ম্মভয়, চক্ষুলজ্জা থাকলে উপার্জ্জন হয় না।"

এই উপাদেয় যুক্তিমাহাত্ম্যে ঘরের সমস্ত লোকগুলি ক্ষণকালের জন্য যেন মন্ত্রমুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বোধ করি সকলেই অতঃপর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ উপার্জ্জনের অবাধ স্বচ্ছলতার সোনার স্বপ্ন একবার কল্পনা চক্ষে দেখিয়া লইলেন। ধর্ম্মভয়, নীতিজ্ঞান, চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি কৃত্রিম ভাবুকতাগুলা এ পৃথিবীতে উন্নতিকামী মানুষদের সমস্ত উন্নতির যে কত বড় প্রতিবন্ধক, সে তত্ত্বটা দিব্যচক্ষে সকলেই পরিষ্কাররূপে যেন দেখিতে পাইলেন! সুবৃহৎ তেতলা চারতলা বাড়ী, সুদৃশ্য মূল্যবান মোটরগাড়ী, ঘরের ভিতরের আরামপ্রদ আসবাব ও উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি যে ধর্ম্মভয়, চক্ষুলজ্জা, নীতিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, এগুলি উপার্জ্জনের পথ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ কথা লুব্ধ বিহ্বল চিত্তে একবার সকলেই স্মরণ করিয়া লইলেন। ভিতরের দিকে একটা দমকা ঝড়ে অনেক কুসংস্কার, কৃত্রিম ভাবুকতা ওলটপালট হইয়া গেল। কিন্তু সে ওলটপালটের সংবাদ কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না, সকলেই বিশেষ যত্নে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া নীরব রহিলেন।

এই অবকাশের ফাঁকে শোনা গেল, বাহিরের রাস্তায় একখানা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং কে একজন করুণ-কণ্ঠে দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল, "এই ত ছত্রিশ বাই দুই নম্বর বাড়ী? মহাদেববাবু বাড়ীতে আছেন।"

মুহূর্ত্তে মহাদেববাবু টেবিলের কলিং বেল টিপিয়া দরোয়ানের উদ্দেশে সাঙ্কেতিক আহ্বান জানাইয়া নিজে উঠিলেন। ব্যস্ত চরণে পাশের কামরার দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, "মোহিতবাবু, আপনার কাগজগুলি আর ফি'র টাকা অনন্ত কেরাণীর কাছে জমা দিয়ে যান, আপনি পর্শু সকালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর বল্লভবাবু, আপনি অনুগ্রহ করে কাল সন্ধ্যায় আসবেন, আজ আপনার মামলার কথা অরুণকে বুঝিয়ে দেন। আমি পরে সব ঠিক করব।"

দুয়ারের রেশমী পর্দ্দা ঠেলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

২

মহাদেববাবু পাশের কামরায় ঢুকিতেই বিপরীত দিক হইতে দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। বিনা প্রশ্নেই নিবেদন করিল, "খিদিরপুরসে জানানা সোয়ারী আয়া। আপকা মূলাকাৎ মাংতে?"

"জানানা সোয়ারী?" বলিয়া মহাদেববাবু চিন্তিতভাবে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "শোফারকো বোল দেও, হাম পাঁচ মিনিটকা ভিতর গাড়ী মাংতা।"

"যো হুকুম"— বলিয়া দরোয়ান প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "উয়ো লোক হুজুরকো মুলাকাৎ মাংতে থে। কেয়া বোলেঙ্গে?"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হুজুর বলিলেন, "উয়ো লোককা হুকুম তামিল করণেকে ওয়াস্তে হাম তুমকো তলব নেহি দেতা। তোম পয়লে মেরা হুকুম দেখো—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। দরোয়ান উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিল।

মহাদেববাবু অন্তঃপুরে ঢুকিতেই দেখিলেন, সিঁড়ির উপর হইতে একটি তেরো চৌদ্দ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ বালিকা নামিয়া আসিতেছে। অপ্রসন্ন মুখে তিনি বলিলেন, "এই রুজি, তোর মা কোথা?"

মেয়েটি বলিল, "মার মাথা ধরেছে, শুয়ে আছেন।"

মহাদেববাবু বলিলেন, "কোথা?"

"দক্ষিণদিকের ঘরে।"

"আচ্ছা। বাড়ীর সকলকে বলে দে ; যেন কেউ এখন তোর মাকে বিরক্ত করতে যায় না। বাইরে থেকে মেয়েরা কেউ দেখা করতে আসে ত তোরা বাইরে থেকেই বিদেয় করে দিস, বুঝলি?"

"আচ্ছা।"

মহাদেববাবু টক টক করিয়া উপরের দক্ষিণদিকের ঘরে চলিলেন। ঘরেব বিদ্যুৎ আলো নিবান ছিল, অন্ধকারে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "গিন্নি জেগে আছ?"

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল, "আছি।"

"মাথা ধরেছে তোমার?"

"হুঁ।"

মহাদেববাবু বলিলেন, "ভালই হয়েছে। তুমি শুয়ে থাক। খিদিরপুর থেকে মিহিরের মা এসেছেন। তুমি আজ আর ওঁকে দেখা দিও না। আমি বাইরে চল্লুম। যেমন জ্বালাতে এসেছে, তেম্নি জব্দ হয়ে ফিরে যাক।"

অন্ধকারে বিছানার উপব উঠিয়া বসিয়া গৃহিণী সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, "পিসিমা নিজে এসেছেন? কৈ, কোথা?"

কর্ত্তা রুষ্টস্বরে বলিলেন, "যেখানেই হোক। তুমি অত বাড়াবাড়ি কোর না। আমি বার বার বলেছি অত আমল দিও না, ওতেই ওদের আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে। যদি ওরা বোঝে যে টাকা পাবার আশা নেই, তাহ'লে ওরা এমন করে বার বার উত্ত্যক্ত করতে আসে না। বুঝতে পারছ আমার কথা?"

গৃহিণী একটু নীরব থাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "বুঝতে ত পারছি। কিন্তু একদিন যে বড় বিশ্বাস করেই শুধু আত্মীয় বলেই বিধবার সর্ব্বস্ব ঝুলি ঝেড়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেদিনের কথা—"

বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কর্ত্তা চাপা গর্জ্জন সহ বলিলেন, "চপরাও : মুখ সামলে। অত আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলে আমার আর করে' খেতে হ'ত না। পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দাও অমনি বল্লেই হল? টাকা কি খোলামকুচি না কি?"

ভালমানুষ গৃহিণীর বুঝিবার পক্ষে এই তর্জ্জনটাই যথেষ্ট। তিনি স্তব্ধ রহিলেন।

কর্ত্তা রাগ সামলাইয়া নরম সুরে বলিলেন, "আইনমতে আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট

লিখিয়ে নেয়নি কেন? এভাবে জ্বালাতন করা, ওদের অন্যায়। টাকা ফেরৎ পাবার যদি ইচ্ছেই ছিল, তাহলে তখন টাকা হাতছাড়া করেছিল কেন?"

গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিহির ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ শুনেছ ত? এই শীতের রাতে বুড়োমানুষ কষ্ট করে এসেছেন যখন, শুধু হাতে ফেরান কি ভাল?"

কর্ত্তা জুতা ঠুকিয়া বাঁধানো নকল দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "তোমার মত নচ্ছার মেয়েমানুষকে চাবুক দেওয়াই ঠিক! আমি এক পয়সাও দেব না, তোমার ক্ষমতা থাকে, বাপের ঘর থেকে টাকা এনে দাও। না হয় নিজে রোজগার করে দিতে পার ত দিও।"

অন্ধকারেই নিঃশব্দে গোপনে গৃহিণী চোখের জল মুছিলেন। কর্ত্তা প্রস্থানোদ্যত হইয়া তীব্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমি একে সাত ঝঞ্ঝাটের মানুষ। কত কষ্টে মাথা খাটিয়ে সকল দিক সামলে চলছি। এমন করে না চললে তোমার ছেলেদের বিলেত পাঠানো, মেয়ের জন্যে এটর্ণি, ডাক্তার জামাই আনা মাথায় উঠত। গুষ্ঠিসুদ্ধ ওই ফুটপাথে গে দাঁড়াতে হ'ত আজ, তার খোঁজ রাখ? বড় আমার খয়রাৎ করবার পয়সা দেখছ! কিন্তু এদিকে যে কি করে দিন চালাচ্ছি, তার খোঁজ রাখ না ত! ভাল চাও তো যা বলছি শোন। সাবধান, বাড়ী ফিরে যদি শুনি, আবার তেমনি করে লুচি মোণ্ডা খাইয়ে ওদের খাতির করেছ, তা হলে আজ তোমারি একদিন কি আমারই একদিন!"

কর্ত্তা ফিরিয়া চলিলেন। বারেন্দা দিয়া যাইতে যাইতে উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "আজ আমার ফিরতে রাত বারোটা হবে। বাড়ী এসে খাবার সময় হবে না, বড্ড কায। আমার খাবার রেখো না।"

বাহিরে মোটর প্রস্তুত ছিল। নীচে আসিয়া খানসামার নিকট হইতে হ্যাট ও ছড়ি লইয়া মহাদেববাবু তাড়াতাড়ি মোটরে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটি ষোল সতের বৎসরের বালক আসিয়া প্রণাম করিল। ছেলেটির কৃশ মলিন মূর্ত্তি, দৈন্য-সূচক বেশভূষা এবং পায়ের ছেঁড়া জুতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় ভদ্রগৃহের ছেলে হইলেও বেচারার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছেলেটির চোখে মুখে নিদারুণ উদ্বেগ ও ভীতির চিহ্ন; ছেলেটির মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয় সে যেন কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের বেদনায় সন্তপ্ত; অথবা যেন অনভ্যস্ত হাতে চুরি করিতে আসিয়া এইমাত্র সে হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে!

ছেলেটি প্রণাম করিতেই মহাদেববাবু তার দিকে চকিত কটাক্ষে একবার চাহিয়াই, প্রতিনমস্কারচ্ছলে টুপিটি দোলাইয়া দ্রুতপদে চলিলেন। ছেলেটি ত্রস্তে তাঁহার অনুসরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা এসেছেন খিদিরপুর থেকে। একবার অনুগ্রহ করে দেখা করে যান।"

মহাদেববাবু যেন শুনিতে পান নাই, এমনিভাবে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উঃ? আমায় কিছু বলছ?"

ছেলেটির জিভ যেন জড়াইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ,—মা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

পরম অজ্ঞতার ভাণ করিয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "মা! কে?"

ছেলেটি প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "খিদিরপুরের মিহির বাঁড়ুয্যের ভাই আমি, অনিল বাঁড়ুয্যে। আমার মা—"

মহাদেববাবু বলিলেন, "অ! তুমি অনিল? আমি চিনতে পারিনি। তারপর, বাড়ীর সব ভাল ত?"

ছেলেটি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, দাদার বড় অসুখ। সেইজন্যেই মা চিঠি লিখেছিলেন আপনাকে।"

অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে মহাদেববাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সে চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার জবাব দেবার মত কিছুই নেই বাবু, নইলে কি চুপ করে থাকি? তোমার মাকে বুঝিয়ে বলগে, এর পর একদিন আমি অবকাশমত গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আজ দেখা করবার সময় নেই। ঐ দেখ গাড়ী দাঁড়িয়ে, এখন জরুরী কাযে যাচ্ছি, এর পর রাত বারোটায় ফিরব। আজ দেখা হবে না, তোমরা আজ বাড়ী যাও।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন। শোফার মোটরে ষ্টার্ট দিয়া ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিল। প্রস্থানোদ্যত গাড়ী ধক ধক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া মোটরের পাশে দাঁড়াইল। উদ্বেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনার সঙ্গে মার দেখা করা আজ বিশেষ দরকার। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমরা এইখানেই রইলুম!"

রুদ্ধ স্বরে মহাদেববাবু বলিলেন, "থাকতে পারো। কিন্তু আজ আমি ফিরব কি না সন্দেহ। তা ছাড়া তত রাতে ফিরে দেখাশোনা করা সম্ভব হবে না, আমার বাড়ীতেও আজ অসুখ বিসুখ। তোমরা এই সময় ফিরলেই ভাল করতে।"

হতবুদ্ধি বালককে দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া মোটর দৌড়িল।

৩

বাস্তবপক্ষে মহাদেববাবুর কোন কাযই ছিল না। সুতরাং উদ্দেশ্যহীনভাবে দু পাঁচটি বন্ধুর আড্ডায় ঘুরিয়া, শেষে ইংরেজি হোটেলে গিয়া মোটা দক্ষিণা দিয়া রসনা ও উদরের তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গোলাপী নেশা লইয়া খোশ মেজাজে বাড়ী ফিরিলেন। রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে। এতরাত্রে কোনও নির্লজ্জ পাওনাদার দুয়ারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকিবে এমনটা আশা করা সুখবিলাসী মোটরবিহারী মূল্যবান পরিচ্ছদমণ্ডিত মহাদেববাবু অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

মোটর্ বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া থামিল। মহাদেববাবু গাড়ী হইতে নামিতেছেন, এমন সময় মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া আবার সেই ছেলেটি আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

বৈঠকখানায় মক্কেলের চিহ্ন নাই, হাতে কাযের ভিড় নাই, উদর পূর্ণ—সুতরাং মেজাজ তখন পরম শীতল। মহাদেববাবু এবার স্বয়ং উপযাচক হইয়া বলিলেন, "কি হে অনিল, এখনো রয়েছ যে?"

অনিল শুষ্ক ম্লানমুখে বলিল, "মা আপনার জন্যে বসে রয়েছেন।"

গম্ভীরভাবে মহাদেববাবু বলিলেন, "অনর্থক বসে থাকা। চল বাড়ীর ভেতব।"

উভয়ে বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাস্তার ওদিকে

ফুটপাথ হইতে একটা লোক ছুটিয়া আসিল। লোকটার চেহারা ষণ্ডামার্কা, পোষাক পরিচ্ছদ পশ্চিমা ভদ্রলোকের মত। নিকটে আসিয়া একটা ছোট সেলাম করিয়া লোকটা বাজখাই সুরে বলিল, "তোমার তল্লাসে সারা এটর্ণি পাড়া ক'দিন ঘুড়ছি মুশই, এইখানে লতুন বাসা লিয়েছ কেন?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "তুমি কে বল দিখি? কাকে খুঁজছ?"

রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া লোকটা বলিল, "তোমায় গো মহাদেববাবু, তোমায় খুঁজছি! হামায় চিনতে পারছ না? হামী তোমাদের পুরোণো দোস্ত পীর মহম্মদ! আজ পনরো রোজ জেল থেকে খালাস হয়েছি।"

জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মহাদেববাবু নিম্নস্বরে বলিলেন, "দেউড়ীর ভেতর এস, এখুনি পুলিসের লোক এসে পড়বে হয়ত।"

তিনজনে দেউড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। দারোয়ান তটস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, মহাদেববাবু বলিলেন, "বাহার যাকে খাড়া রও।"

দাবোয়ান বাহিরে গেল। অনিলের দিকে চাহিয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "ওহে, তোমার মাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি শীঘ্র যাচ্ছি। তুমি যাও।"

অনিল ভিতরে গেল। তাব প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া পীর মহম্মদ বলিল, "এ ছোকরা কি তোমার পাওনাদার আছে না জী?"

শুষ্ক স্বরে মহাদেববাবু বলিলেন, "না। ও ছোকরা আমার আত্মীয়।"

বিকট হাস্যে পীব মহম্মদ বলিল, "হা হাঁ, সে হামি শুনেছে। সেই বাহানায় ওর মায়ের দশ হাজার রূপেয়া মেরে লিয়েছ, না? তুমি পাক্কা খেলওয়াড় বাবুসাহেব! আচ্ছা, ভালা হোক। হামার আবি তিন চারশো রূপেয়া হাওলাৎ দেও তো।"

চমকাইয়া উঠিয়া শুষ্কমুখে মহাদেববাবু বলিলেন, "তিনশো টাকা? রামচন্দ্র বল! আমার বাক্সে আজ গোটা ত্রিশ টাকাও আছে কি না সন্দেহ।"

পীর মহম্মদ পাকা ব্যবসায়ী। মহাদেববাবুর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইযা স্মিত মুখে বলিল—"বাবুসাহেব. তোমার গুণ্ডামি ঝুটা বাতে, ঔর আংরেজকা আইন আদালতে! লেকিন পীর মহম্মদের গুণ্ডামি—সাচ্চা ছোরার কাচ্চা ঘাও মে! ঝুট বাৎ মাৎ বোলো। মোহিত মিত্তির আজ সামকো বখৎ পাঁচশো পঁচাশ রূপেয়া তোমার বাড়ীতে দিয়েছে, হামি খবর রাখে। চারশো রূপেয়া নিকালো বাবু, বহুৎ সুবিস্তা করে বলেছি। একরোজ হামার চার হাজার খা'কে হামায় জেলমে ভেজিয়াছিলে, খেয়াল হ্যায়?"

মহাদেববাবু নীরস কণ্ঠে বলিলেন, "আমরা কি ইচ্ছা করে মক্কেলকে জেলে পাঠাই বাপু? সেবার তোমার কেস খারাপ হয়ে গেল, আমরা অত চেষ্টা করলুম—"

উত্তেজিত হইয়া পীর মহম্মদ বলিল, "তোমরা হরিহর উকিলকা ভুড়ি ফাঁড়কে হামরা দো হাজার রূপেয়া একরোজ নিকালে লিবই বাবুসাহেব! ও শালা হামারা সাৎ বহুৎ দাগাবাজি কিয়া! হম জেলকো নেহি ডরতা, লেকিন জেলমে যব যানাই পড়া, তব রূপেয়া কাহে ছোড়েঙ্গে?" ক্রোধের উত্তেজনায় পীর মহম্মদের হিন্দী ক্রমে উর্দ্দুতে চড়িতেছিল।

সহানুভূতি-বিগলিত কণ্ঠে মহাদেববাবু বলিলেন, "সে ত বটেই, হরিহরবাবু তোমার অত টাকা খেয়ে ভাল কায করেননি। কিন্তু আমার খাটুনি দেখেছ তো? তোমায় সঙ্গে

নিয়ে দুপুর রাত পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, নিজে ত আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমার জন্যে যত খেটেছি, এত খাটুনি আর কখনো—"

বাধা দিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পীর মহম্মদ বলিল, "উসমে মেরা কেয়া কাম হুয়া? কুছ নেই—"

মহাদেববাবু বলিলে, "আহ্ হা! সে কি আমাদের দোষ? ডাক্তার কবিরাজ রুগী দেখে ওষুধ দেয়, পয়সা নেয়, তারপর রোগী যদি না সারে, তাহলে কি নিজের পারিশ্রমিক ফিরিয়ে দেয়?"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রূঢ় গর্জ্জনে পীর মহম্মদ বলিল, "জাস্তি ষড়বড়াও মৎ! পীর মহম্মদকো পছান্তা নেহি? দোস্তি মাঙ্গো তো চারশো রূপেয়া দে দেও, ব্যস চলা যাতাহেঁ। নেই ত দুসমনি মাঙ্গো তো, জান যায়েগা বাবুসাব। হাম সাচ্চা বাৎ বোলা, আব তোমরা যো খুশী—বোল দেও।"

গায়ের কাপড় সরাইয়া পীর মহম্মদ ইঙ্গিতে দেখাইল,—কোমরে দীর্ঘ ছোরা! দারুণ শীতের রাত্রে মহাদেববাবুর কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল, দ্রুত নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া, একটু কাসিয়া শুষ্ক বিনীত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "না, না, ওসব কথা তুমি মনে করছ কেন? তবে কি না—কথা হচ্ছে কি—"

পীর মহম্মদ বুঝিল, এই ভূমিকার শেষ পরিণামে বহু আপত্তিই বাহির হইবে। মুহূর্ত্তে সে ছোরা খুলিযা সোজা হইযা দাঁড়াইল। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "মুঝে ঠিক বোল দেও রূপেয়া আভি মিলেগা, ইয়া নেহি?"

মহাদেববাবুব আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। পীর মহম্মদেব সে কর্কশ কণ্ঠধ্বনি দেউড়ির খিলানের গায়ে প্রতিহত হইয়া চারিদিকে যেন গম গম করিয়া উঠিল। মহাদেববাবু স্পষ্টই বুঝিলেন, এই গোঁয়ার গুণ্ডাটা আর যাই হউক,— এ ব্যক্তি আত্মীয়-বালক অনিলচন্দ্রের মাতা নহে! দুর্ব্বলকে ফাঁকি দিবার সময় অনেক জুলুম খাটে, কিন্তু সবল যখন পদাঘাত করিয়া লইতে আসে, তখন আইন কানুনগুলা বড় বিশৃঙ্খল বোধ হয়। নিরুপায় ভাবে মাথা চুলকাইয়া ক্লেশ পীড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা থাম, গোলমাল কোর না। তোমায় টাকা দিচ্ছি। ওরে কে আছিস, অনন্তকে ডাক তো।"

প্রভুর আদেশমত দরোয়ান বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আদেশমাত্রই "যো হুকুম" বলিয়া ছুটিয়া গিযা নিদ্রিত অনন্তবাবু কেরাণীকে ডাকাডাকি জুড়িল। পীর মহম্মদ ছোরা যথাস্থানে রাখিল।

মহাদেববাবু ইতস্ততঃ চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "দ্যাখো পীর মহম্মদ, টাকাটা তোমায় দিচ্ছি বটে, কিন্তু এটা একরকম ধার করেই দিচ্ছি। কথাটা গোপন রেখো, এমন কি আমার কেরাণী দরোয়ানের কাছেও একথা প্রকাশ কোর না। কথাটা জানাজানি হলে এখুনি চারিধার থেকে সব পাওনাদার ছুটাছুটি করে আসবে।"

অনন্ত কেরাণী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিশাল ভুঁড়ির ভারে হাঁসফাস করিয়া ছুটিয়া আসিল। মহাদেববাবু ঢোক গিলিয়া ক্লিষ্টভাবে বলিলেন, "ওহে অনন্ত, শ তিনেক টাকা নিয়ে এস।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পীর মহম্মদ বলিল, "আউর একশো?"

মিনতি-করুণ কণ্ঠে মহাদেববাবু বলিল, "দ্যাখো, সেটা আর একদিন এসে নিও। কাল সকালে উঠেই আমার সংসার খরচ আছে, তারপর বাড়ীতে আমার স্ত্রীর অসুখ—"

ঘণ্টাকতক আগে এই মহাদেববাবু শিকারী সাজিয়া শিকার-মক্কেলকে বৈষয়িক ব্যাপারে সেন্টিমেন্টের অসারতা সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। মূর্খ গুণ্ডা পীর মহম্মদ সে উপদেশ শুনে নাই, শুনিলে সম্ভবতঃ নিজের শিকারের উপর এখন সেই উপদেশ বর্ষণ করিয়া বলিত—"তোমার সংসার খরচ আছে, তোমার স্ত্রীর অসুখ, তাতে আমার কি? আমার বহুৎ টাকা গিলিয়াছ, আজ তার কিঞ্চিৎ উগরাইয়া না দিলে ছাড়িব না।"

কিন্তু পীর মহম্মদ লেখাপড়া শিখিয়া প্যাচালো বুদ্ধির জোরে গুণ্ডামি করিতে অভ্যস্ত নয়, তার গুণ্ডামি সোজাসুজি গায়ের জোরে। সুতরাং মহাদেববাবুর অনুনয়ে কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া বলিল, "আচ্ছা ভাইয়া, তুমারা খরচা রহনে দেও, আভি তিনশো লাও।"

একটা তুচ্ছ ব্যক্তিকে এটর্ণি প্রভুর সঙ্গে সমান বিক্রমে কথা কহিতে দেখিয়া অনন্ত কেরাণীর সুপ্তিজড়িত মস্তিষ্ক যথেষ্ট বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তুচ্ছ পরিচ্ছদে আবৃত হইলেও লোকটা যে কোন একজন মহৎ ব্যক্তি না হইয়া যায় না, এটুকু অনুমান করিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া টাকা আনিতে ছুটিল।

তিন মিনিটের মধ্যে ত্রিশখানি দশ টাকার নোট আনিয়া, অনন্ত কেরাণী পীর মহম্মদের হাতে গণিয়া দিল।

টাকা পাইয়া পীর মহম্মদ অপেক্ষাকৃত মোলায়েম হইল। লম্বা সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "দো হপ্তা বাদ আকে বাকী রূপেয়া লিয়ে যাব।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইল।

৪

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল।

চোর পলাইবার পর অনেকের বুদ্ধিই অনেক দিকে বাড়ে। মহাদেববাবুরও বাড়িতে কসুর হইল না। ঐ গুণ্ডাকে দেউড়ী হইতে দক্ষিণা দিয়া বিদায় না করিয়া কোন গতিকে যদি ঘরের ভিতর আনিয়া বসান হইত, তারপর টেলিফোঁযোগে যদি পুলিসকে খবর দেওয়া যাইত, তারপর—তারপর—ইত্যাদি অনেক কথাই মহাদেববাবুর মনে হইল। কিন্তু অসময়ে সেগুলা মনে হওয়ায় তিনশো টাকার শোক, তিন লক্ষকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল। মহাদেববাবু নিজের আঙুল কামড়াইতে লাগিলেন।

সত্য বটে, তিনি এক সময় বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ঐ গুণ্ডাটাকে হাতে পাইয়া অতি অযথা পরিমাণেই তার রুধির শোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকটা এতদিনের পর গলায় আঙুল দিয়া অবলীলাক্রমে সে রুধির বাহির করিয়া লইবে, এ কি সহ্য হয়? এদিকে ওসব শ্রেণীর লোককে চটাইলে ধন প্রাণ নিরাপদ নয়। হায়, কি ঝকমারি করিয়াই আজ রাতে তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন।

এই আক্ষেপটার সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হইল, অন্তঃপুরে আর একটা হতভাগিনী পাওনাদার অপেক্ষা করিতেছে! মহাদেববাবুর বিষাক্ত মেজাজ আরও বিষাইয়া

উঠিতেছিল—কিন্তু তখনই কি একটা কথা মনে পড়ায় তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। খানিকটা ভাবিয়া মনে মনে একটা মৎলব আটিলেন। তারপর মাথা দোলাইয়া নিজমনে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত বলিলেন, "হুঁ, শাণিত ছুরি নিয়ে যে দাবী করতে এসেছিল তাকে ঠেকাতে পারিনি—সে লোকসান এবার সুদ সমেত উসুল করা যাক! নিরুপায় হয়ে চোখের জল নিয়ে যে দাবী করতে আসে, তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানই বুদ্ধিমানের কায!"

ভীষণ গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া তিনি বাহিরের অফিসঘরে বসিলেন। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "খিদিরপুর থেকে যারা এসেছে, তাদের এইখানে ডাক।"

মিনিট পাঁচেক পরে শঙ্কিত অনিলের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকিলেন। বৃদ্ধা অস্থিচর্ম্মসার। শোক, দুঃখ, দৈন্য, মনস্তাপ, একসঙ্গে মিশিয়া যেন সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া এই অভাগিনী বৃদ্ধার আপাদমস্তকে দেদীপ্যমান।

মহাদেববাবু উঠিয়া কষ্টেসৃষ্টে কোন গতিকে একটা প্রণাম করিলেন। শীতার্ত্ত বৃদ্ধা দৌর্ব্বল্য কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুয়ারের কাছে জড়সড় হইয়া বসিলেন। অনিল শুষ্ক মুখে তাঁহার পাশে বসিল। মহাদেববাবু গম্ভীরভাবে নিজের আসনে বসিয়া চুরুট ধবাইলেন।

বৃদ্ধা কিছু বলিবার আগেই মহাদেববাবু চুরুটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন, "আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি অনেকক্ষণ। তাড়াতাড়ি এক জায়গায় বেরুতে হয়েছিল বলে দেখা করতে পারিনি। যে দুঃসময় যাচ্ছে আমার, তা আর কহতব্য নয়। এখুনি গুণ্ডার ছুরিতে—"

কথাটা বলিযাই সহসা বসনা সম্বরণ করিয়া তিনি ঘাড উঠাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। কড়া সুরে বলিলেন—"এই বারেণ্ডায় কে রয়েছে?"

নীলু চাকব দুয়ারের সামনে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি। তামাক দেব?"

মহাদেববাবু বলিলেন, "এখানে নয়। ওপরে সেজে রেখে এস। আর শোন, সবাইকে বারণ করে দাও, এদিকে এখন যেন কেউ না আসে, বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে" বলিযা নীলু প্রস্থান কবিল।

মহাদেববাবু বলিলেন, "অনিল, দ্যাখো ত ভাই, বারেণ্ডায় কেউ আছে?"

অনিল সন্ত্রস্তভাবে বারেণ্ডায় গিয়া চারিদিক দেখিয়া আসিয়া জানাইল, কেহ নাই।

মহাদেববাবু তখন নিম্নকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,"বাড়ীতে কাউকে বলবেন না যেন, বাইরেও যেন কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনার চিঠি পেয়েই সেই থেকে আমি টাকা যোগাড় কববাব চেষ্টায় দিনরাত ঘুরছি। আজ অনেক কষ্টে এত রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে একজনের কাছে দু হাজার টাকা ধার পেলাম। রামবাগান ছাড়িয়ে মোটর একটা গলির কাছে দাঁড় করিয়ে আমার শোফার পেট্রোল কিনতে একটা দোকানে গেছে, হঠাৎ পাঁচজন গুণ্ডা এসে আমার উপর পড়ল। এই ছোরা মারে ত এই ছোরা মারে!— নেহাৎ পিতৃপুণ্যের জোরে প্রাণটা বেঁচে গেছে। শেষে দু হাজারকে দু হাজার টাকা নিয়ে ব্যাটারা দৌড় দিলে।"

সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা হতভম্ব! অনিল উত্তেজনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তারপর? তারা ধরা পড়েছে?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "কে ধর্‌বে তাদের? তাদের হাতে এক এক ছোরা। পুলিস তাদের দেখে সরে পড়ে, অন্যে এগুবে কি?"

আজ তিন বৎসর এই বৃদ্ধা ক্রমাগত তাঁহার বাড়ীতে হাঁটাহাটি ও কান্নাকাটি করিতেছেন। বৃদ্ধার নাবালক পুত্রদুইটীর পড়াশুনা এবং সংসার নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিবার চুক্তিতে মহাদেববাবু বৃদ্ধা পিসির কাছে বিনা খতে দশ হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি আর এক পয়সাও দেন নাই, পর দৈন্য-পীড়িতা আত্মীয়ের আকুল অশ্রুজল গৃহিণীর অনুনয় ও ধর্ম্মভয় প্রভৃতি নানা কারণে উত্ত্যক্ত হইয়া মহাদেববাবু এক সময় হাজার দুই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠপুত্র মিহির কালাজ্বরে শয্যাশায়ী, ছেলেটীর চিকিৎসা খরচ করাইবার সামর্থ্য বৃদ্ধার নাই। প্রাণের দায়ে ব্যাকুল বৃদ্ধা শেষ আশায় নির্ভর করিয়া মহাদেববাবুর দ্বারে উপর্য্যুপরি আবেদন পাঠাইয়া শেষে নিজে আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই দারুণ শীতের রাত্রে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে সঙ্গে করিয়া শীতার্ত্ত বৃদ্ধা সন্ধ্যা হইতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত বড়লোক ভাইপোর দুয়ারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকিয়া এতক্ষণে যদি বা সাক্ষাতের অনুমতি পাইলেন, তবে সংবাদ যা পাইলেন—তা অতি শুভ!

বৃদ্ধা স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বড়লোক ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রয়োজনের সময় আত্মীয়ের উপকার করিবার ইচ্ছাতেই বড় বিশ্বাস করিয়া তিনি নাবালক পুত্রদুটির গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল, দশ হাজার টাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। টাকাগুলি লইবার সময় শিক্ষিত সম্মানী উপার্জ্জনশীল ভ্রাতুষ্পুত্র কত প্রত্যুপকারের আশা দিয়া কত কৌশলময় বাক্য-বিন্যাসে বৃদ্ধার হাতে চাঁদ ধরিয়া দিযাছিলেন। তারপর সে চাঁদের মহিমায় আজ তিন বৎসর বৃদ্ধার নাবালক পুত্রদুটি অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুরন্ত রোগে শয্যাশায়ী হইয়া এক ফোঁটা ঔষধ পাইতেছে না, উপযুক্ত পথ্যের ত কথাই নাই। এদিকে এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে এটর্ণিবাবুর দুখানা তেতালা বাড়ী উঠিয়াছে, মূল্যবান মোটরগাড়ী হইয়াছে, উৎকৃষ্ট আসবাবপত্রে, উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতিতে ঘরদ্বার হাস্যময় হইয়াছে। কোন যাদুমন্ত্রের বলে এসব হইয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হইয়াছে সুনিশ্চিত। সকল দিকের বড়মানুষী কায়দা বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহে তিনি সক্ষম। তাঁহার যত কিছু অক্ষমতা শুধু দরিদ্র বিধবা ও নাবালক পাওনাদারদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরাইয়া দিবার সময়!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মর্ম্মভেদী ক্লেশের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হলে কি হবে বাবা? ছেলেদের ভিটেমাটী বিক্রী করে, সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে তোমার হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলাম। তারপর আমার কপালদোষে, এখন তুমি দয়া না করলে—"

মহাদেববাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না থাকলে কোত্থেকে দেব?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নেই বলো না বাবা! তোমার যা বাড়ী, গাড়ী—"

বাধা দিয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "সব দেনার ওপর! সব দেনার ওপর! বল্লে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাস্তবিক বল্‌ছি, বাজারে একটু সুনাম আছে, ব্যবসার খাতিরে তাই ধার পাচ্ছি, তাই এসব করেছি।— এসব ঠাঁট বজায় না রাখলে যে আমার ব্যবসা চলবে না তা ত বোঝেন?"

ক্ষোভে দুঃখে নৈরাশ্যে বালক অনিল অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিশ্বাসঘাতক নরপশুর হাতে বড় বিশ্বাসে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া বিধবা দরিদ্রা মাতা আজ কতদূর সাংঘাতিক অর্থক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তার প্রতিদিনের প্রতি অভাব, অনটন মনস্তাপ অশ্রুজলের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বালক "মোরিয়া" হইয়া বলিল, "বেশ, তাহলে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। দেনার ওপর যদি এত বাড়ী গাড়ী ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান টেলিফোঁ করতে পেরেছেন, তাহলে আরও কিছু দেনা করে গরীবদের দুঃসময়ে সাহায্য করুন দাদা!"

মহাদেববাবু সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তাই ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমাদের যে কপাল মন্দ— এই ত তোমাদেরই দুই হাজার টাকা হাতের ওপর থেকে গেল! লোকে জেনেছে, এখন আমার অনেক ধার হয়ে পড়েছে। তাই আর সহজে কেউ ধার দিতে চাচ্ছে না যে!"

অনিল বুঝিল ইহার উপর বাক্যব্যয় করা মূঢ়তা!

মহাদেববাবু উঠিয়া বলিলেন, "আমি আর বসতে পারছিনে, এবার শুতে যাই। আপনারা যদি বাড়ী যান তো এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন! দরোয়ান আর দেউড়ী খুলে রাখতে পারবে না।"

মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা কিছু দাও, আমার মিহিরের যে পথ্যি কিছুই হচ্ছে না।"

বিরক্ত হইয়া মহাদেববাবু বলিলেন, "সেই এক কথা তবু! আপনাকে দেখছি বুঝিয়েও বোঝান যাবে না। টাকা যোগাড় করলাম কিন্তু ভোগে লাগল না, আমি আর কি করি? নিজে যে মরতে মরতে বেঁচে গেছি, এই যথেষ্ট।"

নিরুপায় বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা স্বরূপ এই উপাদেয় গল্পটি শুনাইয়া মহাদেববাবু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "এই নীলে, দরোয়ানকে বল্, এঁরা এখুনি যাচ্ছেন। তারপর যেন দেউড়ী বন্ধ করে।"

অনিল উঠিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "একটা গাড়ী নিয়ে আসি মা—"

মা কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "গাড়ীভাড়ার টাকা কৈ বাবা? ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে চারটি টাকা ধার পেয়েছিলাম, আসতে গাড়ী ভাড়া তিন টাকা আট আনা গেছে। মোটে আট গণ্ডা পয়সা আছে। এটা থাক, কাল সকালে তোমাদের বাজার খরচ হবে।"

উদ্বিগ্ন ভীত বালক বলিল, "তা হলে কি করে যাবে মা?"

"হেঁটেই যাব বাবা, চল। দরোয়ান এখনি আবার দেউড়ী বন্ধ করবে। শীগ্‌গির চল।"

মহাদেববাবু কথাগুলা শুনিয়াও শুনিলেন না। নিজের মনে উপরে উঠিয়া গেলেন। বুদ্ধি থাকিলে তিনশো টাকার লোকসানকে সদ্ব্যবহার করিয়া, দু হাজারের পাওনাদারকে কেমন কেমন স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করান যায় সে হিসাব আলোচনা করিতে করিতে তিনি নিজের কৃতিত্বে বিশেষ গর্ব্ববোধ করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের সানন্দ লম্ফের মাঝে সাহ্লাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল—গুণ্ডামি ও ভণ্ডামির জয় জয়কার! হয় গায়ের জোরে কাড়িয়া লওয়া, নয় বুদ্ধির জোরে ঠকাইয়া লওয়াই ত এ সংসারে—মানুষের কায!

এটর্ণি মহাশয় দোতলার উষ্ণ গৃহে আরামদায়ক শয্যায় শুইয়া যখন নিজের মন

বুদ্ধির সঙ্গে এমনি প্রীতিকর আস্ফালনে রত, তখন ফুটপাথে রাতদুপুরের প্রচণ্ড শীত-কুহেলিকার মাঝখান দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্ন পদে চলিয়াছিল—একটি ক্ষুধার্ত্ত বালক ও একটি সর্ব্বস্বান্তা, নৈরাশ্য-কাতরা বৃদ্ধা! উভয়ের নিরুপায় অশ্রু নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় চোখের ভিতর জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সেই জমাট যন্ত্রণাস্তূপের অস্তিত্ব এ পৃথিবীর স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক হৃদয়হীনরা, ভণ্ডেরা হয়ত, গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে না, কিন্তু অলক্ষ্যে কোনও সংহার দেবতার কোনও রুদ্র অভিযান সেইখান হইতে সুরু হইবে কি না কে জানে। প্রতারিতা সর্ব্বস্বান্তা অভাগিনীর তপ্ত মর্ম্মব্যথা মাখা অসহায় অশ্রু—ভণ্ড-ভদ্রতার মুখোস পরা, পরস্বাপহারী দস্যুর দরবারে উপেক্ষিত হইলেও সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়বিচারালয় সে উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিশোধ দানে নিরস্ত থাকিবে কি না, সে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর বোধ হয় ভবিষ্যৎ একদিন প্রত্যক্ষ দৃশ্যে দেখাইবে। আপাততঃ প্রতাপশীল ভণ্ডের প্রতাপে মুগ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ নির্ব্বিচারে ভাবিয়া লউক—এ পৃথিবীতে সার্থক শুধু ভণ্ডের ভণ্ডামি, এবং দৈত্যের গুণ্ডামি!

মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩১

শিশুর স্মৃতি

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলাম,—যাক, আজকের ফাঁড়া উৎরাইল্। ডাক্তারের ছুরি-কাটারীর হাত হইতে আজ বাচিয়াছি বলিয়া বোধ হয়!

সামনের খোলা জানালা দিয়া মৃদু বাতাস আসিতেছিল। রোগশয্যায় পড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে অতি-সাবধানে এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম। ডানহাতখানাকে ছুঁইতেও ভয় হইতেছিল।— ক্ষত যন্ত্রণার্ত্ত হাতখানা একটু সামান্য স্পর্শ— সামান্য নড়াচড়ার ভরও সহ্য করিতে পারিতেছে না। ডানহাতের একটা আঙুলহারা হইয়াছে, কিন্তু হায়! সমস্ত ডান-অঙ্গটাই তার টাড়সে জখম হইয়া রহিয়াছে! অসাবধানে টুক করিয়া কোথাও একটু লাগিলে, অমনি মগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বজ্র ঝঞ্জনা জাগিয়া উঠে! তীব্র যন্ত্রণায় আপাদমস্তকে কালঘাম ছুটে। উঃ! দেহের সামান্য একটা অংশ, সেও সমস্ত দেহটাকে এতদূর কাবু করিবার শক্তি রাখে? কোথায় আঙুলের ডগে একটা সামান্য বিস্ফোটক জাগিল,—গ্রাহ্য করিলাম না। অথচ সেই অগ্রাহ্যের বস্তুটা শেষে এমন দুষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিল যে সমস্ত দেহটাকে নিষ্ঠুর শাসন-কর্ত্তৃত্বে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। অহোরাত্র যন্ত্রণা ভুগিয়া ভুগিয়া মনে হইতেছে এ হাতটা যে কস্মিন্‌কালেও সুস্থ কর্ম্মঠ ছিল, এ-কথা বিশ্বাস করা, আমার পক্ষে আজ সম্ভব নয়! হায়রে দুষ্ট-ব্রণ!

বাইরে ঘড় ঘড় করিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি বারেণ্ডা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"মা, ডাক্তার-মা এসেছে।"

কপাল ঘামিয়া উঠিল। হায়! সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও বন্ধুটি আজ নিষ্কৃতি দিলেন না! সেই ঘা ধোয়া, সেই পচা মাংস টানা! উঃ! ডাক্তারদের প্রোভ চিম্‌টা ছুরি কাঁচিগুলা অধঃপাতে যায় না গা! ওগুলা যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁর পায়ে প্রণাম করিতে আমার মোটেই ইচ্ছা হয় না, বরং হাতের কাছে সেই পা দু'খানা পাইলে মনের সুখে দু চারটা কিল বসাইয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতে ইচ্ছা হয় যে! ওগুলা বাহির করিবার কি দরকার ছিল বাপু? কেবল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাইবাব দুরভিসন্ধি বই ত নয়।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া মিস মিত্র বলিলেন—"আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে মিসেস অগস্তি। কেমন আছেন বলুন?"

প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আর কেমন আছি! বলি আপনার সেই বাজীকরের ঝুলিটা আজ আনেননি ত?"

"অস্ত্রের ব্যাগ? দুর্গা বলুন। ও জিনিস কি ভুলতে পারি? দেরী হল কেন জানেন? এক মহিলা বন্ধু নতুন ফটোগ্রাফী শিখে এসেছেন। আজ বিনা খবরে হঠাৎ আমার স্কন্ধে গিয়ে এমন ভর করেছিলেন—বলবার নয়। বিকেলের আলো নিভতে তবে ছুটি দিলেন! দেখুন না, আপনাদের দেশের হিন্দুস্থানী মেয়ে সাজিয়ে আমার ছবি তুললেন! আজ আমি ঠিক হিন্দুস্থানী হয়ে গেছি, না?" তিনি হাসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

সবিস্ময়ে তাঁহার সাজসজ্জার দিকে চাহিলাম। তাই ত বটে! নিজের দুঃখের তাড়ায় বন্ধুটিব বেশবিন্যাসের দিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই,—এ যে সত্যই পশ্চিমা বেশ! সুন্দর সুগঠিত তরুণ মূর্ত্তিতে সে বেশ সত্যই সুন্দর নূতনত্ব ব্যঞ্জক। মুগ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "বাঃ! চমৎকার যে।"

হা হা করিয়া প্রাণ খোলা উচ্চ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার চোখেও চমৎকার। তা হোক, আমি কিন্তু নিজের বেশ দেখে, খুশী হয়ে নিজের জন্য একটা টাইটেল বেছে নিয়েছি,—সেটার মায়া ছাড়তে পারি না। এ চেহারায় যখন হিন্দুস্থানী বেশ, তখন সেই টাইটেলই ঠিক মানানসই হবে।"

"কি টাইটেল?"

"কিষ্কিন্ধ্যা ফেরৎ! ঠিক নয়?"

হাসিলাম। ভর্ৎসনার স্বরে বলিলাম—"আপনার রসজ্ঞান কিছুমাত্তর নেই। কোত্থেকেই বা থাকবে? অত করে ছুরি কাটারী নিয়ে যুদ্ধ করে বেড়ালে মানুষের ভেতর পদার্থ বলে কিছু থাকে? আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলবে,—আপনাকে ঠিক সরস্বতী ঠাকরুণটির মত দেখাচ্ছে! কিষ্কিন্ধ্যায় সরস্বতী মেলে?"

"ও জিনিস সেখানে অপ্রতুল থাকতে পাবে কিন্তু যে জিনিস সেখানে পাওয়া গেছে, তা যে পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়! ঠাট্টা নয়, সত্যিই বন্ধু, মহাবীর হনুমানের চরিত্রাদর্শে আমাদের জীবন-সাধনাটা আমরা যদি সার্থক করতে পারি।" সহসা বন্ধু গম্ভীর হইয়া একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

"হনুমান!" সবিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। কথাটা সহজভাবে বলিলে পরিহাসই মনে করিতাম, কিন্তু এ ত পরিহাস নয়। এ যে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রদ্ধার বাণী। আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সংশয়ের স্বরে বলিলাম,

"হনুমানের চরিত্রাদর্শ মানুষকে গ্রহণ করতে হবে? কারণ?"

গভীর আবেগের সহিত উত্তর হইল—"কারণ, মানুষ তাহলে জীবনে 'সত্যিকার' মানুষ হয়ে উঠতে পারে। বিবেকানন্দের কাছে কথাটা শুনলুম যখন,— প্রথম, সেদিন মনে বড্ড ধাক্কা লাগল। কিন্তু কথাটা যতই ভাবতে লাগলুম, ততই মনের সমস্ত সংস্কার ওলট্-পালট্ হতে লাগল। সত্যিই বন্ধু, সত্যিই,— এমন মহা-জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান, মহা শক্তিশালী কর্ম্মবীরের চরিত্রাদর্শ—এর যোড়া খুঁজে মেলা দায়! প্রভুর কাযের জন্য নিজের জীবন মরণের তোয়াক্কা রাখে না, এমন কায সে করেছে! তাই, যে সাগর পার হবার জন্যে প্রভুকে গলদঘর্ম্ম হয়ে কাঠ পাথর যোগাড় করে সেতু বাঁধতে হল, সেই সাগর হনুমান পার হয়ে গেলেন একটি লাফে! মায়াবী দানবের হাতে পড়ে প্রভুর প্রাণ আর স্বাধীনতা এমন বিপন্ন হল যে, নিজেকে উদ্ধার করবার এতটুকু শক্তিও প্রভুর রইল না,— কিন্তু শক্তিশালী সেবক এমন কর্ম্মবীর যে,— বে-ওজর পাতাল ফুঁড়ে গিয়ে এক চোটে দানবের মুণ্ডু উড়িয়ে প্রভুকে উদ্ধার করে আনলে। অহিরাবণের গর্ভধারিণীকেও সে রেয়াৎ করে বলেনি প্রভুর কাযের জন্যে, তার নিজের চক্ষুলজ্জা বলতে এতটুকু জিনিস ত নেই। সে সটান কাজ করে চলেছে ত চলেছেই!—তার ল্যাজেই আগুণ ধরাও আর মুখটাই পুড়িয়ে দাও, দৃকপাত নেই! প্রভুর কায সে করে চলবেই ঠিক। বন্ধু, এ আদর্শকে প্রাণ দিয়ে পুজো করবে— এমন মহা নির্ভীক, আত্মশক্তি-হীন, মহাশক্তিশালী মানুষ কই?"

অবাক হইয়া শুনিলাম। কোন যুগে রামায়ণ পড়িয়াছি, মনেও পড়ে না। তবে খুব অল্প বয়সেই সেটা পড়িয়াছিলাম। সে সময় হনুমানকে বিদূষক-চরিত্র হিসাবেই বিচার করিয়াছি, বুদ্ধিমান হিসাবে নয়। সে হাসাইতে পারে, সেইজন্যই লঙ্কা পোড়াইয়া লোক হাসাইয়াছে, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসরাজের অন্যায় আদেশ পালনে উদ্যত সূর্য্যকে বগল-দাবায় পুরিয়া জব্দ করিয়াছে, অনেক রকম হাস্যোদ্দীপক কীর্ত্তি করিয়াছে,— এইগুলাই মনে আছে। হনুমানের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে নাই, বরং নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচয় পাইয়াছি,— সেই সীতাদেবীর দুর্ল্লভ স্নেহের দান, পুরস্কারের মুক্তার মালাটির দুর্গতি সংবাদ! লক্ষ্মণ ঠাকুরের কথায় সায় দিয়া আমিও সেজন্য মনে মনে হনুমানকে ঢের তিরস্কার করিয়াছি। বাঁদর না হইলে এমন মহামূল্য বস্তু দাঁতে চিবায় কি? হনুমানটার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ বোধ করিয়াছি। কিন্তু তার সাধারণ বুদ্ধি, শক্তি, বা পূজাই জিতেন্দ্রিয়তার কথা কোনদিন ভাবি নাই ত!

২

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "সত্যি, অন্ততঃ হনুমান চরিত্রের জিতেন্দ্রিয়তার দিকটা ভাববার আর শেখবার বিষয়!"

হঠাৎ তিনি দৃপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "বিশেষ করে—এই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার গোলাম দেশটার! আমি বাজী রেখে বলছি, পঁয়তাল্লিশ বছরে এ দেশের চেহারা ফিরে যায়, যদি ঐ মহাপাপকে ঝাঁটা মেরে দেশ থেকে দূর করতে পারেন! বন্ধু,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সব জোয়ানই হাজির ছিলেন।—কিন্তু বজ্র তৈরী করবার সময়

কারুর হাড় কাজে লাগল না কেন? কেন দরকার পড়ল সেই অনাহার শীর্ণ জিতেন্দ্রিয় দধিচি তপস্বীর হাড়? ফাঁকির যো-টি কোথাও নেই! ইন্দ্রের ঢের অস্তর-সস্তর ছিল কিন্তু কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করতে সেই তপস্যামগ্ন জিতেন্দ্রিয় বীরের হাড়খানিই ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর কিছুতেই কিছু হল না। এর অর্থ কি?"

আমি অবাক!—থামিয়া বলিলাম, "কিচ্ছু জানি না।"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা হিন্দুয়ানীর বড়াই ত করেন খুব,—আপনাদের বড়াইয়ের চোটে,—বাপ! আমি হাড়ে-নাড়ে জ্বালাতন হয়ে উঠেছি! কিন্তু আপনাদের সত্যিকার শাস্ত্র যা, সত্যিকার ধর্ম্ম যা,— তার মানে যে আপনারা কি বোঝেন, — আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর! ভাব্‌লে সত্যি বল্‌ছি, ঠাট্টা নয়—আমার কান্না পায়।" ম্লান হাস্যে বলিলাম, "নিষ্ফল ক্রন্দনে কিছু হয় না মিস মিত্র। কিছু হয় যাতে, —সেটার নাম 'কায'! ভগবান আপনাকে উচ্চকর্ম্মে অধিকার দিয়েছেন, আপনার হাত তৈরী হয়ে আছে,— দেশের জঞ্জাল, মানুষের মনুষ্যত্বনাশী পাপ, ঝেঁটিয়ে সাফ করুন দিদি।"

হাসিয়া তিনি বলিলেন, "বিস্তর জঞ্জাল! বিস্তর ঝাটাই চাই যে! আর স্ক্যাভেঞ্জারও দশ-বিশখানায় শান্‌বে না। দশ-বিশ হাজার চাই। কি করছেন পড়ে পড়ে? উঠ্‌ন না! আপনারা ঐ যে এলিয়ে পড়ে আছেন— আপনারা ওতেই দেশটির মাথা খেলেন।"

ঘোরতর প্রতিবাদের সুরে বলিলাম, "আমরা? অন্যায় বলছেন। আমাদেব সে হাত আছে কি, বলুন? প্রত্যেক নিঃশ্বাসটা পরের হুকুম নিয়ে টানতে ফেলতে পারলেই আমাদের পক্ষে ভাল হয়,—ওপরওলাদের ফুরসুতের অভাব বলেই সেটা হয়ে ওঠে না, নইলে তাও হত। পাড়াগাঁয়ে জমিদার বাড়ী, অর্থাৎ অন্নচেষ্টায়, পুরুষদের যেখানে বাইরে বেরুতে হয় না, সেখানে দেখবেন হয়ত তাও হচ্ছে। সেখানে মেয়েদের জীবন-মরণ প্রভুদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করছে, এমন মর্জ্জি—যে খুশী হলেই বিনা বাধায় মুণ্ডপাত হচ্ছে দেখবেন।"—

"দেখবেন বলছেন কি? ঢের দেখেছি! আঁতুরঘর থেকে সুরু করে মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত যাদের চলবার পথ, তাদের চোখে এড়ায় না কিছুই! চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেক সময় চেপে যেতে হয়।— কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়াসক্তির অত্যাচারে মানুষকে যখন ধবংস মুখে পড়তে দেখি, তখন নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব মর্য্যাদা, আমার খেয়াল থাকে না! বিনা দ্বিধায়—দ্বিধার শাণিত অসির মতই, অনাচার পাপের বুকটায় লাফিয়ে পড়ে ভীষণ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়।"—একটু থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সাধে 'কিষ্কিন্ধ্যার ফেরৎ' উপাধিটা পছন্দ করছি? ইচ্ছে হচ্ছে হনুমানের মত বাঁদর হয়েই প্রভুর কাজ করি! মানুষের অভিমান আর রাখব না! ওতে প্রভুর কাজে বাধা পড়ছে।"

হাতের যন্ত্রণা ভুলিলাম। সোৎসাহে উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইলাম, মুহূর্ত্তে ক্ষতমুখে আঘাত বাজিল। মাথা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল, চোখে আঁধার দেখিলাম। হাতে মাথা ধরিয়া নিঃশব্দে যন্ত্রণাটুকু পরিপাক করিয়া—ক্লিষ্ট হাস্যে বলিলাম, "মনে করি উঠে কাজ করি,

কিন্তু উঠতেই পারি না, তা কাজ করব কি? আমি ত রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যেতে চাই, কিন্তু ওরা আমায় ভোলে কই? একটু নড়েছি, কি ধাঁক করে মাথায় ঘা-টি লেগেছে, বলে কথা! এসব শরীর নিয়ে কাজের চেষ্টা দেখা চুলোয় যাক, বাঁচতেই ইচ্ছে করে না যে!—"

গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন, "সেজন্যেই মরণটা এ দেশে এত সস্তা হয়ে উঠেছে। আমাদের শরীর মন আর বুদ্ধিতে এত ব্যামো জমা হয়েছে, যে ডাক্তার 'ন্যাশের' মত আমারও বলতে ইচ্ছে হয়— এ ব্যামোর চিকিৎসা আমাদের ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমাদের আমল থেকে সুরু হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আজ বোধহয় আমরা বেঁচে ওঠবার পথ পেয়ে বাঁচতুম। উঠুন, গরম জল এসেছে। ঘা-টা ধোয়া যাক।"

দেখিলাম সত্যই ঝি গরম জলের পাত্র লইয়া উপস্থিত! সভয়ে বলিলাম, "আজও পচা মাংস ধরে টানা-ছেঁড়া করবেন? ওগুলো আজ থাকতে দিন না।"

করুণ মমতাভরা কণ্ঠে উত্তর হইল, "থাকতে দেবার যো নেই যে মিসেস অগস্তি। না হলে আমরা কি সাধ করে রুগ্ন দুর্ব্বলদের কষ্ট দিই? ওই পচা slough গুলি,— ওগুলি নির্ম্মমভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন, বিষাক্ত ক্ষতগ্রস্ত মানুষের সুস্থ হবার আশা নেই।"

"কিন্তু যন্ত্রণায় যে মরে যাই!"

"বেঁচে ওঠবাব জন্যে এ 'মরাটুকু' সহ্য করতেই হবে। মাপ করুন। আসুন।"

৩

ঘা ধোয়া শেষ হইল। যন্ত্রণায় শ্রান্তক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। বাহিরে হঠাৎ সেই সময় ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি সুরু হইল। গুমট কাটিয়া স্নিগ্ধ-শীতলতায় চারিদিক ভরিয়া গেল।

হাত মুছিতে মুছিতে মিস মিত্র ঘরে ঢুকিলেন, নিজের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে বাঁ হাতের তালুতে কি একটা জিনিস চাপিয়া বসাইবার চেষ্টায় আলোর দিকে দু'হাত উঠাইলেন। প্রত্যহই দেখি—ব্যাগ হইতে অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিবার সময় হইতে তিনি ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন, সে গাম্ভীর্য্যটা কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অটল কঠিনতায় স্থায়ী থাকে। ঘরে ঢুকিবার সময় এবং ঘর হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রসন্ন-সুন্দর মূর্ত্তি দেখি,—কাজের সময় সে মূর্ত্তি অস্বাভাবিক ভীষণ হইয়া উঠে। যন্ত্রণার চোটে অধীর হইয়া যতই নড়াচড়া করি, যতই চেঁচামেচি করি—কিন্তু বন্ধুটির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িলে ভয়ে আত্মা জড়সড় হইয়া উঠে! উঃ, কি ভয়াবহ গম্ভীর সে মুখ। ভ্রূকুটীবদ্ধ ললাটে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষতের দিকে চাহিয়া তিনি যখন ক্ষত পরিষ্কার করিতে থাকেন, —মনে হয় 'থাক', আধঘণ্টার জন্য দেহটা ওঁর হাতেই ছাড়িয়া দিয়া, আকাশ ভ্রমণে চম্পট দিই। ক্ষতের ক্লেদ গ্লানিগুলা পরিষ্কার হইলে, তারপর না হয়, দেহ গ্রহণ করিয়া রামরাজত্ব ভোগ করিব!

বাহিরে বৃষ্টিটা উত্তরোত্তর জোরে চাপিয়া আসিল। ক্লান্তি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "তাই ত মিস মিত্র, আপনি আটকে পড়লেন যে! আর কোথাও 'কল' আছে আজ?"

তিনি হাত টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"না। তাহলে এ বেশে বেরুই? শুধু এখানেই কায ছিল।"

বলিলাম—"বেশ। ভালই হয়েছে, গল্প সুরু করুন তাহলে। ও কি করছেন? গাঁজা টিপছেন না কি?"

স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর হইল, "আপনার প্রসাদ—এমন ঝাঁকানি দিয়েছেন, হাতটি চিমটে বেঁধা হয়ে গেছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সত্যি? কই দেখিনি ত!"

ঝি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় বাতাস করিতেছিল। হঠাৎ বলিল, "যা তুমি আঁকুলি-বিকুলি কর মা, দেখবে কোত্থেকে? এমন দমকা ঝাঁকানি দিলে যে ডাক্তার-মার হাতটা প্যাট করে বিঁধে গেল, ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগলে! আমি 'আহা, আহা' করে উঠলুম, তুমি শুনতে পেলে না?"

"সেও ওঁর হাতের জন্যে? আমি বলি আমার হাতের রক্তের জন্যে। কই ইনি ত কিছু বলেননি!"

ঈষৎ হাসিয়া মিস মিত্র বলিলেন— "কি বলব? সে সময় কি বলা-কওয়ার কথা ছিল? যাকগে, ও রক্ত এখুনি বন্ধ হবে। ওরকম কত কেটে ছিঁড়ে যায়। একবার একটা কার্ব্বাঙ্কল কাটতে গিয়ে যা ছুরির প্যাচ লাগিয়েছিলুম হাতে,—সেবার প্রাণটি যায় যায় হয়েছিল! এমন সেপটিক হয়ে জ্বর ধরল, দুটি মাস বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। এ ত সামান্য ওষুধ ঢেলে দিয়েই পুড়িয়ে দিন দুচ্চার ঘা শুকুতে লাগবে।"

"কি বিপজ্জনক কাজ! কেন এমন বিদ্যে শিখেছিলেন? কি!— প্রাণটি সদাই হাতে করে থাকতে হয় বলুন?"

"বড় বিপদের ধাক্কা খেয়েই বিপজ্জনক বিদ্যে শিখতে হয়েছিল মিসেস অগস্তি। বিপদকে ভয় করে চলতে গিয়ে জীবনে বড্ড শোকেব ঘা পেয়েছি। তাই বিপদকে জয় করবার সাধনায় জীবনটি উৎসর্গ করে ছেড়েছি।"

পচা মাংস ছিঁড়িবার কথা মনে জাগিতেছিল, তাঁহাব কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অন্ধ জেদের সহিত বলিয়া উঠিলাম, "তা হোক, এ বড় বিশ্রী কাজ। কোন ভাল লোকেরই এসব কাজ করা উচিত নয়।"

হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা না-হয় আপনার বিচারে মন্দ লোকই হলুম, উপায় নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই পৃথিবীসুদ্ধ লোক হাজার রকম ব্যাধি যন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে, এদের রোগ থেকে মুক্ত করবে কে? ভাল লোকের কাজ, মন্দ লোকের কাজ বলে সবাই যদি সব কাজ ছেড়ে ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে বসি, তাহলে মানুষগুলোকে —বেশী নয়, আপনার এই আঙুল হারাটাই ধরুন, সারবে কিসে?"

সপরিহাসেই বলিলাম, "আপনিই!—"

তিনি সহাস্যে বলিলেন, "তা বলবেন বৈ কি! দেশটাই যে blind fetish-দের দেশ! বাড়ীর ঝি ভ্রূণহত্যা করে রোগে জড়িয়ে পড়ল, বাড়ীর কর্ত্তা "ডাক" দিলেন। গরীব ঝি পয়সা দিতে পারবে না তাও জানালেন। গিন্নি ঠাকরুণ মিষ্টি করে, নিজেদের মায়া মমতা প্রবণতার সাফাই গাইলেনও ঢের। কিন্তু এমন জঘন্য কাণ্ডটা কেন অনুষ্ঠিত হল তার

কেবল সদুত্তর পেলুম না। শেষে রোগীর মুখে ব্যক্ত হল 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'! কর্ত্তাটি আমার বাবার বয়সী। মিষ্টি করেই বললুম—দু'কথা। জবাব শুনলুম—'কপাল!' আর ভ্রূণহত্যার ঔচিত্যের সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা শুনলুম, 'যারা এ জগতে মহাপাপ করে মরে, তাদের আত্মা ঐরকমেই ভ্রূণ অবস্থায় বারে বারে যাতায়াত করে সাজা পাবে না ত কি? এই উপায়েই ঐ হতভাগ্যদের উদ্ধার পথ। তিনি কিছু অন্যায় করেননি।' বললুম, 'আপনি যদি এত বড়ই ন্যায়পরায়ণ উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিদাতা হয়ে উঠে থাকেন, তাহলে আইনের বিচারে আপনার দেবত্বটা একবার যাচাই হওয়া দরকার। এই গরীব হতভাগা মেয়েকে অসৎপথে নামাবার, আর সেই ভগবানের জীবকে হত্যা করবার কি অধিকার আপনার ছিল, পুলিশের মারফৎ সে প্রশ্নটার জবাব নেওয়া উচিত। কেননা এসব উচ্চ তত্ত্ববিদ্যা আমার মাথায় ঢুকছে না, এগুলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।' কর্ত্তার এবং তাঁর পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীব চক্ষু তখন চড়কগাছ হয়ে গেল!"

সাগ্রহে বলিলাম, "তারপর?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাবপর আর শুনে কাজ নেই। তবে সত্যি কথা বললে শক্রতার উপদ্রব যে কিবকম ভোগ করতে হয়, সে যাত্রা হাড়ে হাডে টের পেয়েছিলুম। আমার যথেষ্ট লোকসান হল বটে, কিন্তু সেই হতভাগা ঝি-টার বেশ সদগতি করতে পেরেছিলুম, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।"

"আর কর্ত্তাটির?"

"সেটা বলব না, মাপ করুন।"

পরিহাসেব সুরে বলিলাম, "ঘুস নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ত?"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তাহলে আজ আপনার চিকিৎসার জন্য আসতুম না —মিসেস অগস্তি। ভণ্ডামি, মিথ্যে, আর পাপকে যদি পূজা করতে জানতুম। কিন্তু এ হাল্কা ধাতে গুরুতর পুণ্যটা—একদম অসহ্য, সত্যকে সম্মান করেছি বলে জীবনে বিস্তর ক্ষতি, আর অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। মানুষের সত্যকার মঙ্গলকে খুঁজি বলে মানুষের হাতে যে নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, বলবার নয়। শিক্ষিত বলুন, আব অশিক্ষিতই বলুন, ইৎরামো জিনিসটির ঢের রকম ছদ্মবেশই এ জীবনে দেখতে হল। আমার বড় দুঃখ হয় যে, মানুষগুলো শুধু নীচ স্বার্থকে অন্ধ আসক্তিতে আঁকড়ে ধরেই দিন কাটালে! উচ্চ স্বার্থকে চেয়েও দেখলে না। উচ্চ চিন্তাকে ভালবাসতেও শিখলে না!"

দুঃখের সহিত বলিলাম, "পৃথিবীর আবহাওয়ার গুণে মানুষের মনের উচ্চতা টিঁকতে পারে কই?"

দৃপ্তস্বরে উত্তর হইল, "পৃথিবীর আবহাওয়ার দোষ? দোহাই আপনাদের। পরের কাছে ধার করা বুলিগুলি অত নির্ভাবনায় কপচাবেন না।— আপনি যা বলছেন সেটা নিজের বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে, বুঝে বলুন। ন্যাকামির 'কপাল' আর ভণ্ডামির 'ভগবান' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। প্রতি বৎসর উপর্য্যুপরি প্রসবে, দুর্ব্বল প্রসূতির স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে গেছে। ছেলেগুলিও ছ'মাস দশমাস অন্তর টপাটপ মরছে। প্রসূতির সামনেই তাঁর পতিদেবতাকে ডাকিয়ে ভদ্র ভাষায় বুঝিয়ে বললুম, 'শিক্ষিত লোক আপনি। নিজের স্বার্থ বুঝে চলুন। সৎসন্তান যদি কামনা করেন, আর স্ত্রীটিকে

দগ্ধে মারবার মহাপ্রাণতা যদি না থাকে, তবে বছর তিনেকের জন্যে স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করুন।' সংবাদ শুনে দেবতা-বাবাজী স্বয়ং এবং তাঁর সাতগোষ্ঠীর সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরা সবাই 'শক' লেগে মূর্চ্ছা গেলেন! তিন বৎসরের স্ব-তন্দ্র বাস! বাবাজী অধীর চঞ্চল হয়ে বলে·উঠলেন, ওসব ইংরাজী মত, ইংরাজের দেশেই চলে। এ আধ্যাত্মিক দেশে চলতে পারে না। আমি ত মূর্খ নই।' বাবাজীর বাবা বাপধন,— তিনিও শিক্ষিত লোক। অর্থাৎ লোক ঠকিয়ে পয়সাকড়ি তিনি যথেষ্ট রকমই গুছিয়েছেন। তিনি চৈতন নেড়ে বললেন—'এই অল্প বয়স। এ সময় দুজনের সেপারেশনের ব্যবস্থা কর্‌লে দুজনের মনই ভিন্ন পথে টার্ণ নিতে পারে। সে কাজ কি করতে পারি? রামচন্দ্র!' ইচ্ছে হল, জবাব দিই, 'বাবা,

আজ মহেশের যদি ত্রিশূল হতাম আমি
তবে ইতর না মেরে, মারতুম ইৎরামি।'

সাগ্রহে বলিলাম, "তারপর, তারপর?"

"তাবপর আর কি, সত্যি কথা সাহস করে বলতে পারে, এমন লোকও এদেশে যেমনি কম—সেকথা কান পেতে শুনতে পারে, তেমন লোক এদেশে তার চাইতেও কম! সুতরাং যখন বলতে গেলুম, 'ইতর-ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার গোলামি ছাড়াও বড় কাজ, বড় উদ্দেশ্য মানুষের জীবনে আছে—সে কথাটি মনে করুন বাবাজী।' বাবাজী রুখে উঠে বললেন, 'আমাদেব ফ্যামিলী অ্যাফেয়ারে আপনাকে ইণ্টারফেয়ার করতে হবে না! কপালে থাকে, ছেলে হবে, মরে যাবে! মানুষ তা রদ করতে পারে? সে সব কপালের কাজ। ভগবানের ইচ্ছে'!"

"তারপর?"

"তারপর—সে ইতর পশুর সঙ্গে কি বাদানুবাদ করব? মূর্খতা ব্যাধিটি যে ওষুধ ভিন্ন শানে না, সে ওষুধের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট যদি একটা জেল তৈরী করে রাখতেন, তাহলে বাবাজীর কাছে বিদায় হয়ে সটান সেই পথে রওনা হতুম। মেয়েটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু সে পথ নেই। পরের বছর শুনলাম মেয়েটি পুনশ্চ প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে। এবার তারা কোন ডাক্তারের সাহায্য পর্য্যন্ত নেয়নি। বুঝলুম গলদ ধরা পড়বার ভয়েই সে সুবুদ্ধি!"

আমি নীরব। মনে ভাবিতে লাগিলাম, উক্ত বাবাজীটি তারপর নব-বিবাহ-মহোৎসবে মাতিয়াছিলেন নিশ্চয়ই, এবং এতদিনে আর একটি নরহত্যাব্রত নির্ব্বিবাদে পালন করিতেছেন বোধ হয়! এমন কত বাবাজী কত হত্যাব্রত পালন করিতেছেন, কে তার সংবাদ রাখে? দৈবাৎ দু একটা সংবাদ অতর্কিতে বাহির হয় বই ত নয়! হায় রে! যাহাদের গৃহ বিষাক্ত জঞ্জালে পূর্ণ, দেহ জঘন্য রোগের বীজাণুপূর্ণ, মন ইন্দ্রিয়ের দাস, বুদ্ধি নিস্পন্দ মূর্চ্ছিত, তাহারা এ জগতে "মানুষ" হইয়া দাঁড়াইবে? মানুষের মত কাজ করিবে?... কি জানি!

কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মিস্ মিত্র বলিলেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলেন আপনি? পৃথিবীর আবহাওয়ার দোষ? কিন্তু এই আবহাওয়ার মধ্যেই ত যিশু, মোহম্মদ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবীর বাস করে গেছেন, এখনও অনেকে বাস করছেন, তাঁদের দু'চারজন ত আমাদেরও

বিশেষ পরিচিত! কই তাঁদের উচ্চতাকে ত পৃথিবীর আবহাওয়া টলাতে পারে না!"

নীরব রহিলাম।

তিনি বলিলেন, "কি জানেন? মানসিক নীচতা ব্যাধিই মানুষের মাথাটি খেয়েছে। এত ছোট, এত নীচ এই দেশটার মন,— যে খালি নীচ-চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। বাল্য বিবাহ দেশের সর্ব্বনাশ করছে, সবাই বুঝছেন, কিন্তু কাযে সবাই ঠিক। যক্ষ্মার সঙ্গে হৃদ্‌রোগের বিয়ে, স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির বিয়ে,—এ চাই-ই চাই। সাত সকালেই চাই। দশ বছরের মেয়ে বিধবা হয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকে, তাতে কথা নেই। কিন্তু কুমারীদের বিয়ের বয়স বাড়াও বল্লেই অমনি সবাই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান! বিধবা ব্রহ্মচারিণী সমাজের স্বর্গের সিঁড়ি,—তা তিনি ব্রহ্মচর্য্যের মানে কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, —যত মূর্খতা, যত অন্যায়, যত পাপই তাঁর কাঁধে চেপে থাক না। তার সংস্কারের কিছু দরকার নেই। তিনি সমাজকে সটান স্বর্গের পথে নিয়ে যাবেন-ই। আর ওই কুমারী ব্রহ্মচারিণী? ওঁরা যত শিক্ষিতাই হোন, যত সৎকাযই করেন,—ওঁরা সমাজকে নরকে পাঠিয়েছেন বলে কথা!

"কি উচ্চ অন্তঃকরণ, আর কি উচ্চতম বিচারবুদ্ধি! গড় করতে ইচ্ছে হয়—এইসব মানুষের পায়ে! মিসেস অগস্তি, আপনার কি করতে ইচ্ছে হয় বলুন দেখি?" সভয়ে বলিলাম, "ও বাবা! আমার ইচ্ছে? যা সব চ্যাটালো কথার বাহার! ও শুনলেই আমার চোয়াল ধরে যায়, জিভ অসাড় হয়ে পড়ে। ইচ্ছে ব্যক্ত করব কি?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা আর একটু অল্প বয়সে শুভবিবাহ সুরু করুন, আর একটু কচি বয়স থেকে মা হতে সুরু করে দিন, তাহলেই—শুধু চোয়াল-ধরা কেন, আপাদমস্তকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ইহজন্মের মত ধরাশায়ী থাকবে। ঐ যে ফুলশয্যে বিছিয়ে শয়ন, ও শয়ন ছেড়ে আর মাথাটি তুলতে হবে না।" তিনি উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আমি নিরুত্তর রহিলাম।

ঘরের মধ্যে বারকতক চক্র দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। হাসিমুখে বলিলেন, "রাগ করছেন না কি মিসেস অগস্তি?"

হাসিলাম। বলিলাম, "করবারই কথা। বিবহিতদের সম্বন্ধে এসব সার্টিফিকেট মোটেই খুসী হয়ে উঠবার মত নয়।"

"ওই যাঃ! জলটা আবার চেপে এল! আচ্ছা, করুন আপনি রাগ। আমি বুক ঠুকে নির্ভয়ে গোটাকতক অপ্রিয় সত্য বলে যাই তাহলে। ওগো ঝি, মা-লক্ষ্মী, তোমাদের আস্তাকুঁড় ঝাঁটানো মুড়ো-গাছটা এনে রাখো ত তোমার মার হাতের কাছে।"

কাতর স্বরে বলিলাম, "দেখুন, মরছি একে নিজের জ্বালায়।— প্রাণটি হাত করে পড়ে আছি— আর অত ঠাট্টা করবেন না। একেই ত slough ধরে যা নির্দ্দয় টান দিয়েছেন..."

"বন্ধু slough ধরে ঐ নির্দ্দয় টান,—ওটি দেবার জন্যেই ভগবান আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধির ক্ষতিকারক সমস্ত ক্ষতের slough আমি পরিষ্কার করে চলবই। অন্ধ মমতা-দৌর্ব্বল্য বশে ভুল করে জীবনে একটিবার slough ছেড়ে দিয়েছিলুম, তাতে জোর হাতুড়ীর ঘা যা খেয়েছি বুকে, ইহজীবনে ভোলবার নয়! এর

পর আবার ভুল? না বন্ধু, মার্জ্জনা করুন। আপনাদের জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর বলে যাকে চিনব, তাকে যেন আমি ধ্বংস করতে না ভুলি!"

তিনি চেয়ারে বসিলেন, "নিয়তি বলতে একটা অদম্য শক্তি আছেই, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে, পুরুষকারকে অস্বীকার করা, সম্পূর্ণ ভ্রম। মিসেস অগস্তি, কেন ডাক্তারী শিখেছি জানতে চান? আমার জীবন কাহিনীটা শুনবেন আজ?"

"বলুন না। বড় বাধিত হব তাহলে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে, জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সময় আপনার কম বলে—"

"হ্যাঁ, সময় আমার বড্ড কম। এত কম যে, নিজেকে স্মরণ করবার অবকাশটাও পাইনে। নিজে মরে গেছি কি বেঁচে আছি, অনেক সময় সেটাও মনে থাকে না, অন্য কেউ মনে পড়িয়ে দিলে—তবে খেয়াল হয়।"

"হ্যাঁ, কি বলছিলুম? নিজের জীবন কাহিনীটা? ভাগলপুরে বাবা চাকরী কবতেন, সেইখানেই বাড়ী করেছিলেন। আমার এগার বছর বয়েসের সময় বাবা মারা যান। বাড়ীখানা বেচে আর বাবার লাইফ ইনশিওয়ের টাকা হাজার কতক জমা করে মা আমায় পাত্রস্থ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু উদ্যোগপর্ব্বের মাঝখানেই হঠাৎ মা মারা গেলেন।

"মনটা বৈরাগ্যে ভরে গেল। কি যে সে সময় মনে করতুম, ঠিক মনে পড়ে না। তবে, মৃত্যু যখন চুলের মুটো ধরে সদাই খাড়া হয়ে আছে,—তখন বিয়ে-থা, ঘর-সংসার যে কোন কাযেরই নয়, এটুকু খুব জোর করেই মনে পড়ত। তাছাড়া আমাদের স্কুলের মিশনরী মেমসাহেব যখন বিয়ে না করেও বুড়ো হতে পেরেছেন, তখন আমারই বা বিয়ে করবার কি দরকার— তার কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। হলুম বা আমি হিন্দুঘরের, তা হলেও প্রাণটা আমার 'ঘরের প্রাণ' নয়—'মানুষের প্রাণ' ত বটে!—

"আমার ভাই বোন কেউ ছিল না । মামার বাড়ীর আর বাপের বাড়ী কে কোথায় থাকতেন, কোন খবর জানতুম না। বাবার হিন্দু বন্ধু আর ব্রাহ্ম বন্ধুরা পরামর্শ করে, আমার আত্মীয়দের সন্ধান করতে লাগলেন। আমি মিশনরী মেমের জিম্মায় শিক্ষাব জন্যে গচ্ছিত হলুম।

"দেশ থেকে এক দূর সম্পর্কের কাকা এসে আমার এবং আমার সেই টাকাগুলোর অভিভাবক হবার জন্যে খুব হুকম দকম জুড়ে দিলেন। যে পাত্রটির সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তাঁর অভিভাবক ভাই খবর পেয়েই ছুটে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন,—টাকার অভিভাবক কাউকে হতে হবে না। তিনিই কৃপা করে সে কষ্ট স্বীকার করবেন। তাঁর আবদার রক্ষা না হলে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

"বাবার হিন্দু বন্ধুরা সন্ত্রস্ত-শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আর মিশনরী মেম আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আমি আর আমার টাকার অভিভাবকত্ব নিয়ে এই নীচাশয়দের নীচ কলহ কোলাহল দেখে আমার বৈরাগ্য-রঙিন মনটা বেজায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই টাকা-আনা-পাইয়ের লোভ-লালসা-বিক্ষত সংসারধর্ম্ম,—এটার ওপর আর কিছুমাত্র আস্থা রইল না। মিশনরী মেমের দ্বারা প্রচার করলুম— 'আমি বিয়ে করব না'।

"বাবার হিন্দু বন্ধুরা, কাকা, এবং বরের ভাই উদ্ধত উত্তেজিত হয়ে মেমকে অপমান করলেন। তাঁর নামে কদর্য্য কুৎসা রটনা করে রাশি রাশি বেনামী দরখাস্ত ঝাড়ালেন। আমি ঘাড় গুঁজে যে উপদ্রব এতদিন সহ্য করছিলুম, সে উপদ্রবের বিরুদ্ধে এবার ঘাড় তুলে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ালুম। গো ব্রাহ্মণ হত্যা করে, ভ্রূণহত্যা করে, ব্যভিচার করে, চুরি ডাকাতি করে মানুষ যে শাস্তি লাভ করে, তার চাইতে ঢের শক্ত অপমান আমায় লাভ করতে হল। তাঁরা আমায় গুঁড়ো করে ফেলবার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ইংরেজের রাজত্ব, কাযেই উদ্যোগকার্য্যটা আরম্ভেই ইতি হয়ে গেল। তাঁরা আমায় অভিশাপ দিতে দিতে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ-টরচগুলোর জন্যে হাঙ্গামা করতে ভুললেন না। আমি দিয়ে দিলুম।

"ঝড় থামলে পড়াশোনায় মন দিলুম। মেমের কাছে যে কদিন ছিলুম, বেশ একটু শান্তি আর শৃঙ্খলায় ছিলুম। তারপর কলকাতায় পড়াশোনার জন্য গেলুম। পয়সার জোর ছিল না, অবিবেচনার সঙ্গে খরচ করলে লেখাপড়াটা যে খরচের অভাবে অকালে মারা যাবে, পিতৃবন্ধুরা সে কথাটা আমায় বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কাযেই তাঁদের পরামর্শমত তাঁদের পরিচিত আত্মীয়বন্ধুদের আশ্রয়ে Paying Guest হয়ে থেকে লেখাপড়া শিখতে লাগলুম। কিন্তু দুঃখ কষ্ট, অসুবিধা, অবজ্ঞা বিদ্রূপ, শ্লেষ এত চলত তার ওপর, এবং গোঁড়া হিন্দু গিন্নিদের এতরকম লাঞ্ছনা ঝঙ্কার আমায় পরিপাক করতে হত,- যে তা বলবার নয়। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতুম, চোরের মত ভীত শঙ্কিত হয়ে থাকতুম। বলছি যে,—মহাপাতকীকেও এত শাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি, লেখাপড়া শেখবার জন্যে আমায় যত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

"মনের ক্লান্তি অবসাদে সময় সময় জর্জ্জরিত হয়ে পড়তুম। কিন্তু দুঃখের আঘাতটা বেশী করে খেয়ে, ক্রমে সাহসও বাড়ল। পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষ করে, পরিচিতদের মধ্যে বাসা বদল সুরু করলুম। Paying Guest, সুতরাং অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে স্থান দিতেন,—কিন্তু তারপর যথাপূর্ব্বং—ঘটনাবলী সুরু হত। পরের আশ্রয়ে বাস করে, এদেশের যে মেয়েকে লেখাপড়ার চর্চ্চা করতে হয়েছে, সে জানে,—এই অবস্থাটা কি তীব্র তিক্ত, কি উৎকট বিস্বাদময়! জ্ঞানচর্চ্চার অপরাধে এদেশের মেয়েকে বড় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, বন্ধু—বড় লাঞ্ছনা! জ্ঞানের এত অপমান, তপস্যার এমন নির্য্যাতন যে বর্ব্বরতার আঘাতে অন্তরাত্মা বিদ্রোহ উম্মাদ হয়ে উঠতে চায়।

"যাক সে কথা। এফ. এ. পড়বার সময় বাধ্য হয়ে এক হিন্দুগৃহে অতিথি হলুম। বাড়ীর বাবুগুলি শিক্ষিত এবং গোঁড়া সাহেব, আর গিন্নিগুলি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং গোঁড়া পাড়াগেঁয়ে। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে কোণঠাসা হয়ে একপাশে পড়ে রইলুম।

"এই বাড়ীর একটি কচি মেয়ে, বছর দেড়েক তার বয়স, সে কিন্তু অত বাচ-বিচার বুঝলে না। কেন জানিনে, অচিন্ত্যনীয় অনুগ্রহ ভরে,—হঠাৎ আমায় 'পেয়ে' বসল।

"মেয়েটির মা তখন আর একটি সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এ মেয়েটার দিকে চোখ কাণ সর্ব্বদা সজাগ রাখবার অবকাশ তাঁর বড় ছিল না। মেয়েটা যখনি ফাঁক পেত,—আমার পড়ার মাঝে এসে হুটোপাটি লাগিয়ে দিত।

সে কি উপদ্রব ; মিসেস অগস্তি, আপনি দুষ্টু শিশুদের পছন্দ করেন কি? আমি এদের ভালবাসি, বড্ড ভালবাসি। দুষ্টুমি করবার বুদ্ধি যে শিশুর আছে,—তাকে পেলে আমিও তার সঙ্গে শিশু হয়ে পড়ি। এই মেয়েটাকে পেয়ে আমি যেন—কি রকম হয়ে গেলুম!

"বাড়ীর লোকেরা খড়গহস্ত হয়ে উঠল। আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার সংসর্গে মিশে ঐ মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি যে আমার মতই লক্ষ্মীছাড়া হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ রইল না। বিশেষ, তার মা যখন মেয়েটার লক্ষ্মীশ্রী রক্ষার চেষ্টায় কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল না, বরঞ্চ আমার হাতে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই রইল,—তখন বাড়ীসুদ্ধ দল আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন,—মেয়েটা গোল্লায় গেল।

"চিপটেন শুনতে শুনতে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলুম। একদিন কলেজ থেকে বাড়ী ঢুকছি, দেখলুম পাশের বাড়ীর আর একটি মেয়ে,—ঠিক তারই বয়সী, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আমার সেই মেয়েটা। আমায় দেখেই সে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ছোট ছোট দাঁতগুলি বের করে হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার খুদে বন্ধুটিও অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল। দুটোকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে চুমো খেলুম। তারা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

"বাড়ী ঢুকতেই বড় গিন্নী রুদ্রমূর্ত্তি ধরে চিৎকার করে উঠলেন, 'গেল রাজ্য, গেল মান'। আমি নাকি তাঁদের জাতধর্ম্ম রসাতলে দিতে বসেছি।

"পাশের বাড়ীর মেয়েটি যে সোণার বেণেদের মেয়ে তা জানতুম না। জানলে তাঁদের সংস্কারে আঘাত দিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি কবতুম না। হুকুম হল— বেরোও বাড়ী থেকে।

"বেরুলুম। মেয়েটার ওপর খুব প্রহার চলছিল, রাস্তা থেকে তার কান্না শুনে চোখে জল এল। হায়রে অসহায় শিশু! এ জগতে বর্ব্বরতার অত্যাচার তোরাও ভোগ কববি? তোদেব জন্যেও কি ভগবৎ করুণা বলতে একটা জিনিস এখানে জুটবে না?

"আশ্রয় খুঁজে নিলুম। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলুম না। রাত্রে ঘুমতে পারতুম না। সকল কাযেব মাঝে কেবল চমকে উঠতুম, মেয়েটা এই বুঝি আসে। সমস্ত মন দুরন্ত ব্যাকুলতায় ভরে থাকল। জীবনে কোন সময় যদি কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হয়ে থাকি, তবে,—সেই একটা সময় মাত্র। স্নেহের আকর্ষণ যে এমন যন্ত্রণাবহ পাপ, তা আগে জানতুম না—সেই প্রথম জানলুম।

"মানসিক ক্লেশের ধাক্কা সামলাতে পারলুম না। খুব অসুখে পড়লুম। মাসখানেক ভুগে ভাল হয়ে উঠলুম। একদিন কষ্টেসৃষ্টে হেঁটে গিয়ে তাদের দুয়ারে দাঁড়ালুম। কিন্তু তাকে সেখানে দেখতে পেলুম না। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করলুম। হঠাৎ দেখি এক ডাক্তারের মোটর এসে দাঁড়াল। মেয়েটির বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ডাক্তারের অভ্যর্থনা করলেন।

"দূর থেকেই নমস্কার করলুম। তিনি চমকে উঠে বললেন, কোথায় ছিলে এতদিন? বাড়ীতে এস। মেয়েটার বড় অসুখ।

"কোন দ্বিধা করবার সময় পেলুম না। বাড়ীতে ঢুকলুম। কিন্তু হায়!—গিয়ে আর তাকে দেখতে পেলুম না। দেখলুম শুধু তার দারুণ যন্ত্রণা। উঃ! সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! উরুস্তম্ভ থেকে প্রচণ্ড শোস জেগে বেচারার দেহটা ভেতরে ভেতরে পচিয়ে ধ্বসিয়ে

ফেলেছে। শুনলুম রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা আর শুশ্রূষায় বড্ড অবহেলা হয়েছিল। প্রথম চিকিৎসার ভার যে চিকিৎসকের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তিনি বিজ্ঞলোক। মেয়েদের প্রাণগুলো যে অক্ষয় অমর,—তাদের রোগের চিকিৎসা যে যথাসম্ভব তাচ্ছল্য সহকারে করাই উচিত, এটুকু তিনি খুব বুঝতেন। সুতরাং তেমনিভাবেই চিকিৎসা করেছেন।

"ডাক্তার শ্লাফ পরিষ্কার করতে লাগলেন, অসহ্য যন্ত্রণায় সে নীল হয়ে গেল। চেঁচিয়ে কাঁদবার শক্তি তার ছিল না। ঠোঁট ফুলিয়ে ফোঁপাতে লাগল,—মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাকুল কাতর-দৃষ্টিতে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। উঃ, সে কি মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি! মিসেস অগস্তি, সে চাহনির কথা মনে হলে,—আজও আমার পাঁজরাটা যেন গুঁড়ো হয়ে যায়।"

মিস মিত্রের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ঝরঝর করিযা চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চোখ পরিষ্কার করিয়া ধরা-গলায় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তার চলে গেলেন। আমি অভিভূতের মত তার বিছানার পাশে বসে যন্ত্রণা দেখতে লাগলুম। সে কিছুক্ষণ ছটফট করে, আমার হাতখানা ধরে মুখের ওপর টেনে নিলে। আমার ছোট আঙুলটা মুখে পুরে চুকচুক করে চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। তার একটা অভ্যাস ছিল,—যখন তখন আমার এই আঙুলটা ধবে মুখে পুরত। রোজ নোখ কেটে সেইজন্যে সর্ব্বদা আঙুলটা পরিষ্কার করে রাখতুম।

"আমার আকস্মিক আবির্ভাব নিয়ে মেযেমহলে খুব একটা হট্টগোল হল। পুরুষেবাও কেউ কেউ তাতে যোগ দিলেন। কোন কথায় কর্ণপাত করলুম না। সে ঘুমিয়ে পড়তেই উঠে এলুম। সদ্যঃ-রোগমুক্ত দেহ তখন দৌর্ব্বল্যভারে টলছিল। অতি কষ্টে বাসায় ফিরলুম।

"কষ্ট অগ্রাহ্য করে পরদিন আবাব গেলুম। সেদিন ডাক্তার আসেননি। একজন ড্রেসার এসে ক্ষত পরিষ্কার করছিল। কিন্তু সে বড় অসাবধানে কায করছিল। চিমটের খোঁচায় ঘা-টা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলছিল, কিন্তু শ্লাফ ধরতে পারছিল না। শিশু যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠেছিল। বল্লুম, সরুন—আমি দেখাই।

"পূর্ব্বদিন ডাক্তারের শ্লাফ ধরাব কৌশল দেখেছিলুম। সেটা মনে গাঁথা ছিল। তেমনিভাবেই কায করলুম। এবার শিশু শান্ত হয়ে সহ্য করলে। ড্রেসাব আশ্চর্য্য হয়ে জানতে চাইলে, আমি শিখলুম কোথা? অকপটে সত্য উত্তব দিলাম।

"পরদিন থেকে সে নিজ হতেই আমার হাতে চিমটে দিতে লাগল। গায়ের জোরের কায নয়, বুদ্ধি আর সতর্ক মনোযোগের কায মাত্র,—সুতরাং অক্লেশেই সেটা করতে লাগলুম। ডাক্তারও আমার কায দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বিশেষ,—শিশুটি আমার হাতের কাযটায় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে দেখে, ডাক্তার কাযটার ভার আমার ওপরই চাপালেন। কিন্তু আমি তখন অশিক্ষিত, সেজন্য ড্রেসারকে রোজ এসে দেখতে বল্লুম।

"আমি যতক্ষণ থাকতুম—মেয়েটিকে শান্ত দেখতুম। তার সমস্ত খুঁৎখুতুনি,—সমস্ত অস্বস্তি আমাকে দেখলেই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু একটু এদিক ওদিক সরলেই তার সেই খুঁৎখুঁতুনি শুনতে পেতুম। সামনে গিয়ে বসতুম, অম্নি সব ঠাণ্ডা। ফ্যালফ্যাল করে এমন

আকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, দেখলে মনে হত—সে যেন কি অপূর্ব্ব বস্তুই দেখছে! আমায় দেখে যেন তার আশ মিটছে না! উঃ! হতভাগা মেয়ে, কি ভালই যে বেসেছিল আমায়।

"একদিন ঘা পরিষ্কার করবার সময় তাকে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখলুম।—যন্ত্রণায় তার দম আটকে যাবার মত হল। ড্রেসার চোখ এড়িয়ে খানিকটা স্লাফ বাদ রেখেই তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করলুম। মনে ভাবলুম কাল ওটা পরিষ্কার করে দেব।

"কিন্তু পরদিন সেটা খুঁজে পেলুম না। ঘায়ের অবস্থা দেখলুম— হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রেসারকে দেখালুম, সে কারণ বুঝতে পারলে না। কিন্তু রোগীকে সেদিন একটু প্রফুল্ল দেখলুম। রোগের যন্ত্রণায় সে কথা বলতে ভুলে গেছল, হাসতে ভুলে গেছল। সেদিন দেখলুম—একটু হাসলে। আনন্দে নিজের ত্রুটির কথা ভুলে গেলুম—ভাবলুম, যাকগে স্লাফ, মেয়ে ত ভাল হয়ে আসছে।

"সেদিন তাকে অনেকটা সুস্থ-সবল বোধ হল। নেভবার আগে দীপ যে একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জানতুম না।—হায়রে অনভিজ্ঞের মূর্খতা! মন আমার আনন্দ আর আত্মপ্রসাদে ভরে উঠছিল। আর ভয় নেই! আর ভয় নেই! ভাল হয়ে এসেছে! উঃ, কি ঠকাই ঠকলুম সেদিন!

"সেদিন অনেকক্ষণ তাব কাছে বসে খেলা দিলুম। যখন উঠে আসি,--হঠাৎ সে রাগের চোটে এমনি লাফ দিলে যে বিছানা থেকে উল্টে পড়ল। রুগ্ন অবস্থায় তার এতখানি জোর, আব কোনদিনই কেউ দেখেনি। মেয়েরা সবাই স্বীকাব করলে তার শক্তি বেড়েছে। —সুতরাং সুস্থতা নিশ্চয়! আমিও বুঝলুম তাই। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শান্ত করে,—অনেকক্ষণ পরে চুপি চুপি পালালুম।

"পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছে দেখলুম, সর্ব্বনাশ! শ্বাস আরম্ভ হয়েছে! ডাক্তার জবাব দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ড্রেসার যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—আজ আর ঘা ধোবার দরকার নেই।

"আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছিল। টলতে টলতে তার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। ডাকলাম,—সে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে এগিয়ে আসবার জন্যে পাশ ফিরলে। শিথিল-কম্পিত হাত দু'খানা এলিয়ে পড়ছিল। তবু সে দু'খানা বাড়িয়ে অতি কষ্টে আমার হাতটা ধরে মুখে টেনে নেবার চেষ্টা করলে। হাত বাড়িয়ে দিলুম। আঙুলটা মুখে ধরলে, কিন্তু আটকে আসছিল,—ছেড়ে দিলে। আবার ধরলে, আবার ছাড়লে। আঃ! সে কি প্রাণাকুল আকাঙ্ক্ষা। হাঁ করে চেয়ে রইলুম। তখন আশা হচ্ছিল,—ডাক্তার ভুল বুঝেছেন। এ তো যাবার নয়,— এ কি যেতে পারে?

"দশ মিনিট পরেই সব শেষ।

"মন উদভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে উঠল। নিজের মূর্খতা, মূঢ়তা, অনভিজ্ঞতা আমায় যন্ত্রণার কশাঘাতে ক্ষিপ্ত করে তুললে। ওরে প্রিয়, ওরে স্নেহাস্পদ,—আমি যে প্রাণপণে তোর মঙ্গল কামনাই করেছি। কিন্তু আমার মূঢ়তা তোর এ কি দারুণ অকল্যাণ সাধন করলে! মূর্খতা আমায় একবার বুঝতে দিল না! আমার ত্রুটি সংশোধন করবার এতটুকু সুযোগ আমায় দিলে না!

"ছ'মাস মাথার ঠিক ছিল না। অতিকষ্টে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলুম। তারপর সেই ডাক্তারকে গিয়ে ধরলুম। তাঁর চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলুম। অন্ধ জেদে নিজের মূর্খতা পাপকে, অনভিজ্ঞতা ব্যাধিকে, মূঢ়তা গ্লানিকে ধ্বংস করতে লাগলুম। ওরাই যে আমার সেই প্রিয় স্নেহের ধনকে হত্যা করেছে! ওরাই যে আমার মহাশত্রু!

"অর্থ, যশ, মান, প্রেম, প্রণয়, গৃহসুখ?— উৎসন্ন যাক। দেহ-সুখ? শৃগাল কুকুরের শ্মশানে ভোজনে ও সুখটা সার্থক হবে একদিন,—দুঃখ কি? আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি, এক শিশুর স্মৃতি-পূজায়। সে পূজা ভগবানের পায়ে পৌঁছায় কি না, জানি না, জানবার আগ্রহও নাই। আমি ভগবানকে ভালবেসে আনন্দ পাই, —এই যথেষ্ট। ভগবান আমায় ভাল না বাসলেও আপত্তি নেই। আমার পূজা, তাঁর রাজ্যের মানুষদের মনুষ্যত্বনাশী মূর্খতা পাপকে হত্যা করে চলবেই। যে মূঢ়তার হাতে আমি হত্যাশোক লাভ করেছি, সে মূঢ়তাকে হত্যা করাই আমার জীবনের ব্রত। বন্ধু! আমার সকল কায, সকল চিন্তার মাঝে জাগছে,—এক শিশুর স্মৃতি— অসহ্য, কিন্তু সুন্দর! ভীষণ, কিন্তু প্রাণারাম! সেই স্মৃতির মাঝখান থেকে,—আমি কর্ম্মদেবতার রুদ্র আহ্বান শুনেছি।"

বহির্দ্বার হইতে ডাক আসিল, "ডাকতার-মা আছেন?" মুহূর্ত্তে জানালার কাছে গিয়া, তিনি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিলেন।

নীচে হইতে সংবাদ আসিল, "তরণীবাবুর বাড়ীতে এখুনি যেতে হবে। তাঁর ছোটছেলের অসুখ।"

"গাড়ী আছে?"

"না।"

"ডাকব?"

"দরকার নাই। দেরী হবে। বৃষ্টি ধরে গেছে, হেঁটেই যাচ্ছি চলে।"

ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া তিনি অন্যমনস্কতার খেয়ালে বিনা নমস্কারেই বাহির হইয়া গেলেন। পরনে যে তাঁহার অদ্ভুত সজ্জা রহিয়াছে, সেটা যে চিকিৎসকের যোগ্য সজ্জা নয়, সেটুকুও তাঁহার স্মরণ হইল না।

সজল নয়নে হাসিলাম। নিঃশব্দে উদ্দেশে নমস্কার করিলাম!

মনীষা

সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

চায়ের শূন্য পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া নবীন মুন্সেফ মহেন্দ্রবাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কাজটা ভাল হচ্ছে না মনীষা, তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্য কর না, কিন্তু"—

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মনীষা বলিল, "কিন্তু আমার জন্য চারিদিকের চিন্তাশীল লোকেদের ভারি দুর্ভাবনা জুটেছে,— না? আচ্ছা, তুমি ত হাকিম, একটা নোটিশ বার করে দাও —নির্ভয়!"

"না না, দেখ গৃহস্থঘরের মেয়ে তুমি, গৃহস্থঘরের চালে থাক, কোন আপত্তি নাই"—

স্বামীর অসমাপ্ত কথার উত্তরে মনীষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "বা! আমি কি পথস্থ ঘরের মেয়ের মত চালে আছি?"—

বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া মহেন্দ্রনাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "নয় কেন? সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, পাড়ায় পাড়ায় যত ছোটলোকদের ঘরে ঘরে বেড়ান, এগুলো বুঝি বড় ভাল কাজ? লোকে ভারি সুখ্যাতি করে,— না?"

মনীষা দুর্লক্ষণ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল, বিনীতভাবে বলিল, "সকালে আমি বেরুই না।"

"না হোক, সন্ধ্যার পর বেরোও তো? লোকে বলতে ছাড়বে কেন? লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়, জান? যে আসে, সেই বলে, মশাই আপনার স্ত্রী—"

"থাম থাম, তোমার গোটাকতক লক্ষ্মীছাড়া উকীল বন্ধু জুটে খোসামোদের তোড়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে তা আমি জানি, আমি বড়লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেও যাই না, আর গেরস্তবাড়ীতে গল্প কর্ত্তেও যাই না, দু-দশজন অনাথ গরীবের খবর নিলে কি এত গুরুতর অপরাধ হয় বল ত—যে সবাই মিলে অত বিজ্ঞতা ফলিয়ে বাধা দিতে আসেন? সাধে বলি, যত অকেজো লোকের আরাম শুধু পরচর্চ্চা চিবিয়ে।—"

মনীষা দুর্দ্দাড় করিয়া টেবিলের জিনিসগুলো নাবাইয়া, ঝাড়নে করিয়া সপাসপ টেবিল ঢাকা ঝাড়িতে লাগল। মহেন্দ্রনাথ গোঁপে মোচড় দিয়া মিনিট দুই ভাবিলেন, মনীষা সম্বন্ধে বাহির হইতে সংগৃহীত কতকগুলো জবানবন্দী,—মায় টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যা সহ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন, পরে বলিলেন, "দেখ পয়সাব দ্বারা যতটা পার তুমি গরীব দুঃখীর উপকার কর,—কিন্তু নিজে অমন টো-টো করে যেখানে সেখানে ঘুরো না—"

"বাঃ বেশ ত, তোমার রোজগারের টাকাগুলো ঘুস দিয়ে আমি আরামে বসে পুণ্যি কিনবো? চমৎকার মীমাংসা তো!"—মনীষা আবার হাসিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, আমার এইসব ছোট কাজের এত বেশী খোঁজখবর নিয়ে তোমার কাছে হিতৈষীপণা যাঁরা ফলাতে আসেন, তাঁরা যে কিরকম নির্লজ্জ আমি শুধু তাই ভাবি!—

নিজের পক্ষটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনশ্চ নবোদ্যমে অন্যদিক দিয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, মনীষারও জেদ চড়িল। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়া শেষে মনীষা অত্যন্ত রাগিয়া শপথ করিয়া বলিল, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন যাইলেও যদি আর কোনদিন এই ঘরের কোণটা ছাড়িয়া বাহির হই তাহলে...।"

মহেন্দ্রনাথ ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "দীনে, দীনে—"

কিশোর ভৃত্য দীনুয়া তখন বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা কাগজের পাকান বল ও একটা দেবদারু কাঠের সরু তক্তাভাঙা লইয়া সাহেবদের টেনিস খেলার অনুকরণে লোফালুফি করিতেছিল, সহসা প্রভুর আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মহেন্দ্রনাথ তীব্র স্বরে বলিলেন,

"ব্যাটা ফের যদি তোমার মাইজীকে নিয়ে কোথাও গেছ শুনি, তাহলে...।"

প্রভুর মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া দীনুয়া বুঝিল প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া মাইজীর সহিত বাড়ী-বাড়ী ঘুরিতে যাওয়ায় একটা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে!—সে ভয়ে ভয়ে একবার আড় চোখে মনীষার পানে চাহিল, কিন্তু মনীষা তখন তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের ফুলদানিতে কতকগুলা সপল্লব ফুটন্ত হাস্নাহানা সাজাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দীনু কর্ত্রীর নিকট কোন আদেশ ইঙ্গিত না পাইয়া, অগত্যা প্রভুর বাক্যের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া বাহিরে আসিল। ইঃ! আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল যে, অকারণ মনিবের কাছে ধমক খাইল?—

যাহাকে দশ কথা শুনান যায়, সে যদি দু-কথা না জবাব দেয়, তাহা হইলে সেটা যেন বাতাসের সহিত মল্লযুদ্ধের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক পরিশ্রম হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ হাস্য বিদ্রূপের ধারে মনীষা স্বামীর কথা কাটিতেছিল, ততক্ষণ স্বামী খুব নির্ভাবনাতেই কথা চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষটা নিজের অত্যধিক রূঢ়তার দোষে প্রতিপক্ষের অবস্থান্তর ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার কেমন দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হইল। কিন্তু তখন হঠাৎ থামিয়া গেলে নিতান্তই পরাজয়ের মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ খুব জোরের সহিত আপনাকে ঠিক রাখিয়া নিঃশব্দে কার্য্যে রত স্ত্রীকে আরও গোটাকতক শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া, সশব্দে দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

তাহার পর কয়দিন কাটিয়াছে, মনীষা খুব গম্ভীর হইয়া শয়নকক্ষের একটি কোণে বোনা, সেলাই ও পড়া লইয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে দিন কাটাইতেছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না, সংসারের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান পুরাণ ঝিই সব করে, কেবল অতি প্রয়োজনীয় দুই একটা কাজ, যাহা না করিলেই নয়, তাহাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে মনীষা সারিয়া থাকে।

মহেন্দ্রনাথও বাহিরে বৈঠকখানায় বন্ধুদিগকে লইয়া দাবাবড়ের মধ্যে খুব জমিয়া গিয়াছেন। মনীষার আকস্মিক আবির্ভূত ঔদাসীন্যটা তিনি যেন খুব উপেক্ষার সহিতই একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নিজের দিনগুলা প্রচুর সচ্ছলতার মধ্য দিয়া নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সংসারের ছোটখাট খুঁটিনাটীগুলা যেন নিতান্তই অগ্রাহ্যের সহিত এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি খুবই স্বতন্ত্র হইয়া দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ঠেলায় দীনু দুবের দিনগুলা কেমন অসহ্য নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আজ ছয় মাস মনীষার কাছে রহিয়াছে, কই কেহ ত একদিনের জন্য —এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার স্বাধীন আনন্দে হস্তক্ষেপ করে নাই! তবে একি হইল? কার অভিশাপে এ দুর্দ্দৈব ঘটিল? আগে ত সে কত দুষ্টামী করিয়া বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইয়াছে, মনীষার আদেশে কাহারও কিছু ফরমাস খাটিতে গিয়া যখন সে পথে লাট্টু ও মার্ব্বেল খেলিয়া প্রচুর বিলম্ব করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, এবং তিরস্কারোদ্যতা মনীষাকে যখন কল্পিত কৈফিয়ৎ বাৎলাইতে গিয়া হাসাইয়া দিয়াছে, কই তখন ত কেহ তাহাকে কিছুই বলে

নাই। তবে এখন অকারণ কেন এমন অবস্থান্তর ঘটিল? এই যে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত দিনটা হেথা-হোথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—তা দিনান্তে মনীষা একবার ডাকিয়া শুধাইতেও ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কি কম আক্ষেপ? অভিমানে সময় সময় তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিত। না, সে এত বরদাস্ত করিতে পারে না, মাইজীর এ নীরব গাম্ভীর্য্য—সমস্ত বিশ্বছন্দটাকে যেন বেসুর করিয়া তুলিয়াছে, সে কি করিয়া সামলাইয়া থাকে বলুন তো।

সেদিন মিশরাইন (মিশ্রাণী) ঠাকুরাণীর প্রাঙ্গণের টগর-গাছটীতে প্রচুর পরিমাণে টগর ফুটিয়াছে, দেখিয়া তাহার মাথায় একটা চমৎকার মতলব গজাইল। সে মিশরাইনের ছোট মেয়েটীকে কতকগুলো সিগারেটের ছবি ঘুস দিয়া গাছ উজাড় করিয়া ফুলগুলি তুলিল। তারপর, কলা-বাসনার সূতা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত, বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্য সহকারে এক ছড়া মালা গাঁথিল, এবং তাহার মাঝখানে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত টক্‌টকে রাঙাজবা ফুলের থুপী ঝুলাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া গর্ব্বভরে সেটাকে বারম্বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আসিযা মনীষার ঘরে ঢুকিল।

মনীষা তখন জানালার কাছে বসিয়া ছাঁটা ফুলের আসন ছাঁটিতেছিল, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল, দীনুকে দেখিয়া, তখনই দৃষ্টি নাবাইয়া আবার হাতের কাঁচিব দিকে মন দিল। মনে মনে রাগিয়া ভাবিল,—ইহারা সবাই খেপিয়াছে এবং তাহাকেও খেপাইয়া তুলিবার যোগাড় করিতেছে,—না, সে আর কাহাকেও প্রশ্রয় দিবে না। বিশ্বের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

মনীষার উদাসীন দৃষ্টি দেখিয়া নিমিষে দীনুর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল; মনীষার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার তাহার আর ভরসা হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে টেবিলের ফুলদান হইতে শুষ্ক ফুলগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাতেই মালাটী সুবিন্যস্ত করিয়া ধবধবে ফুলগুলির মাঝখানে পদ্মরাগমণির মত লাল জবাটা পরিপাটীরূপে সাজাইল।

তথাপি মনীষা কোন কথা কহিল না দেখিয়া ক্ষুন্নমনে সিগারেটের খালি বাক্স খুঁজিবার ছলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দীনু মনীষার নিকটে আসিয়া, মাটির উপর দু'হাতে ভর দিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কষ্ট-বিকশিত হাসি-মুখে ঐকটু 'হরদি' পশম প্রার্থনা করিল।

মনীষা পশমের বাক্স হইতে একটা ছোট গুলি তুলিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া বলিল, "নিয়ে যা"—

দীনু তৎক্ষণাৎ সেটি কুড়াইয়া লইল, কিন্তু যাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া উল্টা চাপিয়া বসিল, এবং আপন মনেই মনীষাকে ধীরে ধীরে শুনাইয়া দিল যে, শিবু কুর্ম্মির ছোট ছেলেটি,' নীলমনিয়া (নিউমোনিয়া) বেমারে মর-মর হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে আজ হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেরা বলিতেছে আর বাঁচিবে না।—

মুহূর্ত্তমধ্যে মনীষা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল! সে কি রাজ্যের যত ব্যাজলা লোকের সংবাদ বহিয়া আনিবার জন্য এই ছোঁড়াটাকে বাহাল করিয়াছে? না তাহাকে বিদ্রোহিতায় মাতাইবার জন্য ইহাকে মন্ত্র পড়িতে ডাকিয়াছে! সে মুন্সেফের স্ত্রী, মুন্সেফ-পত্নীর মতই

—সাধারণের নিকট হইতে সুদূরে পৃথক্ থাকিবে, না হইলে তাহার নিজের সম্ভ্রম যত থাক না থাক, আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির যে ভয়ানক অপমান করা হইবে! অতএব —মনীষা আরক্তমুখে বলিল, "তা হয়েছে হয়েছে, আমি কি করব? আমি কি পীর না পয়গম্বর, যে, হুকুমে রোগ আরাম কর্‌ব?...।

দীনু স্তব্ধনয়নে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মাইজীকে এমন কথা শিখাইল কে?...

অপ্রস্তুত বালক খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মনীষা তখন কাঁচি ও কার্পেট ফেলিয়া দুই হাতে কপাল চাপিয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল।

৩

উজ্জ্বল ফিকে ফিকে রাঙা মেঘে আকাশের চারিদিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ঈশান কোণে একখানা কাল মেঘ উঠিয়া ধীবে ধীরে অগ্রসব হইতেছিল। চারিদিকের গাছপালাগুলা সব স্তব্ধভাবে আঁকা ছবির মত স্থির হইয়া আছে, গোটাকতক আহারলুব্ধ পক্ষী কেবল চঞ্চলভাবে আকাশের কোলে ঘুরিতেছিল।

মহেন্দ্রনাথ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, মনীষা একা দ্বিতলের বারেন্দায় অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যা-সকালগুলো যেন দিনে দিনে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনটা কেবলই বাঁধন ছিঁড়িয়া কোন একটা নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে ছুটিবার জন্য সময় সময় বড়ই অধীর হইয়া উঠে। তাহার দিন রাত যেন আর কাটে না, বিশেষতঃ ঐ বৈকালবেলা!—সমস্ত কাজকর্ম্ম সারা হইলে প্রাণটা কেবলই হু হু করিয়া উঠে— তাই ত! এবার কি করি!

তাহার কাজ নাই, ক্লান্তি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, আছে শুধু চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া একটা গুরুভার অবসাদ। প্রতি মুহূর্ত্ত সে যে কি অসুস্থতায় কাটাইতেছে, তাহা বলিবার নহে, —কিন্তু আর এ রকমে সময় কাটে না।

ঈশান কোণের মেঘখানা ক্রমশঃ ঘোরাল হইয়া চারিদিকের আকাশের সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপর একটা নিষ্ঠুর কাল যবনিকা টানিয়া দিল। আসন্ন বর্ষণোম্মুখ সজল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, জল নামে বুঝি।

মনীষা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। আহা, তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণশীল সন্ধ্যার সময় তাহার কিশোর জীবনের সেই একমাত্র স্নেহের পুতুলটী কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!—ঠিক সে আজ তিন বৎসর!

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আজ কোথায়—আজ কোথায় তাহার সেই স্বর্গ পারিজাত সোণার শিশু?—আজ তিন বৎসর সে যে মার বুক খালি করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে!—সে কেন তাহাকে এত শাস্তি দিয়াছে,—এক বৎসরের জন্য মার কোলে আসিয়া—সমস্ত জীবনব্যাপী ক্ষোভে মার বুক ভরিয়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে গো?—মনীষা প্রাণ ভরিয়া তাহার যত্ন করিতে পারে নাই, শুশ্রূষা করিতে

পারে নাই,—চিকিৎসা করাইতে পারে নাই,—বাছা যে দৈন্যের পীড়নে বড় অনাদৃতভাবেই ভুগিয়া ভুগিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে বেদনা যে মরিলেও যাইবে না!—মনীষা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরে ঢুকিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সহজে কাঁদে না, কাঁদিতেও পারে না—তাহার বড় ভয়, পাছে তাহার কান্না দেখিয়া আর কেহ কাঁদিয়া ফেলে। আজ চারিদিক নির্জ্জন, কেউ কোথাও নাই, তাই সে প্রাণ খুলিয়া আজ প্রাণের বোঝা নামাইতেছে।

বাহিরে সজোর হাওয়ার সহিত সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমশঃ বেশী হওয়ায় বৃষ্টির বেগ ক্রমেই হ্রাস পাইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছিল, মাঝে মাঝে কড় কড় শব্দে বজ্রধ্বনি হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল, আর ক্রুদ্ধ দানবের মত বিকট তাণ্ডবে লাফালাফি করিয়া—চারিদিক কাপাইয়া, গোঁ-গোঁ-শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল।

মনীষার বুকের ভিতর আজ শোকের তুফান উথলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের ক্ষুদ্র জীবনীর সমস্ত স্মৃতিটুকু আজ একযোগে তাহার নিভৃত বেদনা-মণ্ডিত হৃদয়টা মুহুর্মুহু আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে,—পুত্রের মৃত্যুর দিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা যতই দুঃসহ হউক, কিন্তু তাহার চেয়েও তীব্র জ্বালাদায়ক স্মৃতি যে সেই রোগে জীর্ণ ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেক দিনগুলার প্রত্যেক অভাবের মুখে—দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা।—পয়সার অভাবে, —নিজেদের শিক্ষার অভাবে—ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ! নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া যায়! বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর যখন আছাড় খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন, "তুই কেন গেলিরে মাণিক" —তখন মনীষা তাই ত শুধু ক্ষুব্ধ বেদনায় আক্ষেপ করিয়াছিল, "তুই যে বড় দুঃখ পেয়ে গেলি বাবা!"—তাহার দুঃখ শুধু ঐটুকু, অবোধ জীব বড় দুঃখ পাইয়া গেল। নিজের কথা ভাবিয়া—কেন গিয়াছে বলিয়া—সে একবারও শোক অনুভব করে নাই—নিজেদের অপরাধের জন্যই সে শুধু সন্তপ্ত হইয়াছিল।

পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু ছিল তাহা ঘুচাইয়া এবং মনীষার গহনা কয়খানি বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে খরচ জুটাইয়া স্বামী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন সবে জেলাকোর্টে ঢুকিয়াছেন। কাজেই তখন ঘরের কড়ি ভাঙ্গিয়া কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটান হইতেছে, পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষেই হৌক, আর পচা পুকুরের জল মিশান গাই দুধ খাইয়াই হৌক, আট মাস বয়সেই শিশু—যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইল। মামুলী প্রথামত প্রথমতঃ জলপড়া, তেলপড়া, পরে পাঁচুগোপাল ও পঞ্চাননের চেলাগণের চিকিৎসা চলিল, শিশু দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল, কোন ঔষধই ধরিল না। অবশেষে গ্রামের কবিরাজ আসিলেন, দিনকতক তাঁহার চিকিৎসার গুণে শিশু ভালই রহিল, তাহার পর আবার যে সেই। পয়সা নাই যে ভাল চিকিৎসক আনান হয়। অনেক চেষ্টা ও চিন্তার পর দেনার উপর দেনা করিয়া সহর হইতে চিকিৎসক আনান হইল, কিন্তু হায়—তখন যে আর চিকিৎসার সময় নাই, পরদিন সন্ধ্যার সময় বালকের মৃত্যু হইল।

সকলে সান্ত্বনা দিল যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! সে যে ও-কথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। আগাগোড়া অনিয়মে ও ত্রুটিতে ক্ষুদ্র জীবনের

সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত করিয়া শেষের দিকে সেই টানা-হেঁচড়ায় আর কি কোন ফল হয়?—সে যেন আরো মর্ম্মান্তিক যাতনা বলিয়াই মনে হয়।

হইতে পারে শিশুর নিয়তি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যাউক, তাহাতে দুঃখ কি, কিন্তু তাহার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলো তাহাদের করিবার ছিল, সেগুলো কি তাহারা সব করিতে পারিয়াছিল? না না, তা তো পারে নাই,—তাহার কিছুই যে পারে নাই গো—সেইটুকুই যে দুঃখ?

আজ তাহার স্বামী উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ তাহাদের সমস্ত দৈন্য সমস্ত অভাব ঘুচিয়াছে, তাই ত আজ এ স্বচ্ছলতার মাঝে বসিয়া আকুলতায় তাহার বক্ষঃস্থল ভরিয়া উঠিতেছে!—সে জোর করিয়া সব ভুলিয়া থাকিতে চায়। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না, তবু—ওগো, তবুও গোপন অন্তঃকরণ হইতে যে সেই অতীত কাহিনীর একটা অক্ষরও মুছিয়া যায় নাই?—তা যে সবই তেমনি উজ্জ্বল অটুট আছে?

হায়! মানুষ, মানুষের কাজের বাহির দিকটা দেখিয়া তাহার 'আঁতে ঘা' বসাইয়া বুক ভাঙ্গিয়া দেয়, সে জানে না ইহার ভিতরটায় কিছু আছে কিনা—কোন আবেগের উৎস তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে সেটা সে বুঝিয়া দেখে না, খুঁজিয়া দেখিতে চাহে না। মানুষ বাহিরের হাত পাগুলা লইয়া কি করিতেছে—সেইটুকুর উপরই শুধু তাহার তীব্র দৃষ্টি! ওগো, সে কি করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, অন্তরের কি দুর্ব্বহ নিগূঢ় বেদনাকে সে এই প্রকাশ্য স্থূলতার মাঝে সূক্ষ্ম তৃপ্তিতে সার্থক করিয়া লইতে চায়?—সে কোন প্রমাণে দেখাইবে যে, সে যে ঐ দরিদ্র দুঃস্থের সেবার মাঝে নিবিড়ভাবে আপনাকে মিশাইযা দিতে চায়,—তাহা পশ্চাতের কোন অসহ্য তাড়নায়?—সম্মুখের কোন শান্তিময় আশায়?—

না গো না, পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ মানুষ নির্ব্বোধের দুর্ব্বলতার ক্ষমা করিতে পারে না।—ভগবান নিজে যখন তাহার বুক খালি করিয়া পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছেন, তখন সে যে পরের পুত্রকে বুকে করিয়া ফাঁকি দিয়া শান্তি ভোগ করিবে, সে ত্রুটি কেহই সহ্য করিবে না!—সে যে নিজের তৃষিত মাতৃত্ব, অতৃপ্ত, বেদনাহত স্নেহরাশি পরের শিরে ঢালিয়া হৃদয়টা হাল্কা করিয়া সুখী হইবে,—সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেহই ক্ষমা করিবার ক্লেশ স্বীকার পাইবে না। না করুক, —কাহারও উপর তাহার জোর নাই। কাহার উপরই বা সে অভিমান করিবে? যখন নিজের গর্ভজাত সন্তান হইতেও সে বঞ্চিতা, তখন পরের সন্তানের উপর এ তৃষাকুল মমতা মানুষ কেন সহ্য করিবে?

অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে মনীষা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওরে আয় বাবা, আয়, একবার আয়, আজ তুই নেই বলে সবাই আমার পর,—তুই ছেড়ে গেছিস বলে কেউ আর বিশ্বাস করে আমার হতে চায় না—ওরে, তুই একবার আয় বাবা!"

সহসা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ডুবাইয়া, বাহিরের ঝড়ের গর্জ্জন ভেদ করিয়া,—ঠিক যেন সেই আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরের মতই কোথা হইতে কে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মা-মা-মা!"

চকিতে উন্মাদিনীর মত দ্বার ঠেলিয়া মনীষা বারান্দায় আসিল, সত্যই ত—ও যে সত্যকার আহ্বানই বটে!—ঐ যে আবার শুনা যাইতেছে : মা—মা—।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নরনারী উদ্দাম ঝঞ্ঝাশব্দ ভেদ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে,—"মা—মা রক্ষে করুন, গরীবদের জীবন বাঁচান।"

ঝড়বৃষ্টিতে ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীর দুইখানি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। দৃষ্টিহীন অসমর্থ জননী ও পরিবারস্থ কয়জন পুরুষ এবং একটি মুমূর্ষু শিশু লইয়া স্বামী স্ত্রী আজ নিরাশ্রয়, এ বর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাথা গুঁজিয়া দু দণ্ডের মত দাঁড়াইবার স্থান নাই।—আশ্রয় দাও জননি,—অনাথদের আশ্রয় দাও!

মনীষা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল! সে এখনই না সন্তানকে ডাকিতেছিল? এখনই না সে তাহার বুভুক্ষিত সেবাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য অবলম্বন খুঁজিতেছিল? একি তাহাই? একি তাহাই? হাঁ, তাহাই বটে।— নিশ্চয় তাহাই, তাহার মর্ম্মভেদী আকুলতার উত্তরে উহারাই যে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে, উহারাই যে ডাকিয়াছে মা!

মনীষা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিয়া গেল, তাহার চক্ষের জল তখন শুকাইয়াছে।

৪

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, জলঝড় সমস্ত থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, নীল আকাশের কোলে বসিয়া শান্ত স্মিত শশধর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি ঢালিতেছেন। সেদিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।

স্থানীয় উৎসাহী বিদ্বান্ ভদ্রলোক ও নিষ্কর্ম্মা যুবকবৃন্দের দ্বারা স্থাপিত "দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণী" সভার আজ অধিবেশন ছিল। কোর্টের কয়জন উকিলই সে সভার যথাবিধানে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সুতরাং মুন্সেফবাবুকেও সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইয়াছিল। জলঝড়ের প্রকোপে সভা যথাসময়ে বসিতে পারে নাই,—সভ্যগণ সবাই জুটিলে তবে অনেক বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং একটু রাত্রি করিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছে,—কারণ সভার সঙ্গে সত্যকার কার্য্যের সম্পর্ক যতটুকু থাক না থাক, —প্রয়োজনাতিরিক্ত তর্ক বিতর্ক, এবং সভ্যগণের বক্তৃতার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সেই তর্ক বিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যগণের সকলের চিত্তই অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিল! মহেন্দ্রনাথও পথে আসিতে আসিতে সেই কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সব মনস্বী বিদ্বান-বুদ্ধিমানগণের উচ্চ উদ্দেশ্যগুলির পরিণাম কেন এমন বিরক্তিজনক শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাঁহাদের উন্নত সঙ্কল্প সাধনের পথে এত বিঘ্নই বা কেন এবং তাহার সিদ্ধির ফলগুলিই বা এত বিকৃত কেন?

এই যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি ভদ্রসন্তান এত বাগবিতণ্ডার পর করিলেন কি না আবেদন-নিবেদনের করুণ কাতরোক্তিপূর্ণ অনুনয়-লিপি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে প্রেরণ মাত্র, আর কিছু নয়।— হাতে কলমে চূড়ান্ত কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া এবার সবাই নিশ্চিন্ত, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই! এমন করিলে কি কাহারো কিছু সত্যকার শ্রেয়ঃ আছে? ইহাঁরা পৃথিবীর সমস্ত মালিন্য দূর করিতে চান, কিন্তু শুদ্ধাচারের খাতিরে স্বয়ং কিছু স্পর্শ

করিতে নারাজ, দূর হইতে ফুঁ দিয়া ইহাঁরা পর্ব্বত উড়াইতে চান।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তিনি লণ্ঠনবাহক আর্দ্দালীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। সিঁড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইয়া বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি আলোক লইয়া বাহির হইল এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন নীচ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষ বাহির হইয়া আভূমি-প্রণত-শিরে সমস্বরে ধর্ম্মাবতারের জয় ঘোষণা করিল। মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দু একটা প্রশ্নের পর সংক্ষেপে ইহাদের বিপদের কথা এবং ইহাদের আশ্রয়দাত্রী মা ঠাকুরাণীর করুণাময় বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারাও না সকলে মিলিয়া এইরূপ আকারের একটা মহৎ কাজের কল্পনায় এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়া—সময় কাটাইয়া আসিলেন?—চকিতে তাঁহার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল, এতক্ষণের মধ্যে যথার্থ কাজ করিল কে? বাহিরে গিয়া তিনি—না ঘরে বসিয়া তাঁহার সেই নগণ্যা পত্নী?

অকস্মাৎ তীব্র-কশাঘাতের মত তাঁহার সেদিনকার সেই হৃদয়হীন রূঢ়তার কথা স্মরণ হইল।—ছিঃ, এই কাজের জন্যই—এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। আজ যদি মনীষার মমতাশ্রয়ে ইহারা স্থান না পাইত—তাহা হইলে এই দুঃস্থ বিপন্নগুলির কি দুর্দ্দশাই হইত?—

মুহূর্ত্তে নিজের সহিত স্ত্রীর আচরণগুলা মিলাইয়া নিজেকে একটা ভণ্ড বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল। তাঁহারা পরার্থপরতার মুখস পরিয়া—বাহাবা লইবার জন্যই গরীবের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের সত্যকার প্রাণের যোগ কতটুকু আছে? কিছুই না, তাঁহারা গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার অছিলায় নিজেদের নাম কিনিতে চান মাত্র।—ধিক! আর এই নারী—কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের ভিতরকার সমস্ত শক্তিটুকু, নিজের প্রভাবে জাগাইয়া তুলিয়া—এতগুলি প্রাণীর সুখ সুবিধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, নিঃশব্দে এত কল্যাণ সাধন করিতেছে—তিনি বর্ব্বর, তাই এই কাজ হইতে এমন লোককে থামাইয়া রাখিয়া মান বাঁচাইতে চাহেন?

মহেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমস্ত মন্তব্য ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিলেন না, বাধা দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো?"

তাহারা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে কি ধর্ম্মাবতার? আমাদের শোবার জায়গা অবধি হয়ে গেছে, শুধু আপনার জন্যে আমরা...।"

তাহাদের শয়নের আদেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে উপরে চলিলেন. ভৃত্য আলো লইয়া অনুগামী হইতেছিল, তিনি হস্তেঙ্গিতে বারণ করিলেন,—"আজ চাঁদের আলো আছে! সিঁড়ি দেখা যাইবে।"

উপরে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া তিনি কক্ষে ঢুকিলেন, দেখিলেন আনন্দ-ফুল্ল-মুখে উৎসাহিত-কণ্ঠে অনর্গল বকিতে বকিতে দীনুয়া পরম আরামে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছে, আর সদ্যধৌত বস্ত্র পরিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে এক হিন্দুস্থানী রমণী বাতাস দিয়া

কড়াইয়ের আগুনের ছাই উড়াইতেছে, আর তাহার ওধারে বসিয়া—স্নেহাপ্লুত বদনে ক্রোড়স্থ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে ও কে—মনীষা স্বয়ং!

মহেন্দ্রনাথের বুকে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল, মনীষার এ মনোহারিণী মূর্ত্তি তিনি যে আজ তিন বৎসর দেখেন নাই, আজ তিন বৎসর সে যে পুত্রহারা, উচ্ছৃঙ্খলা, আত্মবিস্মৃতা, যেন কেমন একরকমের মানুষ হইয়া আছে,—আজ এতদিনের পর কোন শক্তিশালী প্রাণ,—তাহার সে লুপ্তগৌরব লাবণ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়া—তাহাকে আবার ঐ সংহত সুন্দর নারীত্বে—ঐ স্মিতোজ্জ্বল মাতৃত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিল? কে সে পরাক্রমশালী মহাশূর?

মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে কি এক অদ্ভুত বিচিত্র-রঞ্জিত শক্তিস্পর্শে অকস্মাৎ রুদ্ধ নির্ঝর খুলিয়া অপার্থিব শান্তির উৎস ছুটিল, তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে শুধু একটী উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল—ধন্য ভগবান।

মহেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র দীনুয়ার মুখরিত চাঞ্চল্য চকিতে অন্তর্হিত হইল, সেই শিশুর জননী হিন্দুস্থানী রমণী ত্রস্তে পাখা ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর মনীষা মাথায় কাপড় তুলিয়া রুগ্ন শিশুকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্রনাথ প্রীতি-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন, "থাক থাক মনীষা, ঐখানেই থাক, উঠো না—তোমার ও-মূর্ত্তি যে এত সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী তা আমি জানতাম না। না বুঝে অন্যায় ভাবে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, ক্ষমা করো।"

মনীষা শুধু একবার কৃতজ্ঞ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তারপর শান্তস্বরে বলিল, "এস।"

আদেশ পালন

প্রতিবেশীরা সকলেই স্বীকার কবিত যে ভাইলালজী রূপে গুণে এবং বুদ্ধিবত্তায় গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। প্রশংসার ব্যাপকতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মাতব্বর, সম্পদশালী বৃদ্ধ পঞ্চায়তের সুনজরে পড়ায়, চারিদিক হইতে ভাইলালের সম্ভ্রম ও সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পঞ্চায়তের পরামর্শে মন্ত্রী, এবং কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ভাইলাল দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

মানবের ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য যখন পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠে তখন মানুষের বড় ভয়ঙ্কর সময়, কারণ তাহার তেজে কেহ বা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, কেহ বা ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরে; কিন্তু দুই অবস্থার যেটাই আসুক, কোনোটাই নিস্তরঙ্গ চাঞ্চল্যহীন নয়, দুই-ই প্রখর উদ্দামতা-পূর্ণ। অনভিজ্ঞতার অপযশে চিত্তদাহ যতই তীব্র হউক, মানুষ তাহা সামলাইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতার সুযশে অনেক সময় শান্তপ্রকৃতি লোকের মস্তিষ্ক সাংঘাতিক রকম বিচলিত হয়, এবং তাহার পরিণামও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভু রাওয়ের কন্যার সহিত ভাইলালের বিবাহের সমস্তই পাকাপাকি ঠিক্‌ঠাক, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সকলে একদিন হঠাৎ শুনিল যে, বিবাহ হইবে না।

"কেন?"—এই 'কেন' প্রশ্নটার সদুত্তর অনেক সময় ঠিকরূপে ব্যক্ত হয় না;— বিকৃত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেও দেখা যায়। পাড়ার লোকেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া বিস্তর দুশ্চিন্তার পর স্থির করিল "বরের কন্যা পছন্দ নহে", এবং মেয়ে-মহলে জনান্তিকের মধ্য দিয়া একটা গোপন রহস্য প্রচার হইয়া গেল যে...।

কেবল পাড়ার বৃদ্ধ বহেলজী বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলেন যে কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ভাইলাল বিবাহ করিতে নারাজ। শুধু প্রভু রাওয়ের কন্যা বলিয়া নহে, সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এবং ইহার প্রতিবাদে সে আত্মীয় বন্ধু সকলেরই যুক্তি-তর্কের উত্তরে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়াছে, বিবাহ সে করিবে না, কিছুতেই না...।

আশাভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রভু রাও বয়স্থা কন্যাটির সদগতির জন্য, আবার নূতন করিয়া পাত্রের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু পাত্র মেলা যে দুর্ঘট।

বিশেষতঃ, কনকাঙ্গ মেয়েটি নিতান্ত ছোট নহে; বাল্য-বিবাহ-প্রচলিত মহারাষ্ট্র সমাজের নিয়মানুসারে ধরিতে গেলে তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভাইলালের ভরসায় তাহার পিতা মাতা এ পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমন সময় ভাইলাল হঠাৎ বাঁকিয়া বসায়, একটা মস্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। সকলের কাছেই ব্যাপারটা কুহেলিকাচ্ছন্ন নিগূঢ় রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ বড় আশ্চর্য্য!

শৈশব হইতে একই জল-বায়ুর ভিতর দিয়া উভয়ের জীবন গঠিত বলিয়া,—প্রভু রাওয়ের হিতৈষীবর্গ ভাইলালকে খুব বেশীরকম চাপাচাপি করিতেও ছাড়িলেন না, কিন্তু ফল কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না। লোকটা সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সমানে তাজা রহিল। হিতৈষীরা হাল ছাড়িলেন, বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, —"কিছু বোঝা যাচ্ছে না।..."

দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

২

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ভুঁইয়াদের পাথরের বাঁধা ঘাটে পৈঠার উপর কতকগুলা ভিজা কাপড় স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, জলের ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কনক অন্যমনস্কভাবে, হাত পা রগ্‌ড়াইতেছে, সন্ধ্যা সমাগমের বহু পূর্ব্বেই ঘাটের যাত্রীরা আপন আপন কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। নির্জ্জন ঘাটে একা রহিল কনক।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কনকের তবুও উঠিবার তাড়া নাই। সারাদিনের গ্রীষ্ম গুমোটের পর এখন সদয় হইয়া সন্ধ্যা সমীরণ মৃদু হিল্লোলে মধুরভাবে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুখময় স্নিগ্ধ স্পর্শে বালিকার প্রাণের অতীতের কত ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া, কত পুরাতন—দূরস্থকে, নূতন—নিকটস্থ করিয়া আনিতেছে, কতদিনের কত অস্পষ্ট চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মনের চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে, তাহার

ঠিকানা নাই! মৃদুমন্দ ফুরফুরে হাওয়া সারা প্রাণটাকে কেমন এক অজ্ঞাত মত্ততায় বিহুল করিয়া তুলিয়াছে! কনক অন্যমনস্ক—বড় অন্যমনস্ক!

আহা কতদিনের কত হর্ষ-পুলক-ভরা মধুময় স্মৃতি সৌরভজড়িত, ভুঁইয়াদের এই বাগান, এই পাথর-বাঁধা ঘাট, কত নিস্তব্ধ নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে এই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ঘাটে বসিয়া ভাইলাল তাহার সাধের বাঁশীটিতে মধুর তান ধরিয়া সুর-লহরীর কম্পন ক্রীড়নে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিগন্ত-বিস্তৃত ঐ প্রান্তরে, কৌমুদী-কিরণ-প্লাবিত কত মধুর যামিনীতে সুকণ্ঠ ভাইলাল চিত্তদ্রবকারী সঙ্গীতে, নিপুণ সুর-ঝঙ্কার তুলিয়া শৈশব সঙ্গীদের তরল মস্তিষ্কে কতদিন কত নব নব আবেশের সঞ্চার করিয়াছে! কত অন্ধকার রাত্রে 'পুলাঙ্গ' তৈলের দীপোজ্জ্বল কক্ষে, গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে উপবিষ্ট গল্পশ্রবণোৎসুক পাড়ার ছেলের দলকে, ভাইলাল কত ঝড়বৃষ্টি বজ্রঝঞ্ঝনা-মুখরিত, কত বিদ্যুৎ-চমকিত ঘটনা-বৈচিত্র্য রঞ্জিত কাহিনীর,—কত দৈত্য, দানা, ভূত-প্রেত সমাচ্ছন্ন আখ্যায়িকার অদ্ভুত আজগুবী বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভয় বিস্ময় ও আনন্দ উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে; আজ এখন আর কে তাহার হিসাব দিতে পারে? সেই একদিন গিয়াছে, —আর এই একদিন চলিতেছে।

মানুষের নির্দ্দয়তার বহরের সহিত আকাশের অসীমতার পরিমাণ করিবার জন্যই বোধ হয় কনক আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল। অতীতকে আজ যেন অদৃষ্টের একটা বজ্ররূঢ় পরিহাস বলিয়া মনে হইল! কনকের সারা বুকটা আলোড়িত করিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস অন্তরের গোপন গুহা হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া অলক্ষ্যে বায়ু-স্তরে মিলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার আঁধার যখন খুব ঘনাইয়া আসিল তখন কনকের চমক ভাঙিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ললিত লাবণ্য-সুন্দর যৌবন-বিজলী মণ্ডিত মনোহর, ক্ষীণ তনুলতায় সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া জড়াইল। পৈঁঠার উপরকার কাপড়গুলায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল সিঞ্চন করিয়া, সেগুলা আবার জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিল; তারপর কঠিন পাষাণের উপর জলসিক্ত চরণের কোমল কমনীয় রেখা অঙ্কিত করিয়া, সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল।

ঘাটের উপর লতামণ্ডপ। লতামণ্ডপের বাহিরে, রাস্তার ওধারে একটা গাছের গুঁড়িতে ডান পা তুলিয়া, এক ব্যক্তি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিতেছিল, বোধ হয় তাহার ঘাটে নামিবার প্রয়োজন আছে, স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া এতক্ষণ নামিতে পারে নাই, এখানে অপেক্ষা করিতেছে।

বারম্বার চরণক্ষেপে আহত, সিক্ত বস্ত্রের শব্দ-সংঘাতে আকর্ষিতচিত্ত লোকটি ফিরিয়া তাকাইল। চকিতে দৃষ্টিবিনিময়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া কনক দাঁড়াইল। উভয়েই স্তব্ধ বিস্মিত!

লোকটি ভাইলাল।

চকিতে কাঁধের উপর হইতে ভিজা কাপড়গুলা টানিয়া থরকম্পিত বুকের কাছে প্রাণপণে গুটাইয়া ধরিয়া, লতামণ্ডপের পাশে ভর দিয়া—একটু হেলিয়া কনক দাঁড়াইল! কি সুন্দর মৃত বঙ্কিম ভঙ্গী! সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ লালসালুব্ধ ভাইলাল বিস্ফারিত-নয়নে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকের নীচে, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড

ঝঞ্ঝাবায়ু নিমেষে তাহার চিত্ত-সাগরে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল।

"ভাইলাল, তুমি! ক্ষমা কর, তোমায় একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে, দেখা পাইনি এদ্দিন, তাই বলতে পারিনি,—আজ এখন—", একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরভাবে কনক বলিল, "বলব কি ভাইলাল আজ?"

একটা অব্যক্ত বেদনা ভাইলালের হৃদয়টা মর্ম্মন্তুদ নিস্পেষণে নিঃশব্দে গুঁড়াইয়া ফেলিল! ব্যথাবিহ্বল ভাইলাল একটি কথাও বলিতে পারিল না! স্তব্ধভাবে রহিল! তাহাকে নীরব দেখিয়া ঈষৎ আহতভাবে কনক বলিয়া উঠিল, "তুমি অন্য কিছু ভেবো না, আমি অন্য সম্বন্ধে তোমায় কিছু অনুরোধ করিতে আসিনি, আমি তোমার জন্যেই তোমায় কিছু বলতে চাই—"

কুণ্ঠিত মূঢ় ভাইলাল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "কি?"—বেশী বলিতে পারিল না।

নম্রকোমলকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"জানি, এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার চেয়ে না করাই ভাল, তবু জিজ্ঞাসা করচি ভাইলাল, মার্জ্জনা কর, সত্যি করে বল ভাইলাল—", কনকের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল, সে থামিল! আরক্তমুখে একবার রক্তকিরণআভামণ্ডিত অস্তগামী সূর্য্যের লুপ্তপ্রায় শেষ রশ্মিটুকুর পানে চাহিল! তখনো দিক্‌চক্রবালের ক্ষীণ উজ্জ্বলতাটুকু সন্ধ্যা রাক্ষসীর গাঢ় মলিনতার মাঝে ঢাকিয়া ফেলিতে, একটু—অতি সামান্য একটু দেরী আছে। কনক কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নতদৃষ্টিতে বলিল, —"সত্যি করে বল ভাইলাল, তোমার চরিত্র—"

আতঙ্কশঙ্কিত ভাইলাল জোর করিয়া বিদ্রূপের হাসি টানিয়া, অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "পাগল, কনু পাগল!—তুমি কার কাছে ওসব গুলিখোরী গল্প শুনেছ?"

তীব্র-তেজ-বর্ষী স্থির দৃষ্টি ভাইলালের চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া, ধীরস্বরে কনক বলিল,—"কারু কথা বিশ্বাস করিনে ভাইলাল, শুনি মাত্র সংসারে তোমার ওপর,—শুধু তোমার ওপর আমার অটল বিশ্বাস। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমিই বল—সত্যি বল ভাইলাল, যা শুনি তা সবই কি মিথ্যে?"

সে জ্বালাময় দৃষ্টির সামনে ভাইলাল যেন ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরিল, তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, বিবর্ণমুখে হৃতবাক্ হতবুদ্ধির মত সে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার চক্ষু তুলিবার সাহস হইল না!

তাহাকে নীরব দেখিয়া গম্ভীর ক্ষুব্ধস্বরে কনক বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমার কেউ নই ভাইলাল, তোমায় কোনো কথা বলবার অধিকার আমি জগতের কাছে পাইনি, কিন্তু তবু ভাইলাল, আমি, তোমার চিরমঙ্গলপ্রার্থিনী শৈশবসঙ্গিনী, তাই আজ তোমারই অন্যায়ের জন্য তোমায় সতর্ক করতে এসেছি ; এতে হয় তো আমি নিজের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছি, কিন্তু সেও তোমার কাছে,—তুমি আমার সে ত্রুটী ক্ষমা কোর ভাইলাল, ভাল হোক মন্দ হোক, আমি সত্যটা জান্‌তে চাই।"

কনক একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"উপেক্ষার নির্ম্মম কশাঘাত অগ্রাহ্য করে, অপমানের পশরা মাথায় বয়ে নির্লজ্জা আমি, তোমার কাছে আজ অনেকদিনের পর সেই পুরোণা কনক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি ; বড় মর্ম্মাহত হয়েই এসেছি, এ যদি

তোমার মঙ্গল উন্নতির সংবাদ হোত, তা হলে সন্তুষ্টচিত্তে, চিরদিনের জন্য তোমার দৃষ্টির সীমানার বাইরেই থাক্‌তুম, আর জীবনে ফিরেও তাকাতুম না!—"

বজ্রাঙ্কিত অভিমানভরা মর্ম্মস্পর্শী মনোরম স্বর! মুহ্যমান ভাইলালের আপাদমস্তকে প্রখর অগ্নিশিখা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুই মুহূর্ত্ত উত্তর-প্রত্যাশায় নীরব থাকিয়া সহসা মর্ম্মভেদী নৈরাশ্যে, যন্ত্রণা-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কনক বলিয়া উঠিল, "জানি ভাইলাল, তোমায় এ প্রশ্ন করবার অনেক আগেই জানি, তুমি এ কথার জবাব দিতে পারবে না!—"

মুহূর্ত্তে দুটি হৃদয়ের শান্ত ধমনীতে, বহ্নিময় মহাবজ্র বিস্ফুরিত হইয়া প্রলয়ের করাল দুন্দুভি বাজাইয়া তুলিল! বহির্জগৎ আতঙ্কে আড়ষ্ট!

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া আকস্মিক উত্তেজনা সবলে সংহত করিয়া, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কনক আবার বলিল,— "তুমি অন্ধ, তাই বুঝছ না ভাইলাল, কিন্তু এর পরিণাম বড় ভয়ানক হবে। এখনো ফেরো ভাইলাল, এখনো ফেরো, আমার কথা রাখতে চেষ্টা কোরো, লক্ষ্মীছাড়া নেশায় আত্মহারা হয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ—সেই নির্ব্বোধ বিধবার সর্ব্বনাশ কোরো না,—"

"কে সে?" কলঙ্কপঙ্কিল জীবনের দীপ্তসত্যের গ্লানি, বুঝি মৃত্যুভীতির অপেক্ষাও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেশী বিভীষিকাময়! তাই মৃত্যুর মুখেও মরিয়া হইয়া ভাইলাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, অন্তিম শক্তিতে বলিল, "কার কথা বলছ, কে সে?"

ঘৃণার স্বরে কনক বলিল—"কে সে! প্রবঞ্চক তুমি, জান না কে সে? তোমাদের পঞ্চায়েতের বিধবা যুবতী কন্যা।"

ত্রাসব্যাকুল ভাইলাল বলিয়া উঠিল,—"মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা, এসব যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনক ভাইলালের মুখের দিকে দুই মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল ; তারপর তীব্র কঠিন স্বরে বলিল, "অন্যে যদি এ-রকম মিথ্যে বলতো, তবে তার মুখের ওপর থাব্‌ড়া দিয়ে চলে আসতুম, তুমিও আমায় প্রবঞ্চনা করলে ভাইলাল, ছিঃ! তোমার মুখ-চোখ সবাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে, তবু তুমি আমায় পরিষ্কার বোঝাতে চাও ভাইলাল, বেশ।"

বেগে মুখ ফিরাইয়া কনক দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। তাহার মুখ হইতে শেষ কথা ভাইলাল শুনিল—"তবু পার তো এখনো ফেরবার চেষ্টা কোরো।"

৩

আবার আগেকার মতই সন্ধ্যা সকাল যথাক্রমে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দেখা গেল যে, পঞ্চায়েত পরিবারের একটা কলঙ্ককালিমা জড়িত অস্ফুট গুঞ্জন, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষীয়সীদিগের পর-চর্চ্চায় মধ্যবয়স্কাদিগের হাস্য-পরিহাসে চরিত্রহীন নিষ্কর্ম্মা নরনারীগণের অশ্লীল কুৎসা-কৌতুকে, ইতর সাধারণের অনাবশ্যক ব্যঙ্গ-প্রাবল্যে, কথাটা 'কানাঘুসার' মধ্য দিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার এবং তাহা লইয়া গ্লানি আন্দোলন করিবার

লোকের অভাব নাই। তাহার উপর সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তরে-বাহিরে সহস্র সৌহৃদ্য থাকিলেও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে প্রায়ই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে আততায়ী পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। এ জগতে বিধাতার অমোঘ বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘ্য। অন্যায়ের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের নিঃশ্বাসে তাহার পতন অনিবার্য্য। অধর্ম্মের মেঘের অন্তরালে যাহার জীবন, ধর্ম্মের বিদ্যুৎবিকাশে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাই ঘটিল, বিপুল বৈভবশালী, গ্রামের মস্তকস্বরূপ, পঞ্চায়েতের স্ব-ইচ্ছা-সম্পন্না, স্বাধীনা বিলাসিনী কন্যার উপাসক জুটিয়াছিল ঢের, কাজেই বিপদের গুরুত্বও বেশী।

বৃদ্ধ পঞ্চায়েত নিরীহ নির্ব্বোধ গোবেচারা ধরণের মানুষ। অধীনস্থ কাহাকেও হাতে পাইলে চোখ রাঙাইয়া হাঁক ডাক করিবার যতই ক্ষমতা তাঁহার থাকুক না কেন, সংসারের কুটিল মারপ্যাঁচের মধ্যে মাথা গলাইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। সারা গ্রামটার শৃঙ্খলাসাধনের জন্য তাঁহার সমস্ত বুদ্ধিশক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিবার অবকাশ পাইত না! দৈবাৎ বাতাসের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কোন কথা কানে ঢুকিলেও প্রাণে ঠাঁই পাইত না। আর মুখোমুখি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে এমন দ্বি-শিরবিশিষ্ট দুঃসাহসী জীব সে গ্রামে তখনো জন্মগ্রহণ করে নাই।

অসৎ-পথের আকর্ষণও যেমন তীব্র, বিরক্তি-অবসাদও ততোধিক তীব্র। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জগৎটা ভাইলালের কাছে তীক্ষ্ণ কটু বিস্বাদের আব্‌হাওয়ায় ভরিয়া গেল। কুহকের মোহ-পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য, ক্রমে তাহার মনে দারুণ অধীরতা বাড়িতে লাগিল—কিন্তু ভবিষ্যৎ! সে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, এখন যদি ফিরিতে চায়, তাহা হইলে মহা বিপত্তি ; ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, অন্যায়ের সংস্রব এড়াইয়া এখন সন্তর্পণে চলিতে হইলে, অনেকেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন, চাই কি পঞ্চায়েতের কোপে পড়িতেও পারে—তখন সে কিসের বলে আত্মরক্ষা করিবে? সে যে নিজের শক্তি পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, এখন উপায়?

দুশ্চিন্তালাঞ্ছিত ভাইলাল শুষ্কমুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ওদিকে সেদিনের সেই ঘটনায়, কনকের কনকোজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য নবীন আবেশে নূতন অপরূপতায়, তাহাকে পলে-পলে তিলে-তিলে আবিষ্ট করিয়া নতুন আকর্ষণে টানিতে লাগিল! হায়, সে কি করিবে!

দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত যুবক জানুর ভিতর মাথা রাখিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল ভাবিতে লাগিল, অকূল অসীম চিন্তার মাঝে—কনকের সেই বাণী থাকিয়া থাকিয়া অন্তর্জগৎ চমকিত করিয়া বজ্ররূঢ়স্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"ফেরো ফেরো, এখনো ফেরো!"

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রভু রাও কোনোই কূল-কিনারা করিতে পারিল না। কনক আজিও অনূঢ়া।

রাসপূর্ণিমার দিন বৈকালে পাড়ার সব ছেলে-মেয়েদের জড়ো করিয়া বিঠোবা দর্শন করিতে যাইবার সময়, বৃদ্ধা নান্‌কীর মা কনককেও ডাকিল। কনক গৃহ-কার্য্য সব সারিয়া তখন পিতার জলখাবার সাজাইতেছিল, নান্‌কীর মা, তাহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়া, ছেলের পাল লইয়া, বহুবিধ শব্দ বৈচিত্র্যে নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া দেবদর্শনে চলিল। গ্রাম হইতে সিকি ক্রোস তফাতে বিঠোবাদেবের মন্দির।

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া কনক বাহির হইল। তাহার পূর্ব্বগামীগণ তখন অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

পথ-ঘাট সবই জানা, কনক সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। হেমন্তের নূতন হাওয়ার মাঝে, ললিত-লাবণ্য-হিল্লোলিত তরুণ তনুলতা, মৃদু-কম্পনশীল বসন্ত-সৌরভের মত বহিয়া চলিল। কঠিন নিস্তব্ধ রাজপথ, সেই শুভ্র কোমল পায়ের তলায় বুক পাতিয়া, মোহমুগ্ধের মত নীরবে পড়িয়া রহিল।

দুপাশে সারি বাঁধিয়া গাছগুলি সাজানো। স্বল্পান্ধকারে সমাচ্ছন্ন গ্রামের বাঁধা পথ ছাড়িয়া, কনক ছুটিতে ছুটিতে শেষে উন্মুক্ত আকাশের তলে, সুদূর বিস্তৃত মাঠে অনেকখানি আলোকের নীচে—অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল।

আঃ, কি সুন্দর খোলা জায়গা! এখানকার হাওয়ায় একটা নিশ্বাস টানিয়া লইলেই সারা প্রাণ অপরিসীম তৃপ্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠে! আঃ, এখানকার চারিদিকেই যেন অনন্ত অসীম মধুর মুক্তি, সান্ত্বনা! কি চমৎকার!

ছুটিতে ছুটিতে ঝোপের পাশটা ছাড়াইয়া কনক হঠাৎ একটা লোকের সামনে আসিয়া পড়িল, লোকটা বাঁ দিকের ঝোপের আড়ালের এই রাস্তা ধরিয়াই বরাবর এইদিকে আসিতেছিল বলিয়া কনক তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

আরে ছ্যাঃ!—একেবারে চোখোচোখী! ভাইলাল!

ঝাঁ করিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে পড়িয়া একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট! আর ফিরিয়া চাহিলও না। অদূরেই সঙ্গীরা,—কনক ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের কাছে গিয়া পড়িল।

দুঃসহ লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্ব-শরীরে তখন অসহ্য জ্বালাময় অগ্নিস্রোত বহিতেছিল! ছি ছি, ভাইলালের সঙ্গে আবার চোখোচোখী হইল! সে যে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! অতর্কিতে সংঘটিত ক্ষণিকের এই সামান্য বিড়ম্বনাটুকু কত ভয়ানক, কি সাংঘাতিক! একটা তীক্ষ্ণ ধিক্কারে ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় কনকের সারা বুকটা যেন খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল! কনক মুখ তুলিয়া কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিল না ; নীরবে নতশিরে চলিল।

যথাসময়ে বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া সকলে বিগ্রহকে প্রণাম করিল। তখনো সন্ধ্যা-আরতির দেরী আছে দেখিয়া, নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিল। সেখানে একজন সাধু 'অভাঙ্গ' গাহিতেছিলেন, অনেক লোক বসিয়া শুনিতেছিল ; তাহারাও শুনিতে লাগিল।

উগ্র-বৈরাগ্য-উদ্দীপ্ত, তীব্র-ভক্তি-মাদক পূর্ণ, মধুর হইতে মধুরতম ভজন, সংসার-বিতৃষ্ণ ভক্তের প্রেমবিগলিত স্বরে অন্তরের গভীর আবেগ উচ্ছ্বাস! দেবতার পদে উন্মুক্ত আত্মনিবেদন! কি সুন্দর,—শুনিতে শুনিতে কনকের তরুণ মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাগব্যাকুলতার

প্রচণ্ড বজ্র ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে কুহেলিকা ঘোর কাটিয়া সারা জগৎ আশার পুলকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়া আনন্দ-চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। সে কি গভীর বিস্ময়! কি নিবিড় সান্ত্বনা!—মানুষ মানুষকে শঠতায় সর্ব্বস্বান্ত করিবে! প্রতারণায় পরাভূত করিবে! কি ভুল, কি ভুল!—মানুষ নিজের সহিত নিজে যে শত্রুতা সাধিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর—পরে আসিয়া অনিষ্ট করিবার স্থান নাই, মানুষ বোঝে না, তাই হীনতার চরণে মাথা খুঁড়িয়া মরে, ধিক্!

বিক্ষোভ-উত্তপ্ত জীবনে অতি ধীরে, অতি শান্তভাবে অপার্থিব শান্তির বসন্ত আসিল! নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে মঙ্গলামৃত বর্ষিত হইল! আশায়, উজ্জ্বল-উৎসাহে তাহার সমস্ত চিত্ত মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

কে বলে মানুষের জীবন ব্যর্থ!—কে বলে মানুষের আর উপায় নাই! ঐ ত সম্মুখে উপায়। ঐ যে সব্বার্থসাধক সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতা, অমর সার্থকতার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবির্ভূত। তবে কাকে ভয়, কিসের সঙ্কোচ, কার মুখাপেক্ষা!—সে আত্মত্যাগের মাঝে আপনাকে জয় করিয়া লইবে, সিদ্ধির সাধনায় আপনাকে পূর্ণ করিয়া লইবে। হে ভগবান, শক্তি দাও।

৫

কনকের শিরায় শিরায় মত্ত আবেগের প্রখর তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া আকুল উম্মাদনায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কনক নির্জ্জীব পুতুলের মত স্থির!

অনেকক্ষণ পরে কাঁসর ঘণ্টার ঘনঘোর রোলে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সকলে গলবস্ত্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবেশবিহ্বল কনক মুদিতচক্ষে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইল। দেখিল সেখানেও প্রেমের জ্যোতি-মণ্ডিত ভগবান বিঠোবার উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তি! সে কি চমৎকার! সদ্য উচ্ছ্বসিত আনন্দ-আবেগে অধীর কনক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, একাগ্র নিষ্ঠায় আপনাকে সংযত করিয়া সেই অন্তরদেবতাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

বাহিরের কোলাহলমুখর জগৎ দূর দুরান্তের অন্ধকার মধ্যে সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া গেল। এ বিচ্ছিন্নতার মাঝে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! এখন মানুষের সহিত চোখোচোখী হইবার ভয় তাহার নাই! এখন তাহাকে বিচলিত করিবার কেহ নাই,—এখন সে তাহার দেবতার জন্য ছুটি পাইয়াছে, এখন সে নির্ভয়!

আরতি শেষ হইল। সকলে দেবোদ্দেশে মস্তক নত করিল। আত্মহারা কনকের মস্তক আকুল আবেগে একেবারে ঠিক যেন ইষ্টদেবতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

আবার ভজন আরম্ভ হইল, সকলে শুনিতে বসিল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেল, কনককেও ডাকিল, কনক শুনিল না, উঠিল না— বুঝি সে-শক্তি তখন তাহার ছিল না, তখন তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া —ভজন ছাড়িয়া ঐ লোকালোক পারে, এক অজানা রাজ্যে বিহার করিতেছিল।

নান্‌কীর মা ভাবিল, কনক গানের নেশায় মাতিয়াছে, সে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে না ; থাকুক, ফিরিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া লইলেই হইবে। তাহারা মন্দির প্রদক্ষিণ

করিয়া আসিয়া আবার কনককে ডাকিল, কনক তখনো বাহ্যজ্ঞানরহিত তন্ময় তদগত! হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইল, মুখের কাছে হেঁট হইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, বৃদ্ধা নান্‌কীর মা, আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিল। এতক্ষণে তাহার চৈতন্য ফিরিল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুপ্তোত্থিতের মত বিস্তৃত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"মন্দির প্রদক্ষিণ!" "ওমা আমরা যে এই প্রদক্ষিণ করে এলুম।" "তোমরা প্রদক্ষিণ করেছ? আচ্ছা থাক, আমি শীগ্‌গির প্রদক্ষিণ করে আস্‌ছি।"

কি হাঁদা মেয়ে! তাহারা যখন ডাকিল তখন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর এখন একলা চলিল! নান্‌কীর মা বলিল, "তবে প্রদক্ষিণ করে এস, আমরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর একবার ঘুরে যাই—।" নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া ভিতরে চলিল।

কনক বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কয়বার প্রদক্ষিণ করা হইল তাহার হুঁস নাই, কনক আপন মনে মন্দির ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়া একলাই ঝোঁকের ভরে চলিল। নানকীর মার কথা তাহার মনেই নাই।

সোজা রাস্তা। বরাবর মাঠের রাস্তা পার হইয়া আসিয়া কনক গ্রাম্যপথ ধরিল ; সে যে কতখানি রাস্তা পার হইয়া এখন কোনখানে আসিয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আপন মনেই চলিয়াছে। গভীর তন্ময়তায় সে একেবারে মুহ্যমান।

বিস্তৃত প্রান্তরে, আলোর উপর আলো ঢালিয়া পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে হাসিতেছিল ; কনক এতক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া, নিজের ছায়া পিছনে ফেলিয়া, বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। এখন সহসা গ্রাম্যপথে উঠিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপত্রান্তরালবিচ্যুত, খণ্ড বিভক্ত, অস্পষ্ট আলো দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। তাই ত, আসিয়াছে কোথা! এরই মধ্যে এতখানি!

সঙ্গীরা কোথা? কনক পিছন দিকে চাহিল, কেহ নাই! নির্জ্জন পথে সে শুধু একাকী! —কনক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাই ত, নানকীর মা যে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিল। তবে কি তাহারা নাই! না, তাহাকে একলা ফেলিয়া তো তাহারা যাইবে না!

কনক সাম্‌নের রাস্তার দিকে চাহিল, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে। কনক উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল, "কে গা?"

বিধাতার বিড়ম্বনা! হঠাৎ সেই অস্ফুট অন্ধকার ভেদ করিয়া—উদ্দামচাঞ্চল্যভরা পবনের মত ছুটিয়া আসিয়া লোকটা সবলে কনকের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল এবং আবেগবিকম্পিত-কণ্ঠে স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "কনু, কনু তুমি—"

যুগপৎ সংঘটিত বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার উপর্য্যুপরি সংঘাতে কনক প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল। তাহার পর অকস্মাৎ সবেগে এক ঝাপ্টা দিয়া সেই লোকটার কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া ত্রস্ত কুরঙ্গিণীর মত লঘু লম্ফে, নিমেষ-মধ্যে পশ্চাতে হটিল ; বজ্রকঠোর স্বরে ডাকিল, "ভাইলাল!"

"হাঁ কনু, ভয় নাই, আমি ভাইলাল, আমি,—আমি তোমায় বড়—"

তীব্র কঠোর ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "আবার—আবার প্রবঞ্চনা! কৃতঘ্ন, ধূর্ত্ত, আবার ফের!—সরে দাঁড়াও!"

পিছু হটিয়া কাতরকণ্ঠে ভাইলাল বলিল, "না না কনু, ছলনা নয়, আমি যথার্থই

বল্‌ছি, কিন্তু কি করে তোমায় বোঝাবো? কনু, কি বিপদেই আমি পড়েছি! ক্ষমতাশীলের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্য এরকম গর্হিত কাজে—জেনে শুনে পাপে ডুবে আছি, ক্ষমা কর কনু, ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর—তারপর আমি তোমারি—", না না ও দুর্ব্বলতার গ্লানি আর নয়, মানুষ মানুষের আত্মীয়তা-প্রয়াসী!—ভুল! চক্ষের জল, কণ্ঠের কাতরতা, ওসব তো দুঃখ অভিনয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন! সেও তো এতদিন অপরিসীম ব্যাকুলতায় ঐ ব্যর্থতার পশ্চাতে যথেষ্ট খাটিয়াছে, তবে তবে...! নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী হাসি কনকের অধরে ফুটিয়া উঠিল। —"ভাইলাল, তুমি শুধু নরাধম নও, তুমি মহা অপদার্থ! কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ভাইলাল, আমায় আর প্রলোভনে লুব্ধ কর্‌তে পার্‌বে না, যা হবার তা হয়েছে ; কিন্তু তবুও বল্‌ছি, উপরদিকে চাও, এ জীবনের পরেও জীবন আছে, মৃত্যুর পরও মৃত্যু আছে, এখনো ফেরো, এখনো আপনাকে সামলাও।"

কনক তীরবেগে চলিয়া গেল!

কুলিশনির্ঘোষে জ্বলন্ত জ্বালাময়ী কঠোর আদেশ! বজ্রাহতপ্রায় ভাইলাল স্তব্ধ হতবুদ্ধি!

৬

তাহার দিনকয়েক পরেই একদিন পঞ্চায়েত-শক্তির প্রবল উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতভাগা ভাইলাল দেশ ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার হঠাৎ নিরুদ্দেশের হুজুক লইয়া গ্রামে দিন কতক খুব আন্দোলন চলিল, কারণ পরিস্ফুট না হইলেও—মাতব্বর লোকেরা নিজেদের তীক্ষ্ণধার কল্পনাশক্তির সাহায্যে চোখ টেপাটেপী করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন...।

কনক সকলই শুনিল,; সে গভীর আশ্বস্তভাবে বিঠোবার চরণোদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তোমার অনন্ত করুণা প্রভু!

দিনকয়েকের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, প্রভু রাওয়ের কন্যা আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবান বিঠোবাদেবের মন্দিরে সেবাব্রতধারিণী হইবে। সকলে অবাক!—কথাটা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল, কেহ বলিল দুর্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল নির্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল...।

প্রভু রাওএর পরিবারবর্গ কিন্তু নিস্তব্ধ ; প্রত্যুত্তর-প্রত্যাশী বিজ্ঞের দল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

তারপর সত্যসত্যই এক উজ্জ্বল প্রভাতে ততোধিক পুণ্যোজ্জ্বল বেশে—গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কনক, দেবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া পল্লী ছাড়িয়া, আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া, বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইল।

৭

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। পৃথিবীর কাজ যেমনকার তেমনই চলিতেছে,

অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত-কন্যার মৃত্যু হইয়াছ, এবং পঞ্চায়েত বদল হইয়াছে। প্রভু রাওএর পরিবার আগের মতই আছে ; ভাইলাল আজো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রাতঃকাল। সদ্যস্নাতা গৈরিকধারিণী, সতীত্ব-লাবণ্য-উদ্ভাসিতা, পুণ্য-গৌরবে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মচারিণী কনক বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ফুলবাগানে দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সমস্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়া কনক পরিপূর্ণ শোভা সুন্দর সাজির পানে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। সে কবে এমনিভাবে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইযা এমনি করিয়া সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য একত্র করিয়া হৃদয়-দেবতার চরণে পরিপূর্ণ অসঙ্কোচে দান করিয়া নিজের কাছে মুক্ত হইবে!

মানবে যে মহত্ত্বের মূল্য বোঝে না, যে পূত পূজার্ঘ্য তাহারা চরণে দলিয়া যায়, সেই অনাদৃত দান,—বড় অভিমানে বড় বেদনায় সে দেবতার দ্বারে বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখানেও যেন কি অব্যক্ত দ্বিধা জাগিতেছে! এ ভুল কেন ভগবান।—এ ভ্রান্তি সংহার কর, এ দানের সঙ্গে সে দানের পার্থক্য আকাশ পাতাল। সে ছিল উগ্র-শক্তি সুরা, আর এ যে পিষ্ট হৃদয়ের সার—সুধা! এ যে সন্তাপের আগুনে শোধন করিয়া লইয়াছে,—এ হৃদয়-শতদলের স্নিগ্ধ পরিমল-সম্ভার, এ শুধু তোমার! সারা পৃথিবীর মধ্যে— জীবনের শেষের দান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লইয়া ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে, ওগো ভগবান, ইহার অধিকারী শুধু তুমিই! তবে কেন এখনো এ ব্যবধান, কেন এখনো এ কুণ্ঠা!

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা তুলিয়া কনক মন্দিরের পানে, বিহ্বল-বিস্ফারিত-নয়নে একবার তাকাইল! সহসা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

ফুলের সাজি-হস্তে কনক মন্দিরের সোপানের উপর আসিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ দেবমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিবের সোপানের উপর তাহার মাথা লুটাইয়া পড়িল। "ভগবান, যদি দয়া করিয়া দুঃস্বপ্ন হইতে জাগাইয়াছ, তবে আবার কেন মাঝে মাঝে তার মোহময় স্মৃতিঘোরের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাও ঠাকুর! যদি দয়া করিয়াছ, তবে আরো কর, একেবারে ছুটি দাও, সত্যকার মুক্তি দাও!—ত্যাগের মধ্যে জয়ের সন্ধানে চলিয়াছি ভগবান, জয় দাও—পরাজয়ের গ্লানি মোচন কর!"

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরেব পরিচারিকা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। পদশব্দে মাথা তুলিয়া কনক চাহিল, পরিচারিকা দেখিল, তাহার চক্ষে গভীর ঘুমের গাঢ় আবেশ।

"মা শুনেছ গা, আহা কোথাকার কে ভিনদেশী অচেনা লোক, একলা এসে বিঘোরে প্রাণটা হারালে বাছা!—"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

"ঐ উত্তরদিকের মাঠে একটা লোক ওলাউঠায় মর-মর হয়ে পড়ে আছে, সঙ্গে এক প্রাণীও নাই, শুনছি নাকি বিঠোবা দর্শনে আসছিল, তারপর এই অবস্থা। বিঠ্ঠল, কার মাটি কোথায় কেনা তা তুমিই জানো!"

কনক ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সঙ্গে কেউ নাই?"

"হ্যাঁগো মা, আহা নিছক একলা!"

"বিঠোবার সেবাইত কেউ গেছে কি না?"

"এখনো কেউ খবর পায়নি, আমি এইমাত্র শুনে আস্‌ছি।"

কনক সাজিসুদ্ধ ফুল রাখিয়া, মনে মনে বিঠোবাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুষের কাজের আগে দেবতার কাজ! চক্ষের সাম্‌নে এমন পূজার আয়োজন থাকিতে চক্ষু মুদিয়া অর্চ্চনার চেষ্টা আজ নিষ্ফল! দেবতা অন্ধ তোষামোদে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তাঁহার কাছে সাধনার পুরাপুরি মূল্য দিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়! সকল দিকে।

কনক তখনি দুইজন সেবাইতকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে চলিল। আর এক ব্যক্তি চিকিৎসক আনিতে ছুটিল। তখনকার দিনে বিঠোবার সেবাইতদিগের নিকট অনাথ আতুরগণ সকল সময়ে সাহায্য পাইত।

তাহারা গিয়া দেখিল, প্রান্তর-মধ্যে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। রোগের অবস্থা তখন অতি ভয়ানক! রোগীর চোখে ঘোলা পড়িয়াছে, কানে তালা ধরিয়াছে, হাতে-পায়ে আক্ষেপ হইতেছে, পেটের দারুণ যন্ত্রণায় দুর্ভাগা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সংক্রামক রোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিয়া কয়েকজন হুজুকবাজ নিষ্কর্ম্মা, দয়াপরবশ হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। রোগী জ্ঞানসঞ্চারে মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছে, "জল জল—ওগো একটু জল!"

রোগীর মুখপানে চাহিয়া কনক স্তব্ধ হইয়া গেল। হাঁটু পাতিয়া নীচু হইয়া জন্মের মত, জীবনের মত—যেন ইহপরকালের মত সন্দেহ মিটাইয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর! তাহার পর বেদনা-জড়িত অস্ফুট উচ্চারণে, কাতরস্বরে বলিল, "একি প্রভু! একি একি হৃদয়-বিদারক প্রলয়ঙ্কর রহস্য!"

মুমূর্ষু ব্যক্তি ভাইলাল! কনক ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চক্ষু মুদিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে, অন্তরের অন্তর হইতে নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া দেবতার চরণ-উদ্দেশে ছুটিল! সে ভাষা শব্দহীন, সে ভাব অনুভবের অতীত।

সামান্য মেঘের ঘোর কাটাইতে বিশ্বগ্রাসী ঝড়ের আয়োজন! দর্পণের প্রতিবিম্ব মুছিতে দর্পণই চূর্ণ করিবার আদেশ! কি অদ্ভুত! ইহাই অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার অনন্ত শুভময় ব্যবস্থা! কনক যে আজই খানিক আগে, দেবতার পদে নতশিরে বাসনা জানাইয়াছিল, "দয়া যদি করিয়াছ প্রভু, তবে আরো দয়া কর"—কে জানে এই ঘটনা বুঝি সেই প্রার্থনারই সমসূত্রে গাঁথা, একই অখণ্ড বিধান।

তাহাকে পিষিয়া চুরমার করিয়া, সকল কুণ্ঠার কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া—দেবতার নিজস্ব করিয়া লইবার জন্যই বুঝি এ সৌভাগ্য—শাস্তির বেশে আসিয়াছে! তাই হোক ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কনকের চক্ষু হইতে দেবতার পূত আশীর্ব্বাদের মত, জ্বলন্ত শোণিতের স্রোত যেন মর্ম্মের গ্লানি ধুইয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুরূপে খসিয়া পড়িল...। কনক শান্তমুখে রোগীর সেবা করিতে বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া বিষণ্নমুখে মাথা নাড়িলেন, বাঁচিবার আশা নাই!

কনক হাসিল। চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে সকলে মিলিয়া রোগীকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে—নাটমন্দিরে লইয়া আসিল। চিকিৎসক পাশে বসিয়া বহু যত্নে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

রোগের অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলি বিফল, ক্রমশঃ রোগ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিকিৎসক অপরাহ্নের পর উঠিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল সময় সন্নিকট।

সেদিন শুক্ল ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোক সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারিদিক ফুল্ল জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! আর মন্দির প্রাঙ্গণে ততোধিক বিরাট অভিনব শান্তি!

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু চাহিল। সকলে বুঝিল এই শেষ। কনক তখনো রোগীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। রোগী কষ্টে মাথা ঘুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে?"

বিকৃতস্বরে কনক উত্তর দিল,—"দেবদাসী।"

"আমি কোথা?"

"ভগবান বিঠোবার মন্দিরে।"

রোগীর সর্ব্বশরীরে যেন জ্বলন্ত তড়িৎ বহিয়া গেল! তাহার মৃত্যুম্লান বিবর্ণ মুখে সহসা একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! রোগী সহসা কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিল! সমস্ত কাতরতা সবলে ঝাড়িয়া মূহূর্ত্তে অত্যন্ত সহজভাবে উঠিয়া বিঠোবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কনকের পদ-পান্তে নতশির হইল।

জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত!

"গুরুরূপা জ্ঞানদাত্রী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার আদেশ পালন করেছি,এই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের নীচে, ভগবান বিঠোবাকে সাক্ষী রেখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, পাঁচ বৎসরের পর আমি ফিরেছি, ফিরেছি, ফিরেছি!—জগৎ শুনুক আর না শুনুক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমায় আজ শোনাতে এসেছি দেবি, আজ আমি সকলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে, একেবারে ফিরে চলেছি।"

আকস্মিক উত্তেজনায়, সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়ে দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী ভীষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রোগী ঢলিয়া পড়িল। কনকের চক্ষু দিয়া আবার দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে কনক ধীরে ধীর বলিল, "সংসারে তোমার মত যাদের তেজস্বী প্রাণ তারাই ধন্য ভাইলাল, ভালয় হোক মন্দয় হোক, তোমরা যে-দিকে ঝোঁকো, —সেদিকে পূর্ণ শক্তিতেই ঝোঁকো, আত্মহারা হয়ে যাও! জগতে তাই তোমাদের সাধনাই এত দ্রুতসার্থক! তোমরা হয় পূর্ণ দেবতা, নয় পূর্ণ অপদেবতা হয়ে দাঁড়াও,—আধা-আধির ভাগের মাঝে—অপূর্ণ থাকতে পার না।...আশীর্ব্বাদ কর ভাইলাল, অমনি পূর্ণ তেজস্বিতার মাঝে নিজের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন আত্মজয়ী হতে পারি।"...

ভাইলাল শান্ত-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল! তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, বড় মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিঠোবার দ্বারে আমার মহাশয্যা রচিত হয়েছে। কি অপরিসীম আনন্দ! আজ আমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই, আছে শুধু হে বিঠোবাদেব, তোমার পাদপদ্মে বিলীন হবার জন্য শুধু একটি মুহূর্ত্ত!"

ভাইলালের ললাটে তখন বেদনা, ক্ষোভ, ক্লান্তির চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না! ছিল শুধু সুষমা-সিক্ত স্বর্গীয় তৃপ্তির একটি অপরূপ দীপ্তি!

উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুকের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাইলাল মহাসমাধিতে মগ্ন হইল। চারিদিকে উজ্জ্বল ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ শোভায় হাসিতেছিল। সুধাকর-কর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের চক্ষে স্নিগ্ধ-পরশ বুলাইয়া বহিতে লাগিল! মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট একজন জ্ঞানী সাধক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গদগদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন ;—

"ন জাতোহহং মৃতোবাপি—
নামে কর্ম্ম শুভাশুভম,
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তি কথং মম।"

কার্য্য-কারণ

১

শ্রাবণ মাস ; অনিশ্চিত-সময়-উচ্ছ্বসিতা যমুনা দেবী কয়দিন পূর্ব্বে খুব বাড়িয়া এখন সহসা অত্যন্তই কমিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার সে দুই-কূল হানা তরঙ্গ আস্ফালনের শোভা এখন আর নাই; জল যেমনই দূরে সরিয়া গিয়াছে, তেমনই ঘোলা হইয়াছে।

তখন বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনের মদনমোহনের পাড়ার গলিপথে —একটি সুন্দরী তরুণী জলপূর্ণ কলস কক্ষে আসিতেছিল ; তাহার ঘড়ায় ছিল ইঁদারার মিঠা জল।

তরুণীর পরিধানের সিক্ত বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে জড়ান ছিল। তরুণীর কপাল ঢাকা ঘোমটা, গঠন দোহারা, আকৃতি বেশ একটি সুকোমল নম্র লালিত্যপূর্ণ, বয়স আঠার উনিশ বৎসরের বেশী নহে। তাহার মুখখানিতে একটা বিষণ্ণ মলিনতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল, আয়ত, সুন্দর চক্ষু দুইটি গভীর কাতরতায় আনত ছিল। রমণী ধীরপদে চলিযাছিল। গলির প্রান্তে একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া রমণী দাঁড়াইল। একবার রাস্তার দিকে তাকাইল। তাহার পর মাথার কাপড়খানি একটু টানিয়া সরাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল ; ধীর কণ্ঠে ডাকিল, "মা, জল নিয়ে যাও গো।"

বাড়ীটি যাত্রীনিবাস ; বাড়ীর অধিবাসীরা সম্প্রতি বন পরিক্রমণে গিয়াছেন ; কয়জন দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য অসমর্থ ব্যক্তি যাইতে পারেন নাই। তরুণী তাহাদেরই পানার্থে মিঠা-কুয়ার জল যোগাইয়া থাকে। যমুনার ঘোলা জল অনেকে ব্যবহার করেন না।

তাহার আহ্বানে একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা গৃহের বাহিরে আসিয়া, মাটির কলসীতে সেই জল লইলেন। তাহার পর গতকল্যকার ও অদ্যকার পারিশ্রমিক হিসাব করিয়া তাহাকে চারিটী পয়সা দিলেন। তরুণী ম্লানমুখে একটু শুষ্ক হাসি আনিয়া মৃদুস্বরে শুধাইল, "কাল সকালে কি জল চাই মা?"

"না বাছা, কাল আর জল চাইনে", বলিয়া মধ্যবয়স্কা গৃহে ঢুকিলেন। মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া "আচ্ছা" বলিয়া তরুণী ফিরিয়া চলিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথে, বামদিকের রোয়াকের উপর আর একজন প্রৌঢ়া রমণী বসিয়া মালা জপ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিলক, মাটিতে গৌরাঙ্গ-চরণের ছাপ আঁকা, পরণে সাদা থান, মাথায় সযত্নে কঙ্কতিকা প্রসাধিত প্রচুর তৈলনিষিক্ত চুলে প্রকাণ্ড 'কলা-মোচা' খোঁপা বাঁধা, গলায় ত্রি-কণ্ঠি মালা। ইনি যাত্রীগণের কেহ নহেন, ইনি বৃন্দাবনবাসিনী জনৈক ভেকধারিণী বৈষ্ণবী, ইনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী। তরুণী দূরে উঠান দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "কি গো মাতা, ভাল আছ?"

তরুণী ফিরিয়া চাহিল। শূন্য কলস কক্ষে প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভাল আছি মাতা, তোমাদের সব ভাল ত?"

প্রৌঢ়া হাতের ঝুলির মধ্যস্থ মালাটা সজোরে ঝাঁকানি দিয়া অস্ফুট স্বরে 'কৃষ্ট কৃষ্ট' বলিয়া উত্তর দিলেন, "হ্যাঁগা, তা তোমার এখন কি এই বাড়ী-বাড়ী জল যুগিয়েই দিন চলবে?"

"কি করব মা!—" বেদনায় তরুণীর চক্ষু দুইটি ছলছল হইয়া আসিল। পীড়িত স্বরে বলিল, "এই জল যুগিযে দিনের মাথায় যে কটি পয়সা পাই, তাতেই গোবিন্দ কোনরকমে দিন চালিয়ে দেন, ছেলেটার একটুখানি দুধ—", তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সে থামিল।

প্রৌঢ়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আহা, তা নয়! ছেলেটাকে নিয়েই ত হয়েছে যত গেরো! ও যদি না থাকত, তা হলে তুমি ত আজ দুখখু-ধান্দা ক'রে সসচন্দে দিন কাটাতে পারতে। আর বনমালী দাসের কথাও বলি বাছা। এখন রজ পেয়েছে, উদ্ধার হয়েছে। বলতে নেই, কিন্তু তার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিচ্ছু ছিল না। না হ'লে এমন চেটো মাগ নিয়ে কি ঘর থেকে বেরোয় গা? নিজে ব্যাটা ছেলে, খুসী হল ভেক নিলি, সৎপথে দাঁড়ালি বেশ করলি। কিন্তু ছুঁড়িটেকে কি করতে মজালি? তাতে আবার ভগবানের শাস্তি দেখ ; একটা ছেলে—কেন গো—", তিনি বিরক্ত স্বরে সম্বদ্ধ-অসম্বদ্ধ নানা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিলেন।

তরুণীর দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নীরবে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে বলিল, "বরাত মা, আমার বরাত ; নাহলে তার সঙ্গে ত আমার বিয়ে হবার কথাই নয়! ব্রাহ্মণ হলেও সে রাঢ়ী, আমরা বারেন্দ্র ; কিন্তু বাবার আমার কি ঝোঁক হল —বল্লেন, অমন জামাই আর পাব না; তাই ত বষ্টুম হয়ে কণ্ঠিবদল করালেন। তখন কি সেই জানত, না আম্মার বাবাই জানতেন যে, আমার অদেষ্টে এত লেখাপড়া আছে!"

প্রৌঢ়া মালা জপিতে জপিতে সংক্ষেপে বলিল, "সে ত বটেই।"

গলা ঝাড়িয়া চক্ষু মুছিয়া তরুণী আবার বলিল, "মা, তার ইচ্ছে ছিল যে গোবিন্দ'র বাড়ীতে কি আর কোথাও একটা কামদারী পাবে, তাই নিয়ে বোষ্টম-সেবায় হরিনাম করে দিন কাটাবে। মাঝখান থেকে তিনদিনের জ্বরে যে এমন করে এমন হয়ে যাবে—", তরুণী উচ্ছ্বসিত আবেগে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্নেহগদগদকণ্ঠে বলিল, "দেখ শ্রীমতী, সবই গোবিন্দর ইচ্ছে। যা হয়েছে তা ত ফিরবে না। এখন আমি একটি কথা কই বাছা, কথাটি ঠিকের

কথা, বুঝে দেখো,—দ্যাখ বাছা, সে ত গেছে; এখন তোমার ত একটা গোতি-গোত্তর চাই। একে এই সোমত্ত বয়েস তোমার, তাতে আবার ছেলেটিও রয়েছে; এমন করে কদ্দিন চালাবে? দু'পয়সা থিত আছে এমন দেখে, একটি বোষ্টুমের সঙ্গে কণ্ঠিবদল কর, না হলে—"

"ও কথা বোল না মাতা। বাপ রে, কণ্ঠিবদল আর না। আমার খোকার দিন গোবিন্দ যা করেই হোক, চালিয়ে দেবেন।"

"আহা, দিন আর কার না চলে গা? তবে সুখে চলা, আর দুঃখে চলা আলাদা ত; এই ধর না আমি—"

"আর দাঁড়াব না মা, বেলা গেল, এখন আসি।"—তরুণী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। প্রৌঢ়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা দাঁড়াও, দাঁড়াও—আসবেই ত, শোন না একটা কথা"—সে তাহাকে দাঁড় করাইয়া পরম আগ্রহে নানা অবান্তর প্রসঙ্গ ফাঁদিয়া, অনাবশ্যক অলঙ্কারে সাজাইয়া সুধা ওরফে তরুণী শ্রীমতী বৈষ্ণবীকে শুনাইয়া দিল যে তাহার স্বামী বনমালী দাসের উন্নত চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে অল্পবয়স্ক যুবক অমূল্য হাজরা, অনঙ্গদাস বাবাজী নাম ধারণ করিয়া 'ভেক' লইয়া এতদিন বনমালীর সহচররূপে গভীর বৈষ্ণবভক্তি প্রণোদিত হইয়া মহাড়ম্বরে ভজনপূজন লইয়া দিন কাটাইতেছিল, সে এবার বনমালীর মৃত্যুর পর সহসা 'নিজ মূর্ত্তি ধরি বীর প্রাচীরে বসিল' অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। সম্প্রতি সে এক বয়োজ্যেষ্ঠা উগ্রক্ষত্রিয় কন্যার সহিত কণ্ঠিবদল করিয়া—দিব্য আরামে গৃহস্থালি পাতাইয়া এই পাড়াতেই কোথা ঘরভাড়া করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছে। কথাচ্ছলে তিনি আরও জানাইলেন যে, অমুক 'ঠোরের' (একস্থানে দলবদ্ধ অবস্থায় বাসকারী বৈষ্ণবগণের আশ্রমকে 'ঠোর' কহে) প্রধান বৈষ্ণব ব্রজদাস বাবাজীও এতদিনের কৌমার্য্য ব্রতের (?) পর এইবার কণ্ঠিবদল করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, স্ত্রী-কর্ত্তৃত্বহীন ঠোরের কাজকর্ম্ম ভাল চলিতেছে না; সুতরাং বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাবাজী একজন মাতাজী সংগ্রহ করিতে উৎসুক হইয়াছেন ইত্যাদি। অবশেষে তিনি একটু স্পষ্ট ইঙ্গিতের সহিত ইহাও শ্রীমতীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রজদাস বাবাজী শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত লোক, তিনি যে-সে একটা স্ত্রীলোকের সহিত কণ্ঠিবদল করিয়া নাম ডুবাইতে রাজী নন। তিনি এমন একটি ভক্তিশ্রদ্ধাময়ী সৎপ্রকৃতি রমণী চাহেন, যাহাকে সেবাদাসী করিয়া তিনি তাঁহার ইহ-পরকালের 'গতিমুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

সুধা ওরফে শ্রীমতী তাহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়াছিল! সে এ কি কথা শুনিতেছে! ব্রজদাস বাবাজী কণ্ঠিবদল করিবেন? কি আশ্চর্য্য! যে ব্রজদাস বাবাজী পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে সর্ব্বত্র সম্মানিত, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দেশে দেশে ত্যাগ মহত্ত্বের অবতাররূপে বিঘোষিত হইয়াছেন, যাঁহার শম-দম-তিতীক্ষার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যময়ী বিচার বিশ্লেষণ শুনিয়া স্বয়ং বনমালী দাস ভক্তিভরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাঁহার আজ এ অদ্ভুত মতি পরিবর্ত্তন! হায় পৃথিবীর মানুষ! তোমার তর্ক-যুক্তি, তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার বিশ্বাস-ভক্তি এত ক্ষণভঙ্গুর! তোমার আজিকার মূর্ত্তি দেখিয়া কালি আর তোমায় চিনিবার যো নাই!

শ্রীমতী ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার গায়ের কাপড় গায়েই শুখাইয়া আসিতেছে, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। খানিকটা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শেষে সে বলিল, "হ্যাঁ মাতা, ব্রজদাস বাবাজী সত্যি কণ্ঠিবদল করবেন?"

উৎসাহিত হইয়া প্রৌঢ়া মাতাজী বলিলেন, "হ্যাঁরে বাছা, বাবাজী কালও এসে আমার এই রকে বসে কত কথা কয়ে গেলেন। তোমার কথাও অনেক হোল। তোমায় বাবাজীর ভারি পছন্দ; বল্লেন বনমালীর সঙ্গে ঘর করেছে দেখেছি, বেশ ভালমানুষ লোক বটে। তা তোমরা বলে দেখো মাসী; শ্রীমতী যদি রাজী হন ত আমি তার সঙ্গেই কণ্ঠিবদল—"

ঘৃণায় শ্রীমতীর মুখখান রাঙা হইয়া উঠিল। কঠোরস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ, মাতা ছিঃ! তোমরা সবাই কি লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়েছ! বাবাজী আমার স্বামীর গুরু, আমি তাঁকে বাপের মত ভক্তি করি। তিনি কি না—ছি!" শ্রীমতী আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

মাতাজী গতিক মন্দ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "শোন, শোন; মাতা শোন; এ বাছা রাগারাগির কর্ম্ম নয়, ঈশ্বরাধীন কাজ। কপাল যখন পুড়েছে—"

মুখ ফিরাইয়া তীব্রস্বরে শ্রীমতী বলিল, "কপাল পোড়া ঈশ্বরাধীন কাজ বটে, কিন্তু বুদ্ধি-ধর্ম্ম পুড়িয়ে খাওয়া ত ঈশ্বরাধীন কাজ নয়; সে মানুষের কাজ। মাতা, তোমাদের পায়ে পড়ি; তোমরা আমার সঙ্গে অমন শত্রুতা সাধতে চেয়ো না।" শ্রীমতী চলিয়া গেল।

মাতাজী ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে চাহিয়া ঈর্ষাত্মক স্বরে আপন মনে বলিলেন, "মর মর ছুঁড়ি, ভাল বললে মন্দ হয়—মরবি নিজে।"

২

রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে চলিতে, ক্ষোভে অভিমানে শ্রীমতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কোথায় তাহার সেই রক্ষাকর্ত্তা স্বামী? আজ স্বামী নাই বলিয়া— আজ সে অরক্ষিতা বলিয়া, তাই তাহাকে এমন মর্ম্মান্তিক কথাগুলা সহ্য করিতে হইল। আজ ছাতা নাই, মাথা রাখিবে কে? ইহার জন্য সে কাহার উপর রাগ করিবে? কাহার উপরই নয়! মানুষ নিজের ভোগ—নিজ হাতেই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহার জন্য দায়ী ভগবানও নন, অপর মানুষও নহে। না, তাহাকে চক্ষের জল চক্ষে মারিতে হইবে; ইহাতে কাঁদিবার কিছু নাই। তাহার জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম বুঝি বড় কুৎসিত ছিল, এ জন্মে তাহারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে; ব্রজদাস বাবাজীই বা কি করিবেন, আর ঐ প্রৌঢ়া মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই বা ফল কি আছে; উহাঁরা নিমিত্তমাত্র, নিরপরাধ। উহাঁরা আর যাহা হউন তাহা হউন, উহাঁরা ত ভগবানের নাম লইয়া গৌরাঙ্গের চরণ ভাবিয়া দিন কাটাইতেছেন, সেই নজীরটুকুই তোমার আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা উহাঁদেব চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। না না—আঘাতের বেদনায় কাহারও উপর দ্বেষ বিদ্বেষ জাগাইলে চলিবে না, তাহাই বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ, তাই বৈষ্ণবের অধর্ম্ম। না তাহার স্বামীর আজ্ঞা, শাস্ত্রের বিধান—

"তৃণাদপি সুনীচেন..."

চক্ষের জল মুছিয়া শ্রীমতী আবার ইঁদারায় আসিয়া জল তুলিয়া আর একজনের বাড়ীতে লইয়া চলিল। যেখানে জল দিবার বরাত ছিল সে বাড়ীটিও মদনমোহনের পাড়ায়। তবে পাড়ার এক-টের-ঘ্যাসা বলিয়া অনেকটা পথ যাইতে হয়।

পথের ধারে একটি মাটির কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান মুদ্রিত নয়নে উপাসনা করিতেছিল, বৃদ্ধের আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু, মাথার সম্মুখভাগে টাক ; কিন্তু মুখখানি প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, শরীরে বাঁধন এ বয়সেও এমন শক্ত, সুন্দর রহিয়াছে যে, তাঁহাকে নিঃসংশয়ে একজন দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কার্য্যক্ষম লোক বলিয়া প্রতীতি হয়।

শ্রীমতী চলিতে চলিতে যখন বৃদ্ধের নিকটস্থ হইল, তখন বৃদ্ধের উপাসনা শেষ হইয়াছে, বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীমতীর কক্ষস্থ জলপূর্ণ কলসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ একটু আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল, "মাগো, এ কোথাকার জল?"

"মিঠে কুয়ার জল বাবা।"

"বেশ ঠাণ্ডা আছে কি মা?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"মিঠে কুয়া এখান থেকে কদ্দূর মা?"

"তা অনেকটা বাবা, এই পথ দিয়ে গিয়ে ঐ মোড় ঘুরে তারপর ঐদিকে ফিরে ডাইনে ভেঙ্গে।"

"ওঃ, অনেকটা যে!" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে একটা সংশয়াত্মক নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শ্রীমতী পা বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছিল, বৃদ্ধের কথায় ঈষৎ বিচলিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল ; দেখিল, বৃদ্ধ শুষ্ক চিন্তিত মুখে নীরবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। শ্রীমতী কোমলকণ্ঠে শুধাইল "তুমি কি মিঠে কুয়ার জল খাবে বাবা?"

"খেতুম মা একটু, রোজা রেখেছিলুম কি না ; সারাদিনের পর বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু ঠাণ্ডাজল হলে—"

"আহা, খাও, খাও বাবা, আমি তোমায় জল দিচ্ছি।" শ্রীমতী সাগ্রহে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে একটু হাসিয়া বলিল, "আমায় ত জল দিবি বেটী ; কিন্তু তোর জলটা যে তারপর বরবাদ হবে মা!"

"তা হোক বাবা, তুমি খাও। আমি আবার গিয়ে জল নিয়ে আসব। আহা, সারাদিন উপোসী আছ।"

বৃদ্ধ হাসি মুখে আপত্তিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বেটী, সন্দে হয়ে গেছে ; তুই আজ বাড়ী যা মা, তোকে আর কেন দুঃখ দেব? আমি নৌকার মাঝি, যমুনায় সারাদিন লা' বেয়েছি, রোদে রোদে বড় 'তির্‌ষে' পেয়ে গেছে কি না, তাই বলছি— তা হোক, আমার ঐ ঘাটে লা' বাঁধা আছে, ঐখানেই এক চুমুক জল খেয়ে আমি এখনই বাড়ী ফিরব— ও কি! হাঁ রে দুঃখু হল তোর? আচ্ছা, দে মা, তোরই জল খেয়ে যাই। তুই এই দাওয়ায় ওঠ। আমি আঁজ্‌লা পাতছি, জল ঢেলে দে—না হলে গায়ে ছিটে লাগবে মা!"

বৃদ্ধের আপত্তিতে শ্রীমতী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহার শেষের প্রস্তাবে সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, জল ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত

হইল। বৃদ্ধ পরিধেয় বস্ত্রের খুঁট হইতে খুলিয়া একটুকরা পাটালি গুড় লইয়া মুখে ফেলিয়া, অঞ্জলি পাতিয়া এক নিশ্বাসে প্রচুর পরিমাণে জল উদরস্থ করিল, তাহার পর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আঃ, মাগো বাঁচলুম!"

"আহা!" স্বস্তির আশ্বাসে শ্রীমতীর ভারাক্রান্ত বুকটা সহসা যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া উঠিল; সকরুণ স্বরে বলিল, "আহা, এবার বাড়ী যাও বাবা, সারাদিনটা—আহা!"

সস্মিত মুখে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কোথা থাকিস মা?"

"এই পাড়াতেই বাবা, চরণদাসী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে।"

"তুই কি বৈষ্ণবের মেয়ে, মা?"

"না বাবা, বামুনের মেয়ে ছিনু, এখন ভেক নিয়েছি।"

"ভেক!" বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া গেল; সহসা তাহার চক্ষে তীক্ষ্ণ সংশয় বিদ্যুদ্বেগে জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রুকুটীবদ্ধ ললাটে পরীক্ষকের নিপুণ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার তীব্র নির্ম্মম দৃষ্টি শ্রীমতীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বৃদ্ধ কি যেন খুঁজিতে লাগিল। শ্রীমতী বুঝিল। তাহার বক্ষের মধ্যে ঘৃণার দ্বন্দ্ব গভীব আলোড়নে ফেনাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন একটু কুণ্ঠা বোধ করিল। বৃদ্ধকে সে কথা শুনাইয়া ফল কি? কিন্তু না, ইহার অন্ধ সংশয় পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই উচিত। শ্রীমতী স্থির স্বরে বলিল, "আমি স্বামীর সঙ্গে ভেক নিয়ে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিনু বাবা,—এই মাস দুই হোল স্বামী আমার বৃন্দাবনের রজ পেয়েছেন। এখন আমি ছোট ছেলেটিকে নিয়ে একা আছি। আমার আর কেউ নেই!"

"কেউ নাই।" বৃদ্ধেব ললাট প্রসন্ন হইল, স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কতবড়, মা?"

"বছর খানেকেব।"

"ও; কোথায় থাকিস মা—চরণদাসী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে?" সহসা কি যেন মনে পড়াতে বৃদ্ধ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা চরণদাসী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে বনমালী দাস বাবাজী থাকতেন না?"

"তিনিই আমার স্বামী ছিলেন বাবা—", শ্রীমতীর বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। অপরিচিত বৃদ্ধের মুখে স্বামীর নাম শুনিয়া তাহার বেদনাহত হৃদয়ের উপর সান্ত্বনার সংঘাতের মত, একটা অননুভূত-পূর্ব্ব ভাবের আবেগ উথলিযা উঠল। সে আবেগ চোখের জলে তৃপ্তির ধারায় নামিল। বৃদ্ধ ব্যথিত স্বরে বলিল, "বনমালী দাস তোমার স্বামী ছিলেন? আহা, কাঁদিসনি মা; কাঁদিসনি। নিজে সেখানে মেয়াদের খতে সই দিয়ে এসেছি আমরা, কে রদ করবে বল মা; নইলে বনমালী দাস বাবাজী ত —আঃ,নেহাৎ কাঁচা বয়েস, গোঁসাইজির আখড়ায় গ্রন্থপাঠ শুনতে যেতেন। তাঁকে দেখেছি ত। আহা বৈষ্ণব যাকে বলতে হয়। তুমি তাঁর পরিবার—ওঃ আল্লা!" বৃদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া কাপড়ে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আলো ক্রমশঃই নিভিয়া আসিতেছিল; কিন্তু শ্রীমতী সে কথা ভুলিয়া গেল। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ যেন অনিশ্চিত সান্ত্বনায়, আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে ঘড়াটা কক্ষে লইয়া নীরবে অশ্রু-সজল নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

কপালের ঘাম মুছিয়া বৃদ্ধ বলিল, "দুনিয়ায় সবই ভুল মা। কে কার স্বামী, কে

কার পরিবার, কে কার ছেলে-মেয়ে? কেউ কিছু না। তবে তিনি দিয়েছেন ছেলেটিকে, ওরই মুখ চেয়ে বুক বাঁধিস মা, উঁচুতে ধর্ম্মের দিকে মতি রাখিস, নীচুতে মাটির দিকে চেয়ে চলিস। ধর্ম্মই একদিন সুখী করবে; ধরণীই চিরদিন বুকে ধরে থাকবে। কণ্ঠিবদল করেছিলি মা বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে, মানুষ উপলক্ষ ছিল। এখন চলে গেছে, যাক ; তাঁর খুসীর ওপর ত আমাদের জেদ চলে না। এই যে আমার—", বৃদ্ধের কণ্ঠ রোধ হইল, ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমার একটা মেয়ে আছে, ঠিক তোরই মত মা, আল্লা তারও নসীবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। একটি ছেলে আছে, সেই ছেলেটিকে নিয়ে আজ পাঁচ বচ্ছর বাপ-বেটীতে দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। বাপ-বেটীতে আল্লার নাম নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। দেখি, আল্লার মেহেরবানীতে যদি বাচ্ছাটাকে একটু মানুষ করে দিয়ে —মরবার ছুটি পাই ত আরামে মরব আর কি—", বৃদ্ধ চক্ষু মুছিল।

শ্রীমতীর ভিজা কাপড় অনেকক্ষণ গায়ে থাকিয়া প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু চক্ষের জলে তাহার আঁচল আবার ভিজিয়া উঠিল। সমবেদনায় তাহার অন্তরের শিরা-উপশিরাগুলা টনটন করিতে লাগিল। তাহার মত আর একজন হতভাগার মুখ এই বৃদ্ধের বক্ষ-পঞ্জরে বেদনার রেখায় খোদিত আছে ; সেইজন্যই আজ অভাগিনী শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া এই বৃদ্ধ বুকভরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত চোখভরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। আহা, কি তৃপ্তি ঐ অশ্রুতে! কি অমৃতময় স্পর্শ ওই দীর্ঘশ্বাসে রে!

শ্রীমতী অশ্রুসিক্ত নয়নে বৃদ্ধের ঘনস্পন্দিত বক্ষের দিক চাহিল। আহা, ঐ বুকের মধ্যেও একটি সুকোমল স্নেহপুষ্ট পিতৃহৃদয় বাস করে! বৃদ্ধ মুসলমান; সে তাহার জাতি জ্ঞাতি—কেহই নয়, কিন্তু তবু—তাহার সেই হৃদয়টা, আহা-হা তাহার স্বর্গীয় স্নেহাবেগস্পর্শ,—তাহাকে কোন পাষাণের নিরেট ব্যবধান ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সে যে সমীরণের মত সর্ব্বগামী ; চন্দ্রালোকের মত স্নিগ্ধ শীতল ; সূর্য্যালোকের মত দীপ্ত পবিত্র! শ্রীমতী শ্রদ্ধাপুত দৃষ্টিতে আবার বৃদ্ধের পানে চাহিল। ভক্তিতে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই পথের ধূলায় নতজানু হইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া বৃদ্ধকে শুধু ডাকে, "বাবা"! একবার মন খুলিয়া মনের আবেগে বলিয়া উঠে, "ওগো অপরিচিত, তুমি অপরিচিত হও, কিন্তু অনাত্মীয় নহ। তুমি পিতা, দৃষ্টি-গ্রাহ্য রক্তমাংসের সম্পর্কে না হৌক—কিন্তু অন্তরের মহান অন্তরঙ্গতায়—স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কে তুমি ত এই অনাথা অভাগার আপনার জন, পিতা—।"

বৃদ্ধ কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, করুণস্বরে বলিল, "মাগো, খোদার কলমের ওপর কলম চালান যায় না, শুধু কালি মাখানই আমাদের সার হয়। 'করম' সাফ রাখিস মা, নসীব আপনি সাফ হয়ে যাবে। যে দুঃখ দিয়েছে, সেই দুঃখ ঘুচাবে। যা মা, বাড়ী যা ; সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, আর পথে একাটি থাকিস না।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। শ্রীমতী চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্লেষমিশ্রিত বিদ্রূপের হাস্যে চারিদিক সচকিত করিয়া রাস্তার মোড়ে তিনটী মধ্যবয়স্কা রমণী কলস কক্ষে দেখা দিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশ ; বৈষ্ণবীদের দুইজনের চেহারা মাঝারি রকমের, অপরা অসাধারণ স্থূল, তাঁহার

সামনের দাঁতগুলি অত্যন্ত উঁচু, সেগুলি চেষ্টাসত্ত্বেও অধরৌষ্ঠের অন্তরালে ঢাকা পড়ে না। তাঁহার রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে একটা দম্ভগর্ব্বিত ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে।

পথমধ্যস্থলে নীরবে দণ্ডায়মানা শ্রীমতীকে দেখিয়া স্থূলাঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্র কটাক্ষে বলিলেন, "অ মা—ছুঁড়িটা কে গা, দাঁড়িয়ে কেন এমন ভঙ্গীতে?"

কথাটা বৃদ্ধ মুসলমানের কাণে গেল, সে মুখ ফিরাইয়া স্নেহময় স্বরে বলিল, "বাড়ী যাও মা—"

"যাই —", শ্রীমতী ফিরিতেছিল, রমণীগণের একজন তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল "কে গো, ছিমতী? এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কাপড় কাচ্‌তে যাবে নাকি?"

"হাঁ যাব, তোমরা যাচ্ছ নাকি? চল তোমাদের সঙ্গেই যাই—", শ্রীমতী উহাদের আগমন প্রতীক্ষায় ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ তখন পথের মোড়ে অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া স্থূলাঙ্গিনী বলিলেন, "ও বুড়োটা কে গেল গা?"

"ও একজন নৌকার মাজি, বড় ভাল লোক, কথা শুনলে কাণ জুড়িয়ে যায়—।"

স্থূলাঙ্গিনী সে কথায় কাণ দিল না। ঈর্ষিত নয়নে একবার শ্রীমতীর নম্র কোমল মূর্ত্তিটীর উপর চোখ বুলাইয়া লইল; নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁগো, তুমি কোথায় থাক?"

তাহার সঙ্গিনী একজন বলিয়া উঠিল, "ওমা জান না,—উনিই যে বনমালী দাস বাবাজীর—"

"অ মা, ইনি!"—স্থূলাঙ্গিনী বিস্মিতভাবে শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া রহিল। শ্রীমতীর একটু বিস্ময় বোধ হইল,—বুঝিল এই অপরিচিতা বৈষ্ণবীও তাহার স্বামীর নাম জানে। শ্রীমতী মুখ তুলিয়া বৈষ্ণবীর দিকে ভাল করিয়া চাহিল, কিন্তু বৈষ্ণবীর চাহনির তীব্রতা দেখিয়া সে মনে মনে একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া লইবার জন্য অপরা বৈষ্ণবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ বুড়ো মাঝির একটী মেয়ে আছে, মেয়েটি বিধবা—আমাদেরই বয়সী বোধ হয়। মেয়ের একটী ছেলে আছে, সেই সব কথাই দাঁড়িয়ে বলছিল। লোকটীর কথা শুনে আমার এত মন-কেমন কর্‌ছে, আহা।"

স্থূলাঙ্গিনী চট করিয়া উত্তর দিলেন, "অত মন-কেমন কর্‌লে ত আর পেরে উঠি না বাছা। তা সে কথা থাক, হ্যাঁগা মাতা, তুমি আর কণ্ঠিবদল করবে না?"

শ্রীমতীর মনের মধ্যে সুপ্ত অসহিষ্ণুতা খোঁচা খাইয়া জাগিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে ম্লানমুখে কহিল, "আবার কেন মা, সে ত চুকে গেছে।"

তাচ্ছল্যভরে মুখ ফিরাইয়া বক্র হাস্যে স্থূলাঙ্গিনী বলিলেন, "চুকে ত গেছে; তা হলেও বৈষ্ণবের সেবায় দেহ দান না করলে কি জীবের মুক্তি আছে গা।"

না, তাহা ত নাই। কিন্তু সে বৈষ্ণব-সেবাই বা কাহাকে বলে আর সে দেহদানেরই বা অর্থ কি? সে অর্থ বড় সূক্ষ্ম, বড় নিগূঢ়—যাহার বুদ্ধি আছে সে তাহা বুঝিতে পারে, যাহার পাণ্ডিত্য আছে সে তাহা বুঝাইতে পারে। মূর্খা নারী শ্রীমতী, তাহার পাণ্ডিত্য নাই —সে স্বামীর কাছে যাহা কিছু শিখিয়াছে, তাহাই তাহার জীবনের সার-সর্ব্বস্ব শিক্ষা।

কিন্তু তাহাদ্বারা ত অন্যের অন্ধ বিশ্বাস, কুটিল কুতর্ক খণ্ডন করা যায় না। আর, তাহা ছাড়া, কথায় কথা বাড়িবে বই কমিবে না, সুতরাং কোনই ফল নাই, চুপই ভাল। শ্রীমতী পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইল, কোন কথা কহিল না।

স্থূলাঙ্গিনী পুনশ্চ বলিলেন, ঠিক যেন আপন মনেই—"দেখ, ভাগ্যে আজ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে এ পথে বেরিয়েছিলুম, তাই আজ তীর্থিধর্ম্ম করে সুখে দুঃখে একরকম দিন কাটাচ্ছি। হ্যাঁ বাছা, তা কদ্দিন তুমি এমন করে দিন কাটাবে?"

শ্রীমতী মৃদুস্বরে বলিল, "যদ্দিন তিনি কাটান।"

তাহারা কথা কহিতে কহিতে কালীয় দমনের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমতী তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া গোটাদুই ডুব দিয়া কলসী ধুইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহাকে আবার ইঁদারার জল তুলিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

রমণীত্রয় জলে নামিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে—অমুক সংসারত্যাগী বৈরাগী বাবাজী সম্প্রতি কণ্ঠিবদল করিয়া গতকল্য বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীকে লইয়া গিয়া অমুক মেলাস্থলে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রেশমী চুড়ি পরাইতেছিলেন, পরে সহসা অদূরে নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব রাধানাথ গোস্বামী বাবাজীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিজের মুখের উপর ছাতা আড়াল দিয়া কিরূপ কৌশলে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনাসহ হাস্য-পরিহাস জুড়িয়া দিলেন। শ্রীমতী বেদনাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৩

অবস্থা মানুষকে যতই উৎপীড়িত করুক, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাটা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার চরিত্রের উপর। অসহায় দরিদ্র অবলার মস্তকটি অরক্ষিত দেখিয়া—অনেক স্বভাব-ক্ষুধার্ত্তই তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল ; কিন্তু নিজের মস্তকের উপর রমণীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি দেখিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া পিছু হটিয়াছে। কেবল হটে নাই একজন, তাঁহার ক্ষুধাটাও কিছু বেশী প্রবল এবং স্বভাবের বোধ হয় কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে। তবে তাঁহার শিক্ষা-গর্ব্ব কিছু ছিল, সেইজন্য সহসা সংযম হারাইয়া একটা যা-হোক কিছু বর্ব্বরতা প্রকাশ তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই। তিনি ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা-সাফল্যের জন্য নানা দিক দিয়া নানা কৌশল খাটাইতেছিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ। শ্রীমতী বৈষ্ণবীর নাগাল পাওয়া বড় শক্ত কথা। সে দুর্ব্বলা রমণী হৌক, কিন্তু তাহার মন কাদার মত নমনীয় নহে, পাথরের মত শক্ত। সে পাথর কুঁদিয়া—তাহার ভগবন্নিষ্ঠ প্রেমিক স্বামী একবার যে দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনশ্চ বানর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন করা বড় কঠিন। প্রতিপক্ষ নৈরাশ্যের আঘাতে ক্রমশঃ ধৈর্য্য হারাইতে বসিয়াছেন। এ অবস্থায় ধৈর্য্য ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানটা সম্পূর্ণরূপে না লোপ পায় ; সে লোকটির অবস্থাও এবার চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে—তিনি সেই পূর্ব্বকথিত ঠোরের মোহন্ত ব্রজদাস বাবাজী।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমতী বৈষ্ণবীর দিনগুলা অসহ্য হইয়া উঠিল ; হিতৈষিণী মাতাজী মহোদয়াগণের প্রশ্ন, পরামর্শ, উপদেশ এবং অন্য পাঁচজনের

শ্যেনদৃষ্টির তীব্র তাড়নায় সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল ; বাড়ী বাড়ী জল যোগাইয়া পয়সা উপার্জ্জন এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; না করিলে নয়, তাই অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া কাছাকাছি কয় বাড়ীতে জল যোগাইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাহার আগুল্ফবিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সমূলে ছেদন করিয়া যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিল। শুভাকাঙ্ক্ষিণী বৈষ্ণবীগণ ব্যাপার দেখিয়া হায় হায় করিলেন। এক একটা মানুষের সকল তাতেই বাড়াবাড়ি থাকে। কেন রে বাপু, ঐ চুলগুলাতে কি আসিয়া যাইতেছিল? চার ধাম ঘুরিয়া আসিয়া শেষে প্রয়াগে নামাইলেই ত ভাল হইত, তা না—সবই বাহাদুরী!

শ্রীমতীর বাড়ীওয়ালী চরণদাসী শ্রীমতীকে যথার্থই আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তিনি চুলগুলার কথা উল্লেখ করিয়া যখন বাস্তবিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তখন শুধু শ্রীমতী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল যে পেটের দায়ে দাসত্ব করিতে করিতে সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, আবার চুলের দাসত্ব কেন? সে আর চুলের তৈল যোগাইতে পারে না। ও আপদ বালাই, রাবণের চেড়ীর চিহ্ন সে আর মাথায় বহিতে পারে না বলিয়াই বিনাড়ম্বরে বিসর্জ্জন করিয়াছে। ইহাতে তাহার মা (চরণদাসী) যে দুঃখিত হইবে, তাহা সে মোটেই অনুমান করে নাই। চরণদাসী বৈষ্ণবী যৌবনে যাহাই থাকুন, এখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার দেখিয়া শুনিয়া ঢের অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। মতিগতিও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং শ্রীমতীর কথার উপর তিনি আর কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই।

ব্রজদাস বাবাজী লোক মারফৎ আবেদন, নিবেদনের ফল যখন একান্তই নিষ্ফল বুঝিলেন, তখন সে সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। কারণে-অকারণে শ্রীমতীর জন্য এমন ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষিতা দেখাইতে লাগিলেন, যাহা দেখা অপরের পক্ষে নিরঙ্কুশ কৌতুকের বিষয় হইলেও শ্রীমতীর পক্ষে একান্তই অসহ্য! অথচ প্রকাশ্যে এই লোকটার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেও মনে মনে সে ঘৃণা বোধ করিত।

সেদিন সকালের কূপের জল যোগাইয়া যখন শ্রীমতী ফিরিতেছিল, তখন সহসা পথের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। ব্রজদাস বাবাজী তখন কোথা হইতে গ্রন্থপাঠ করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার হাতে তখনও গ্রন্থাবলী রহিয়াছে, মেদ-বহুল প্রকাণ্ড দেহ লইয়া, মুণ্ডিত শীর্ষের উপর ক্ষুদ্র শিখাটী গ্রন্থিবদ্ধ তুলসীপত্র সহ ঝুলাইয়া, নাভিকুণ্ডের নিম্নে 'লুই'য়ের বস্ত্র পরিধান করিয়া বাবাজী খড়ম পায়ে খটাং খটাং করিয়া পথে আসিতে আসিতে উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেশে গান ধরিয়াছিলেন।—

"সাধ করে সাজায়ে বাসর, বসেছে রাই রাজবালা,
ভাবছে বসে উন্মাদিনী কুঞ্জে কখন আসবে কালা—"

দূরে শ্রীমতী আসিতেছিল। সে গায়ককে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই ; কিন্তু গানটা শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ অতীতের সুপ্ত আবেগ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল ; আহা, এ যে তাহার স্বামীর প্রিয়-সঙ্গীত! তাহার মনে পড়িল, যখন সংকীর্ত্তনস্থলে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে বনমালী দাস মুগ্ধ ভাবাবেশে করুণকণ্ঠে গাহিতেন—"ভাবছে বসে উন্মাদিনী—", তখন সত্য সত্যই যেন সুরের মধ্যে জীবন্ত ভাব জাগিয়া উঠিয়া সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইত! "সাধ করে সাজায়ে বাসর", আহা—হা! ওরে প্রেমবিহ্বল

আত্মহারা উন্মাদ জীবাত্মা, বড় আশাতেই গোপন অভিসারে বাহির হইয়াছ, বড় সাধেই বাসর সাজাইয়া পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষায় বসিয়া আছ, বড় আবেগেই অধীর হইয়া ভাবিতেছ—কখন সময় হইবে, কতদিনে সাধনা সার্থক হইবে, কত পরে— কত দেরীতে সেই সাধনার ধন সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন। কতকাল পরে এ অসহনীয় বিরহের অবসান হইবে? সহসা ও কি! আবার দূরে গায়ক গাহিল—

"পবনে শিহরে কায়, পথপানে ঘন চায়,
কাকলী লহরী ভাবে—"

আ মরি রে! তাঁহার প্রেমের স্নিগ্ধ পরশ বহন করিয়া আনিয়া—ঐ যে পবন উন্মাদিনীর সর্ব্বাঙ্গে পুলকের পরশন হানিয়া যাইতেছে। উন্মাদিনী অধীর আবেগে পথের পানে তাকাইতেছে, তাহার বক্ষের মধ্যে ঘন উল্লাসের দৃপ্ত আবেগ কাঁপিয়া উঠিতেছে। তিনি আসিতেছেন, আসিতেছেন, ঐ যে কাকলীর সুমিষ্ট ধ্বনিতে তাঁহারই বংশীর গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। এ কি ব্যর্থ? এ কি ভুল হইবার! না—না, তাহা কখনই নয়, কখনই নয়।

শ্রীমতী আর ভাবিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, চোখের জলে সে আর পথ দেখিতে পাইল না, পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দিনের সমস্ত আলো,—পথের সমস্ত কোলাহল, তাহার চক্ষু কর্ণ হইতে দূরে চলিয়া গেল, সে শুধু নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জের মধ্যে একাগ্র নিষ্ঠায় মুগ্ধ—উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, "বংশী রাধার গুণ গায়!"

"ধনি ভাবে শুনি, বংশী রাধার গুণ গায়!"

কাণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া—সঙ্গীত সহসা থামিয়া গেল। শ্রীমতীর ভাবোন্মাদনা ছুটিয়া গেল, বাস্তবের নির্ম্মম কঠোর আঘাতে ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল অদূরে গ্রন্থ-হস্তে হন্‌হন্ করিয়া দ্রুতপদে আসিতেছেন, তাহার দিকে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া, কুটিল হাসিভরা মুখে—স্বয়ং ব্রজদাস বাবাজী! তাঁহার সে হাসিতে বিষাক্ত সর্পের দংশন-উত্তেজনার ভয়াবহ লালসা যেন ঝলসিয়া উঠিতেছে, সে লালসা কি ক্রূর, কি নির্ম্মম! শ্রীমতী শিহরিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখের উপর কাপড় টানিয়া কম্পিতপদে সে ফিরিয়া চলিল।

বাবাজী আসিয়া তাহার সঙ্গ ধরিলেন। পথে দুই চারিজন লোক চলিতেছিল, আশঙ্কার কোনই কারণ নাই; তথাপি অজ্ঞাত-আতঙ্কে শ্রীমতীর কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল, কি জানি যদি বাবাজী এখনই তাহাকে কোন কথা বলিতে চাহেন? ওঃ, না—না, ভগবান তুমি রক্ষা কর! সে তোমার কথা শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে, তোমার কথাই তাহাকে শুনাও, তাহার কাণের কাছে মানুষের অকারণ কোলাহলের রোল তুলিয়া তুমি আর বাদ সাধিও না প্রভু।

শ্রীমতীর পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল, বাবাজী ধীর কদমে তাহার সহিত তালরক্ষা করিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "দেখ শ্রীমতী ঠাক্‌রুণ, তোমার জেদ ছাড়। আমি তোমার অনেক তেজবাজী সয়েছি, কিন্তু আর সইব না, তুমি মনে রেখো, আমার নাম ব্রজদাস বাবাজী।"

শ্রীমতীর বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিয়া উঠল, স্বামীর মৃত্যুর পর সে অনেকের সহিত কথা কহিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রজদাস বাবাজীর সহিত কখন ত মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই। কিন্তু আজ বুঝি তাহাকে তাহাও করিতে হয়। তাহাকে নীরবে চলিতে দেখিয়া বাবাজী অধীরভাবে বলিলেন, "শুনছ গা, মনে রেখো, আমার খুসী হলে আমি না করতে পারি এমন কাজই নেই!"

না, তাহা ত না-ই। তুমি বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ-বলদৃপ্ত গর্ব্বান্ধ মানুষ, তোমার দ্বারা কোন পৈশাচিক লীলাই অসম্ভব নয়। কিন্তু তবু—ওগো তবুও স্মরণ রাখিও, তোমার আমার খেয়ালের খুসীর উপর আর একজনের খুসী অহরহঃ স্থির জাগ্রতভাবে বিদ্যমান আছে। শ্রীমতী ধীরকণ্ঠে বলিল, "সে জানি, ভগবান যাঁকে শক্তিশালী করেন, তাঁর উচিৎ দুর্ব্বলকে রক্ষা করা। আমার মত অসহায়ের ধর্ম্ম রক্ষা করাই আপনাদের ধর্ম্ম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—", বাধা দিয়া বাবাজী বলিলেন, "আহা, ধর্ম্ম তুমি যত খুসী কর না, কে তাতে হাত দিচ্ছে? তবে কি জান? আমি একটা নেশায় পড়ে গেছি, তোমার জন্যে আমার কোন কিছুতেই মন বসছে না। তুমি আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছ। তুমি যদি—"

শ্রীমতীর বুকের মধ্যে ঘৃণার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ছি ছি ছি! হায় মানুষ, তুমি এমনই সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান জীব বটে, নিজের দুর্ব্বলতার সহিত যখন তুমি পারিয়া উঠ না, তখন নিজের অপরাধের জন্য অপরকে নিমিত্ত ঠাহরাইয়া নিজেকে প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে বেকসুর খালাস দিয়া বুক ঠুকিয়া এমনই করিয়াই বল, "দায়ী তুমি—আমি নিরপরাধ!" শ্রীমতী কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার মেয়ের মত।"

"ওসব ছেঁদো কথা রাখ, আমি এক কথার মানুষ—'হ্যাঁ', কি 'না' এক কথায় জবাব দাও।"

শ্রীমতীর রুদ্ধকণ্ঠ চিরিয়া একটি পরিষ্কার শব্দ উচ্চারিত হইল —"না।"

"বেশ, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না, সে আমিও জানি। আমার আর দায়-দোষ নেই। এবার আমার যা মনে আছে তাই করব। দেখব আমার জেদ বজায় থাকে কি না থাকে।" উত্তেজিতভাবে কথা কয়টি কহিয়া ব্রজদাস বাবাজী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বামদিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীমতী চক্ষের জল মুছিল। ওঃ, ইহাকেই অদৃষ্টের দুর্ভোগ বলে গো! না হলে ব্রজদাস বাবাজী অমন জ্ঞানী সাধু লোক হইয়া শুধু অভাগিনী শ্রীমতীকে জব্দ করিবার জন্য কেন এমন কুবুদ্ধিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন? শ্রীমতীর মনে পড়িল অনেকদিন আগের, অতীতের একদিনের কথা,—সে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। এই ব্রজদাস বাবাজীর গৃহে একদিন একটা গোখুরা জাতীয় সাপ ঢুকিয়াছিল, বাবাজীর ভৃত্য তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তাহাকে 'ব্রজধামে জীবহিংসা নিষেধ' বলিয়া বাধা দান করেন। নিজে হাততালি দিয়া ঘরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। একজন তাহার কাজ দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "বাবাজী, হিংসুকের হিংসেয় দোষ আছে কি?" বাবাজী উত্তর দিয়াছিলেন, "সে বিচারের অধিকারী আমি নই।" হায় রে অদৃষ্ট, আজ সেই ব্রজধামে বসিয়াই সেই বাবাজীই স্বয়ং একটি নিরপরাধ অনাথা অভাগিনীর সর্ব্বনাশের জন্য মস্তিক এমন বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন? তুলুন তুলুন,

বাবাজীর কোন দোষ নাই, এ সবই ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য! হে নারায়ণ, যাহা হয় হোক, তাহাকে শুধু সহ্য করিবার শক্তি দাও!

শ্রীমতী আসিয়া চরণদাসীর বাড়ীতে ঢুকিল। চরণদাসী তখন পূজাহ্নিক সারিয়া জলযোগান্তে দাওয়ায় বসিয়া ঘুন্‌সী বিনাইতেছিলেন। তাহার অদূরে বসিয়া শ্রীমতীর ক্ষুদ্র সুকুমার শিশুটী এক যোড়া 'বোলো'-হীন খড়ম লইয়া, নিবিষ্টচিত্তে খেলা করিতেছিল। শ্রীমতী প্রাঙ্গণে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "খোকা!"

শিশু মাতাকে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে চক্ষু বুজিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুন্দ-ধবল দন্তগুলি বাহির করিয়া—হি-হি-হি-হি শব্দে হাসিতে হাসিতে মোটা মোটা ক্ষুদ্র সুন্দর চরণদ্বয় অসামঞ্জস্য গতিতে থপ থপ করিয়া ফেলিয়া মাতার দিকে অগ্রসর হইল। মাতা যথাস্থানে ঘড়া রাখিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইলেন, "আঃ খোকা, বাপ আমার ; আজ যদি তুই না থাকতিস বাবা, তা হলে—", শ্রীমতীর চক্ষু দিয়া যত্নরুদ্ধ বেদনাশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

৪

সন্ধ্যার মুখ-আঁধারি ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যায় চরণদাসী গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া শ্রীমতীর পুত্রটীকে আটকাইয়া রাখিবার লোক ছিল না। শ্রীমতী তাহাকে কোলে লইয়া বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট ঘাটে কাপড় কাচিতে বাহির হইয়াছিল—যমুনার এ-ঘাটে কেহ স্নান করিত না, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ঘাট ব্যবহৃত হইত। ঘাটের দুই পাশে ঝোপঝাপ জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। তাহারই মধ্যে ঘাটে আসিবার সরু একটু পথ। শ্রীমতী খোকাকে সেই পথের উপর কতকগুলি পাথরের নুড়ী লইয়া খেলা করিতে বসাইয়া দিয়া নিজে জলে নামিয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিল।

গতকল্য রাত্রি হইতে তাহার কিছুই আহার হয় নাই। আজ সারাদিন সে ইচ্ছা করিয়াই কোন কাজে বাহিরও হয় নাই;কিছু খায়ও নাই। তাহার সমস্ত শান্তি ও শক্তিকে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া এমনই একটা দুঃসহ ঘৃণা ও বেদনা বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে যে, তাহার চাপে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে কেবলই আত্মহত্যার সঙ্কল্প জাগিতেছে, কিন্তু খোকাব মুখপানে চাহিয়া সে আত্মদমন করিতেছে। হায়, তাহার মৃত্যুতে অনেকের দুশ্চিন্তা ত দূর হইবে। কিন্তু এ অজ্ঞান বালককে মাতৃহীন করার জন্য তাহাকেও কি ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না? না, সে তাহা পারিবে না ; ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, সে শেষ পর্য্যন্ত শুধু সহ্য করিয়া চলিবে।

কাপড় কাচিয়া শ্রীমতী ডাঙ্গায় উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে লইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ পাশের ঝোপের ভিতর হইতে কয়জন লোক লাফাইয়া বাহির হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের মূর্ত্তি দেখাইল ঠিক যমদূতের মত! শ্রীমতী চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাগো—"

সঙ্গে সঙ্গে দুইজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। শ্রীমতীর

শ্বাসরোধ হইল ; সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অপর ব্যক্তি স্তম্ভিত রোরুদ্যমান শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিল।

অদূরে তীরের কাছ ঘেঁসিয়া নিঃশব্দে স্রোতের মুখে একখানা পান্সী ভাসিয়া আসিতেছিল। পান্সীর মধ্যে একজন আরোহী ও দাঁড়ী মাঝি ছাড়া অপর কেহ ছিল না। সহসা তীরের কাছে "মাগো" শব্দ শুনিয়া মাঝি বৈঠা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ সতর্ক নয়নে চারিদিক চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে শুধাইল "কে গা—"

কেহ উত্তর দিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে তীরে কতকগুলা লোকের ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি অস্পষ্টভাবে অনুভূত হইল। একটি শিশুকণ্ঠের রুদ্ধ ক্রন্দনাবেগও যেন শোনা গেল! মাঝি ডাকিল, "গোঁসাইজী!"

"কি বল্‌ছ, হরিদাস?" সৌম্য শান্ত মনোজ্ঞ-দর্শন এক শুভ্রবেশধারী বৃদ্ধ নৌকার মধ্য হইতে বাহির হইলেন। বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় ভক্তি ও করুণার জ্যোতিঃ যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। ইনি যশোহর জেলার কোন গ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার রাধানাথ গোস্বামী মহাশয়। নিজের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী, বিপুল আয়-সম্পন্ন ব্যবসায়, সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রবর্গকে দান করিয়া নিজে এখন বৃন্দাবনে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে দীনবেশে হরিনাম সার করিয়া দিন কাটাইতেছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য শতাধিক মুদ্রা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু অত আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধনার পক্ষে অনর্থক বিঘ্নকর ব্যসন-উৎসব বলিয়া, এই নিস্পৃহ সদানন্দ পুরুষ তাহা পরিহার করিয়া, মাসিক মাত্র দশটি মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। ইঁহার পুত্র পরিবারাদি কেহ নাই। ইঁহার সহিত ইঁহার জমিদারীর পুরাতন নগদী স্বেচ্ছায় বিধবা কন্যা ও দৌহিত্র লইয়া দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত মাঝি, তাহার নাম হাবুল মিঞা। হাবুল তাহার ভক্ত প্রভুর মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে আল্লার নাম লইয়া সারাদিন যমুনায় নৌকা বাহিত, সন্ধ্যার পর প্রভুর আশ্রমের দ্বারে আসিয়া বসিয়া ধর্ম্মালোচনা শুনিত। সেইজন্য প্রভু আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন "হরিদাস"।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রশ্নে হরিদাস কোন উত্তর দিল না। সে উৎকর্ণ হইয়া তীরের গোলমাল শুনিতেছিল। সহসা সে "খবরদার শয়তান!" বলিয়া, চক্ষের নিমেষে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ; সঙ্গী দাঁড়ীকে ডাকিয়া বলিল, "নৌকো তীরে ভিড়ো।"

মাঝির হুঙ্কারে ভয় পাইয়া তীরের লোকগুলা কি একটা গুরুভার জিনিস ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু তাহাদের একজন সঙ্গী সেরূপ পলায়নে সমর্থ হইল না। সেও ক্রোড়স্থ শিশুকে ফেলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মাঝি জল হইতে উঠিয়া বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল। সে বজ্র নিষ্পেষণে দম বন্ধ হইয়া লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "বাপ!"

মাঝি তাহাকে হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিল, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া পরুষকণ্ঠে কহিল, "ব্রজদাস বাবাজী!"

নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল, দাঁড়ীর সহিত গোস্বামী মহাশয় তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু সেখানকার সাংঘাতিক দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—দেখিলেন ঘাটের পাশে এক সুন্দরী তরুণী সংজ্ঞাহীনা অবস্থায়

মৃতের মত পড়িয়া আছে ; তাহার শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে কি না সন্দেহ। রমণীর মুখ দিয়া ভল-ভল করিয়া শোণিত-স্রোত নির্গত হইতেছে, বুঝি সজোরে আছড়াইয়া পড়ার দরুণ, ফুসফুস ফাটিয়া গিয়াছে। দূর হইতে হামা টানিয়া আসিয়া একটি সুকোমল মূর্ত্তি কচি শিশু রমণীর বুকের উপর পড়িয়া ভয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে কাঁদিতেছে "মা—মা—মা!"

বৃদ্ধ গোস্বামী অশ্রুসজল নয়নে, কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "গোবিন্দ, এ কি লীলা প্রভু?"

মাঝি গর্জ্জিয়া বলিল, "ঠাকুর ঠিক করে বল, যারা ছুটে পালাল তারা কে?"

মাঝির নিষ্করুণ হ্যাঁচকানিতে বেদনায় নুইয়া পড়িয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওরা—ওরা —ওরা আমারই লোক—মথুরার গুণ্ডা, আমি ওদের—"

বজ্রস্বরে উত্তর হইল, "তুমিই ওদের নিশানদার? ওঃ, আচ্ছা ঠিক করে বল, এ মেয়েমানুষটী তোমার কে?"

কম্পিত স্বরে ব্রজদাস বাবাজী বলিলেন, "আমার কেউ না। ও বনমালীদাস বাবাজীর বিধবা—আমি কণ্ঠিবদল করতে চেয়েছিলুম ; কিন্তু বৈষ্ণবী রাজি হয়নি, তাই—"

"তাই গুণ্ডা নিয়ে ওর উপর শয়তানি দেখাতে এসেছ? বাঃ! তুমি বৈষ্ণব? গলায় দড়ি দিতে পারনি বাবাজী? গোসাইজী, আপনি বলুন, নিত্যানন্দ ঠাকুর পথের ধুলো মাথায় তুলে, যে ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেছিলেন, সে ধর্ম্ম কি এই?"

রুদ্ধকণ্ঠে বক্ষের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া, গোস্বামী বলিলেন, "না, আজ, অনাচার পাপে,-সে ধর্ম্ম আত্মঘাতী হতে বসেছে!"

"বৈষ্ণবের এ অপরাধের জন্য দায়ী কে?"

"দায়ী তুমি, দায়ী আমি, দায়ী প্রত্যেক বৈষ্ণব! হরিদাস, বাবাজীকে ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব?"

স্থির কণ্ঠে উত্তর হইল, "হাঁ।"

"বেশ, মনিবের হুকুম চিরদিন মাথা পেতে মেনেছি, আজও মানছি। আর একদিন এম্নি দুজন উদ্ধত বৈষ্ণবের কাছে বিনা অপরাধে, আপনি নিজের জমিদারীতে দাঁড়িয়ে খড়মপেটা হ'য়ে যোড় হাত ক'রে ক্ষমা চেয়েছিলেন ; গোলাম সে কাণ্ড বরদাস্ত করতে পারেনি, লাঠি তুলেছিল—সেদিনও আপনি এমনি করে বলেছিলেন, 'সরে দাঁড়া।' সেদিন তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম ; আজ আপনার হুকুমে একেও ছেড়ে দিচ্ছি—", মাঝি ব্রজদাস বাবাজীকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, যোড় হাত করিয়া বলিল, "সেদিন নিজের অপমান নিঃশব্দে সয়েছিলেন, সেজেছিল। কিন্তু আজ এ রাধারাণীর ব্রজভূমিতে মা-জননীর এ অপমান, এর ন্যায্য বিচার চাই।"

মাঝি হাত ছাড়িয়া দেওয়ার পর ব্রজদাস বাবাজী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রজদাস, ওঠ ; বসে থাকার সময় নয়, যাও যমুনার জলে কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে এস, মার মুখে দাও।"

"আমি দেব?" ব্রজদাস বাবাজী ব্যাকুলভাবে চাহিলেন। ধীরভাবে গোস্বামী বলিলেন, "হাঁ, তোমাকেই দিতে হবে, যাও।"

বাবাজী মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিতভাবে চাহিলেন। তাহার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে জল আনিতে গেলেন। গোস্বামী মহাশয় আসিয়া মূর্চ্ছিতার শিয়রে বসিলেন। সন্তর্পণে তাহার বক্ষস্পন্দন পরীক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রজদাস, শীঘ্র—"

মাঝির দাঁড়ী, এতক্ষণ শিশুটিকে বুকে তুলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া বলিল, "হুজুর, বৈদ্য দেখব কি?"

"বৈদ্য!" বৃদ্ধ গোস্বামী নীরব হইলেন। ব্রজদাস বাবাজী ছুটিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিতার মুখে জলের ঝাপ্টা দিলেন, কিন্তু ব্যর্থ—সবই ব্যর্থ হইল। রমণী অস্ফুট শব্দ করিয়া একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, তাহার পর সব স্থির।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ গোস্বামী নির্নিমেষ নয়নে মৃতার মুখপানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ব্রজদাস বাবাজী শবের মত পাংশু মুখে, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাঝি ডাকিল, "গোঁসাইজী।"

"চুপ কর, হরিদাস; আমি 'গোবিন্দ'র নাম ভুলে যাচ্ছি।" বৃদ্ধ গোস্বামী দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। ব্রজদাস বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত ঝঞ্ঝনা বহিয়া গেল। বৃদ্ধ গোস্বামীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি মহাপাপী, নারীহত্যা করলুম, আমায় শাস্তি দিন, আমায় মৃত্যু-দণ্ড দিন।"

"মৃত্যু-দণ্ড! সে ত তোমার দেহকে হত্যা করা, বাবাজী ; কিন্তু অপরাধী যে, তোমার মূঢ় প্রবৃত্তি! তার শাস্তি সংস্কার ত তাতে হবে না।" বৃদ্ধ গোস্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "হরিদাস,আজ তোমার মুখে আমি তাঁর আদেশ শুনেছি। তিনি আমাদের যে শক্তি সামর্থ্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমরা সত্যই সে সামর্থ্য নিয়ে অন্ধ অভিমানে যথেচ্ছাচারিতা করছি, আমরা তাঁর কাজের চেয়ে নিজেদের খুসীটাকে বড় করে তুলেছি। তাই এ শাস্তি। কিন্তু না—না, আজকের এ মৃত্যুকেও তোমরা ব্যর্থ বলো না, এ ব্যর্থ নয়, আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, এই অপঘাতের সংঘাতেই আজ আমাদের বুকের ওপর থেকে একটা জমাট অসাড়তা নেমে গেল। আমাদের সাধনার মধ্যে যেখানটায় স্বার্থের দুর্ব্বলতা আছে, সেইখানটাকে আঘাত করার জন্যই এ অভিনয়ের সৃষ্টি! না, এ বেদনা আমাদের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, জীবন দিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ব্রজদাস!"

যন্ত্রণা-পীড়িত কণ্ঠে ব্রজদাস বাবাজী বলিলেন, "বলুন, যত কঠোর, যত দুর্ভরই হোক, আমি আমরণব্যাপী ধৈর্য্যে আমার এ গুরু পাপের প্রায়শ্চিত্ত পালনে প্রস্তুত।"

বৃদ্ধ গোস্বামী শান্ত-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "বুঝি তোমার মত জ্ঞানী কর্ম্মঠের অব্যবস্থিতচিত্ততা সংশোধনের জন্য—তোমায় এমন দৃঢ়ভাবে কর্ম্মে প্রস্তুত করবার জন্যেই ভগবান এই নির্ম্মম রহস্যলীলা প্রকট করেছেন। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করতে হয়, জান ত ব্রজদাস?"

"জানি।"

"তবে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হও। এই অসহায় নিরপরাধ সরল বুদ্ধি রমণীগণের রক্ষার বিধান কর। এদের আত্মরক্ষার জন্য—আত্মোন্নতির জন্য প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত কর্ম্ম শিক্ষা দাও। বৈরাগীকে যথার্থ জিতেন্দ্রিয়তা, নিস্পৃহতা, সত্যপ্রেমের

বৈষ্ণবীয়তা শিক্ষা দাও। আর আমিও এবার কায়মনে আমার ত্যাগ অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত করব। এই ক্ষুদ্র অনাথ শিশুর—"

যোড় হাতে সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মাঝি বলিল, "গোঁসাইজী, একদিন রোজা উপবাসের পর, এই অভাগার মুখে জল দিয়ে, ইনি আমার মাতৃত্ব, আমার কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন ; আজ আমি সে সম্পর্কের মর্য্যাদার দাবী করতে পারি না কি? আমারও এমনি মেয়ে আছে, আমারও এমনি নাতী আছে। আপনি বলুন, সে জলের ইমানদারী করতে—এ বাছাকে কি আজ আমি বুকে তুলে নিতে পারি না?"

বৃদ্ধ গোস্বামী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর অশ্রুসজল নয়নে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাই হোক, হরিদাস। একদিন আদর্শ বৈষ্ণব জগৎপূজ্য হরিদাস যবনের গৃহে পালিত হয়েছিলেন ; কিন্তু তাতে তাঁর আত্মা ত পতিত হয়নি, তাঁর মহামহিম স্মৃতি আজও আমাদের প্রণম্য পূজ্য হ'য়ে আছে। আজ এ মাতৃহীন শিশুকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবাব অধিকাব আমার নেই। তুমি এর প্রতিপালনের ভার নাও। কিন্তু আজ থেকে এই অনাথ শিশুদের জন্য, এই অপঘাত মৃতার মত অসহায় নারীদের জন্য রাধানাথ গোস্বামীর সমস্ত আয় নির্দ্দিষ্ট রইল। তিনি আমায় অর্থের অধিকারী ক'রেছিলেন,—তা যে ত্যাগ-অভিমানের উপর যথেচ্ছারিতায় ধনীব বিলাস-সম্ভোগে বিতরণ করবার জন্য নয়, তাঁর রাজ্যের এই পীড়িত, দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত্তদের সেবায় অর্থব্যয় সার্থক করবার জন্য —সে কথা আজ বুঝেছি! যাক, ব্রজদাস, মৃতার সৎকারের ব্যবস্থা কর।"

থিয়েটার-দেখা

১

রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় গালিচার উপর বসিয়া উজ্জ্বল আলোর সামনে মাথা হেঁট করিয়া নন্তু মখমলের জুতায় রেশমের ফুল তুলিতেছিল। নন্তুর বয়স বছর এগারো, প্যাৎলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মুখশ্রী অতি সরলতার ও কোমলতার সমাবেশে মনোরম সুন্দর, রং ফর্শা। নন্তুর ডানপাশে বড়দিদি বিমলা বসিয়া একখানা বাংলা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। আলোর অপরপাশে বড় জামাইবাবু অর্থাৎ বিমলার স্বামী বিপিনবাবু একটা তাকিয়া হেলান দিয়া শুইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখে করিয়া, খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। বারাণ্ডার অন্যপাশে দোলনায় শুইয়া বিমলার তিন মাসের খোকাটি অগাধে ঘুমাইতেছিল। সকলেই নীরব, শুধু গুড়গুড়ির মৃদু-গম্ভীর-অলস-আর্ত্তনাদ এক-যাই ধ্বনিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে খবরের কাগজখানা শেষ করিয়া বিপিনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বড়দিদি বই হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "খাবার দিতে বলব?"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আঃ, এর মধ্যে! নটা বাজুক-ই না। হার্ম্মোনিয়ামটা নিয়ে আসি, নন্তু জুতো সেলাই রেখে সোজা হয়ে বস—"

নন্তু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষিপ্র কৌশলে সুঁচ চালাইতে চালাইতে সবিনয়ে বলিল, "তা বলে জুতো সেলাই ছেড়ে আমি এখন চণ্ডীপাঠ ধরতে পারব না জামাইবাবু, লক্ষ্মিটী, এখন বলবেন না।—"

টেবিলের উপর হইতে হার্ম্মোনিয়াম পাড়িয়া চাবি টিপিয়া ধরিয়া বিপিনবাবু বলিলেন, "লক্ষ্মিটী বল, আর দুষ্টুটাই বল, আমি ছাড়চি নে। গাও 'প্রলয় পয়োধি জলে'—"

ঘাড় নাড়িয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে নন্তু বলিল, "ওমা! প্রলয় না হলে বুঝি 'প্রলয়-পয়োধি-জলে' গান করা হয়—"

বিপিনবাবু বলিলেন, "দেখবে, প্রলয় হওয়ার? ঐ সুঁচ সুতো কেড়ে নিলেই এখুনি—"

সভয়ে নন্তু বলিল, "না জামাইবাবু, আপনার পায়ে পড়ি,—"

বড়দিদি বইখানা মুড়িয়া গালিচার উপর শুইয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন, "গা না বাপু, কদিন ত গাস নি,—হাফ্ইয়ার্লি একজামিন হয়ে গেলে গান শোনাবি বলেছিলি মনে আছে?"

অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নন্তু বলিল, "এই! দিদি সুদ্ধ জামাইবাবুর দিকে হয়ে দাঁড়ালে! তোমাদের জ্বালায়, সত্যি আমার আর কিছু হবে না, কিছুটী না!—"

বিপিনবাবু একটা সুর আরম্ভ করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন, "এত বিদ্যের পরও 'কিছুটী না?' সে কি? আরসুলোর বাচ্চা ছারপোকা বিছানায় থাকে কেন? না —পাখা নেই, ছেলেমানুষ উড়তে পারে না বলে!—কুমীরের বাচ্চা টিকটিকি দেযালে বেড়ায় কেন? না—কচি ছেলে, জলে নামলে সর্দ্দি করবে বলে! পায়রাগুলো বকবকম বকতে বকতে টবে মাথা ডুবিয়ে চান করে কেন? না, এইচ. বসুর কুন্তলীন তৈল মাখিয়ে দেওয়া হয়নি, সেই দুঃখে! এমন অগাধ বিদ্যের পরও কিছু না!— একি আশ্চর্য্য কথা!"

বলা বাহুল্য, উক্ত অগাধ বিদ্যাগুলা,—নন্তুর শৈশব জীবনের স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল! লজ্জায় অস্থির হইয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, তা বই কি! যান্! আমি কিছুতেই না! আপনি সুঁচই কাড়ুন আর সূতাই কাড়ুন আমি কিছুতেই না! এইখানে শুয়ে চুপটী করে ঘুমিয়ে পর্‌ব সেও ভালো,—তবুও না!"

টপাটপ্ চাবির উপর আঙ্গুল চালাইয়া বিপিনবাবু—সঙ্গীতকলার নির্দ্দিষ্ট সুর তালের সাক্ষাৎ আদ্যশ্রাদ্ধস্বরূপ অসহনীয় বেসুরা চীৎকারে গান ধরিলেন, "ও বাবা, কি কালো!"

নন্তু হাসিয়া ফেলিল! সেলাই হইতে চোখ তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া কৌতুক-কোমল কণ্ঠে বলিল, "দেখছ ভাই দিদি। সাধে বলি, পুরুষ মানুষদের গান শুনলে আমার বড্ড হাসি পায়। চ্যাচানর দৌড় দেখ দেখি!—ও বাবা! উঃ, কি চীৎকার! যেন কেউটে সাপ দেখে লাফিয়ে উঠলেন! ওমা একি? এর নাম গান?—"

"তবে রে দুষ্টু।—" বলিয়া বিপিনবাবু হার্ম্মোনিয়াম ছাড়িয়া নন্তুর দিকে অগ্রসর হইলেন, নন্তু চক্ষের নিমেষে সেলাই ফেলিয়া লঘু লম্ফে ছুটিয়া বারাণ্ডার দুয়ারের দিকে দৌড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অলঙ্কার ও সুবসনে সুসজ্জিতা এক ষোড়শী সুন্দরী হাসিমুখে ব্যস্তভাবে বারাণ্ডায় ঢুকিয়াই—সহসা নন্তুকে সামনে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ কিরে! এমন করে ছুটছিস কেন?"

ষোড়শীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার আড়ালে নিজেকে উত্তমরূপে নিরাপদ করিয়া নন্তু অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিল, "দ্যাখো না ভাই মেজদি, জামাইবাবু আমায় ধর্‌তে আসছেন—"

পিছনে দুহাত ঘুরাইয়া, ছোট বোনটিকে সাদরে বেষ্টন করিয়া মেজদি হাস্যোজ্জ্বল মুখে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বটে। এত অত্যাচার! এমন অরাজকতা! আপনি কি রকম ভদ্রলোক বলুন ত?—"

বিপিনবাবু যারপরনাই বিস্ময়ের সহিত পিছু হঠিতে গিয়া বলিলেন "ও বাবা! এ কি! আচম্বিতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ।"

মেজদি স্মিতমুখে বলিল, "সেটা অত্যাচারীর চোখে। অত্যাচার পীড়িতের চোখ নিয়ে যদি দেখতে পারেন, তবে এ অধমের চেহারাটা অন্যরকমই দেখতে পাবেন, না হয় দয়া করে মাইক্রোশকোপটা চোখে আঁটুন—"

সহসা অপরিসীম উৎসাহের সহিত বিপিনবাবু বলিলেন, "গুড ইভনিং মেম্‌সাহেব। কামিং, কামিং, বসুন এই ইজিচেয়ারটায়। কইরে, সিগার কেসটা কোথায় গেল—"

মেজদির উপর এতটা অবিচার নন্তুর মোটেই সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি মেজদির বাঁ দিক হইতে মুখ বাড়াইয়া সকোপে বলিল, "আহা, নিজেদের যেমন বিদ্যে। রাতদিন ঐসব অসভ্য অসভ্য নেশা নিয়ে পড়ে আছেন, আবার মেজদির নাম করা হচ্ছে। মেজদি কেন সিগারেট খাবে, আপনি খানগে।"—

নন্তুকে টানিয়া লইয়া গালিচার দিকে মেজদি অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বিপিনবাবু শশব্যস্তে বলিলেন, "আহা, ওদিকে কোথা মেমসাহেব? এই যে চেয়ার"—

মাথা নাড়িয়া সুকোমল কণ্ঠে মেজদি বলিল, "আমি মেমও নই, সাহেবও নই, খাঁটি বাঙালী। আমার পক্ষে বাংলা গালচেই ভাল, বিশেষ আমার দিদি ওখানে বসে রয়েছেন। তা ছাড়া গুরুজনের সামনে উচ্চ আসনে বসাটাও অবিধেয়—"

নন্তু মাঝখান হইতে টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, "সে বুদ্ধি কি ওঁর আছে? তা হলে কি আর আমাদের সামনে ভুড়ুক ভুড়ুক করে অসভ্যের মত তামাক টানতে পারেন! মাগো, ছিঃ।—" কথাটা বলিতে বলিতেই সাগ্রহে মেজদির মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবু এসেছে?"

বিপিনবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কেন? এতক্ষণ মেজ জামাইবাবুর জুতো সেলাই হলো, এবার গোঁফে তা লাগাতে হবে বুঝি?"

অসহিষ্ণু হইয়া নন্তু বলিল, "কেনই বা হবে না? মেজ জামাইবাবু তো আপনার মত অসভ্য নন, সেইজন্যেই তো তাঁকে ভালবাসি—"

বিপিনবাবু সশব্দে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহা আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "এ্যাঁ। একবারে কবুল জবাব। প্রতিমা দেবী সাবধান সাবধান, আর রক্ষা নাই—"

প্রতিমা,—অর্থাৎ মেজদি স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিল, "প্রতিমা দেবী সাবধান ছেড়ে, খোশ মেজাজে দানপত্র লিখে দিতে রাজী আছে, আপনি তো এ্যাটর্ণি মানুষ জামাইবাবু, আপনি ঘটকালীটা—"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া মেজদির মুখ চাপিয়া ধরিয়া সলজ্জ অনুনয়ের স্বরে নন্তু বলিল, "না ভাই ছিঃ, ও কি ভাই মেজদি। আমি কি ভাই তাই বলছি,—আমি বলছি ভাই, —এই আমি কিনা মেজ জামাইবাবুকে, ভাই,—বেশ আন্তরিক ভালবাসি—"

হাতের উপর হাত চাপড়াইয়া উল্লসিত চীৎকারে বিপিনবাবু বলিলেন, "এ্যা—এই, কবুলের ওপর কবুল,—ডবল কবুল! শুধু ভালবাসা নয়, বেশ আন্তরিক ভালবাসা! বাপ, ভয়ানক ঘোরালো ব্যাপার।"

লজ্জায় দুঃখে অস্থির হইয়া, অধৈর্য্যভাবে বিপিনবাবুর পায়ের পাতার উপর এক চড় বসাইয়া দিয়া, নন্তু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি তাই বলছি না কি! হ্যাঁ, যান, আমি আপনার সামনে আর আস্‌ব না—যান।"

সে ছুটিয়া নীচে চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনবাবু ধরিয়া ফেলিলেন। পালাইবার পথেও বাধা পাইয়া ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িয়া, সে দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। বিপিনবাবু তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া—ক্রন্দন-সুর অনুকরণের ব্যর্থ-চেষ্টায়, হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে গলার স্বর কাঁপাইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে, সহানুভূতি জ্ঞাপন আরম্ভ করিলেন, "আহা মরে যাই, মরে যাই, সত্যযুগ থেকেই এ এক ব্যাপারই চলে আসছে,—ভালবাসার পরিণাম— কান্না, কান্না, শুধুই হৃদয়-বিদারক কান্না! আহা, কি অনুতাপ। রুমালটা কই,—থাক, এই কোঁচার কাপড়েই চোখগুলো মুছিয়ে দিই—এস—", সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্তু তাহার হাতের উপর আর এক চড় বসাইয়া দিয়া, কোঁচার কাপড়টা মুখে চাপিয়া ধরিয়া দুঃসহ শোকাকুল কান্নার মাঝেই, অকস্মাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিপিনবাবু তৎক্ষণাৎ হার্ম্মোনিয়ামটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাবি টিপিয়া গান আরম্ভ কবিলেন, "ছি, ছি, ছি করলি কি লো সর্ব্বনাশি।"

বড়দিদি এতক্ষণ অবাক হইয়া ইহাদের কীর্ত্তি কারখানাগুলা দেখিয়া যাইতেছিলেন, এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তানসেন মশাই সুর থামাও,—মা গো মা, কি হুড়োহুড়িই জুড়েছে। মানুষটা বাড়ী এল, তা একথা জিজ্ঞাসা করবার সময় নাই, ও কি বিটকেলে কাণ্ড, থাম এবার একটু—"

বিপিনবাবু হার্ম্মোনিয়াম ছাড়িয়া হাত পা গুটাইয়া সহসা নিরীহ ভালমানুষের মত নিঝুম হইয়া বসিলেন। নন্তু মুক্তি পাইয়া মাথার খোঁপাটা ঠিক করিয়া লইতে লইতে, বিপিনবাবুর দিকে চাহিয়া জনান্তিকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "দিদির কাছেই ঠিক জব্দ। কেমন শাসন? বেশ হয়েছে, এইবার আমার মনে যা সুখ হচ্ছে।—"

বিপিনবাবু অত্যন্ত নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

নন্তু মেজদির গা ঘেঁসিয়া, কথোপকথন শুনিতে বসিল।

২

বড়দিদি বলিলেন, "হ্যাঁরে মনসা ; তুই কার সঙ্গে এলি?"

প্রতিমাকে ছেলেবেলা হইতে তিনি আদর করিয়া মনসা বলিয়া ডাকিতেন। দিদির প্রশ্ন শুনিয়া, সঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়া সে হাসিমুখে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া,

বিপিনবাবু—অতীব কোমল সুরে বলিলেন, "মুন্সিও সঙ্গে এসেছেন, সে বিষয়ে নাস্তি সংশয়ঃ—"

নন্তু অপ্রসন্নভাবে বলিল, "আহা তিনি মুন্সি হবেন কেন? তিনি ত দালাল গো—"

মেজদি তাহার পিঠে একটা ছোট চড় বসাইয়া দিয়া সস্মিত মুখে বলিল, "তুই থাম না, নন্তু,—একতরফাই ডিক্রি হয়ে যাক-না—"

দিদির উপদেশে সান্ত্বনালাভ করিয়া, নন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সাহসে ভর দিয়া বিপিনবাবুর দিকে একটা অবজ্ঞার কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "তাই বটে! মিছে কি? সাধে, লোকে বলে, বোকা উকীল না হলে কেউ মুন্সফীও করে না, এ্যাটর্ণীও হয় না, হুঁ।" কথাটা শেষ করিয়াই সে মেজদিকে খুব শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া বসিল, অবশ্য সেইসঙ্গে বিপিনবাবুর দিকে সন্দিগ্ধ-নজর রাখিতেও ভুলিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ চক্ষু বুজিয়া নীরবে রহিলেন।

ক্ষণপরে বিপিনবাবু উঠিয়া জুতা পায়ে দিতেছেন দেখিয়া প্রতিমা বলিল, "কোথা যাচ্ছেন [জামাইবাবু]?"

বিপিনবাবু বলিলেন, "সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরোয়ানকে ধরে আন্‌তে, আহা বেচারী একলা নীচে বসে আছে!"

প্রতিমা বলিল, "বেচারীর জন্যে অত আহা উঁহু করতে হবে না। তিনি মাসিমার কাছে বেশ বসে আছেন। আপনি খেয়েদেয়ে কাপড় পরে নিন, থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "থিয়েটার!"

প্রতিমা তাঁহার বিস্ময় ভাবে দৃকপাত না করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিল, "গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দিদি, তুমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নাও—"

দিদি সভয়ে বলিলেন, "ও বাবা, এই কচি ছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়া, সে আমি পারব না। তারপর রাত জেগে কাল আমার অসুখ হলেই, ছেলেসুদ্ধ ভুগ্‌বে।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "এবং ডাক্তারের ফি ও ঔষধের মূল্যের জন্য নিরপরাধ ছেলের—"

দিদি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, কি যে বল তুমি। মনসা, না ভাই, থিয়েটার-ফিয়েটারের হুজুগ তুলিস্‌নি, এসেছিস বেশ করেছিস, বোস, গল্প কর দু' দণ্ড—"

মনসা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হবে না দিদি, আজ —থিয়েটারের—প্লে হচ্ছে। আজ যেতেই হবে, আমি বলে কত কষ্টে মত করিয়ে তবে এসেছি—"

বিপিনবাবু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "একে হুতাশন বিশ্বদাহক্ষম, তাহাতে ইন্ধন, তাহাতে বাতাস। দাঁড়াও দেখাচ্ছি থিয়েটার। দালালীর কাঁচা পয়সার থলি কেড়ে নিচ্ছি—"

তিনি দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন।

অসম্মতা দিদির সম্মতি আদায়ের জন্য মনসা তুমুল বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আজিকার মত অভিনয় বহুদিন হয় নাই, বহুদিন হইবার সম্ভাবনাও নাই,—এই অজুহাতে দিদিকে সে দৃঢ়ভাবেই চাপিয়া ধরিল,—যাইতে হইবেই। দিদি অবশ্য পূর্ব্বে এসব বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহশীলা ছিলেন, কিন্তু আজকাল একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রতিমার পক্ষে, হয় দিদি, নয় তাহার স্নেহময়ী ননদিনী ছাড়া, অন্য কাহাকেও সঙ্গিনী করিয়া এসব ব্যাপারে কোথাও বাহির হইতে ইচ্ছা করে না, তাহার মত এ সকল ক্ষেত্রে, —দিদি ও ননদিনী ছাড়া আর সকলেই আনাড়ী। ওদিকে তাঁহারা দুইজনে এখন সন্তানের মা হইয়া সংযম বৈরাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে বসিয়াছেন, অনাবশ্যক হুজুগে আর যোগ দিবেন না। প্রতিমা চটিয়া গিয়া বলিত, "এগুলো [নিছক] আলসে কুঁড়েমির চিহ্ন, আর ধিঙ্গী হয়ে পড়ার লক্ষণ!"

ইহার উত্তরে উভয়পক্ষই সস্নেহ ক্ষমার সহিত [তাহার] ভবিষ্যত জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করিবার [উপদেশ] দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই।

প্রতিমার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দিদি অবশেষে যখন 'অগত্যা আজকের মত' নিমরাজী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কখন বিপিনবাবু প্রতিমার স্বামী নবীনকে লইয়া বারাণ্ডায় ঢুকিয়া একেবারে প্রবল কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন— "দেখছ, স্বয়ং মনসা ঠাকুরাণী,—তার ওপর আবার ভক্তিভরে তুমি অর্ঘ্য দিতে সুরু করেছ কি না, ধুনোর ধোঁয়া। নির্ব্বোধ যুবক, এই পরিণামটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? এঁদের অত্যাচার এবং অনাচারের চোটে, বাঙালী সমাজের সামাজিক বিশেষত্ব ধ্বংসপ্রায় হতে বসেছে —স্পষ্টই দেখছ এরা এক একজন —এক-একটি আস্ত সফ্রিজেট্ হয়ে দাঁড়াতে সুরু করেছেন—"

প্রতিমা ঘোমটার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ-হাস্যে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "তা নুলো ঠুঁটো সফিজেট হওয়ার চেয়ে আস্ত সফিজেট হওয়াই ভাল জামাইবাবু, গৃহস্থালীর কাজগুলোও তো করতে হবে।—"

সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া—যেন শুনিতেই পান্ নাই, এমনি ভাবে বিপিনবাবু বলিলেন, "এদের ভবিষ্যৎ ভেবে আমার [মাথা] ঝিম্‌ঝিম্ করছে।"

নন্তু মাঝখান হইতে খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"তা, স্মেলিং [সল্ট] একবার শুঁকে নিন-না, ঝাঁ করে ঝিন্ ঝিনী ছেড়ে যাবে'খন!"

"অপারগ।" বলিয়া বিপিনবাবু হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "বস নবীন, —যাক ওসব ভাবনা বৃথা। তা হ্যাঁ হে নবীন, এখন তুমি কাকেও—বেশ আন্তরিক ভালবেসেছ কি? বল দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে, নন্তুর অলক্ষ্যে একটা গোপন ইঙ্গিত।

নবীন এতক্ষণ নিঃশব্দেই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। প্রিয়তম ফুটবল গ্রাউণ্ডে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ছাড়া, অন্য সর্ব্বত্রই সে অতি নিরীহ চালে চলে, ঠাট্টা-তামাসার দিকে মোটেই ভিড়ে না। সেই গুণেই নন্তু তাহার ভক্ত-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপিনবাবুর প্রশ্ন শুনিবামাত্র নন্তু অবাক হইয়া দেখিল— নবীনবাবু তাঁহার সনাতন অভ্যস্ত, সলজ্জ-নীরবতা ছাড়িয়া, সোজা নন্তুর দিকে চাহিয়া চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "বেসেছি বই কি। এই নন্তুকে—"

নন্তুর গায়ে যেন কে আগুণের ফুলকি ছিটাইয়া দিল। লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "এ্যাঁ মেজ জামাইবাবু। ও মাগো। আপনি সুদ্ধ আবার ঐসব অসভ্যতা শিখলেন! যান, আপনাদের কারুর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না, কারুর সঙ্গেই না—। এই চল্লুম এখান থেকে—"

নবীন ফুটবল খেলিয়া খেলিয়া শরীরটা বেশ মজবুত করিয়া তুলিয়াছিল, পলায়ন-তৎপর নন্তুকে টপ করিয়া তুলিয়া ইজিচেয়ারের চওড়া হাতার উপর বসাইয়া দিয়া, মৃদু হাস্যে কি একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতে করিতে, বিপিনবাবু ততক্ষণে উচ্চকণ্ঠে বাক্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, "তবে আর কি। উভয় পক্ষেই যখন বেশ আন্তরিক ভালবাসা জমে গেছে, তখন আর কি-ই-বা দেখতে হবে। কালই বহরমপুরে শ্বশুরমশাইকে লিখছি যে নন্তুর গতিমুক্তির ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে, নবীনকেই সে বিয়ে করবে।"

ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে অস্থির হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে নন্তু বলিল, "দেখুন, এবার সত্যই আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে—"

বিপিনবাবু আবার সেই কান্নার কার্য্যকারণতত্ত্ব লইয়া যুগযুগান্তরের কাহিনী আওড়াইয়া বিশদ ব্যাখ্যায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বেচারা নন্তু এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।—নবীন করুণা-প্রণোদিত চিত্তে, স্নেহময় স্বরে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আহা চটছ কেন? উনি ঠাট্টা করছেন বুঝছ না? তুমি বোকা হচ্ছ কেন?"

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সুরে,—নন্তু সজোরে প্রতিবাদ করিল, "নাঃ, বোকা হবে না। এর নাম ঠাট্টা!—আপনি কিসের জন্যে আমায় ভালবাসবেন—খবদ্দার ভালবাসতে পাবেন না, কখনো না—", কথা বলিতে বলিতেই দারুণ ক্ষোভে অধীর হইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া, সে ফোঁপাইয়া আবার কান্না জুড়িল।

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বিপিনবাবু একটু থামিলেন। নবীন সুগভীর স্নেহের সহিত নন্তুর পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "ঐ! ভালবাসব না? তুমি খুব ভাল লোক, তাই ত ভালবাসি! আমার ছোট বোন অণুকে আমি ভালবাসি না? তোমাকেও তেম্নি ভালবাসি, তাতে কি দোষ হয়েছে বল দেখি?—"

হেঁট হইয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্তু বলিল, "নাঃ, দোষ হয়নি। কত দোষ হচ্ছে, দেখছেন না তো, যান আমাকে আর ভালবাসবেন না,—খবদ্দার না।"— শেষের কথাটা বীতিমত ধমকের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

বিপিনবাবু ভ্রমর গুঞ্জনবৎ মিহি সুরে বলিলেন, "কবিরা ঠিক এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

বর্ষা ঋতু ভেল, ঝবনে নয়নে জল,
দুখ সাগরে ধনি ভাসে—"

নন্তুর কান্নার উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। দিদির দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখেছ দিদি, দেখেছ? আচ্ছা, এতে কি বলতে ইচ্ছা করে বল দেখি? তুমিই বল?"

দিদি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুই-ই বল না। আমি আর কি বলব?"

দিদির এই ঔদাস্য শিথিলতা দেখিয়া নন্তু রাগে অন্ধ হইয়া বলিল, "তা বলবে কেন? তোমার নিজের বরটি কি না?"

এর চেয়ে বড় গোছের শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ বাক্য আর তাহার মনেই পড়িল না! দিদিরা হাসিয়া ফেলিলেন।

বিপিনবাবু টুক টুক করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার আর সন্দেহ আছে। পরের বর হলে এখনি অম্লান বদনে অভিসম্পাৎ করে বসত, অবশ্য কিন্তু নিজের বর বলে"—

বড়দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি থাম ত! আচ্ছা নন্তু, পাগলামো করে কেঁদে মরছিস কেন বল দেখি? নবীনের সঙ্গে কি সত্যিই তোর বিয়ে হচ্ছে? না সত্যি-সত্যিই সেকথা বাবাকে লেখা হচ্ছে! তুই মিছে কথাও বুঝতে পারিস না?"

নন্তু চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি করে বুঝব? অমন সত্যি সত্যি করে মিথ্যে বল্লে কেউ নাকি বুঝতে পারে? বাবা! আমি ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, কিন্তু বড় জামাইবাবুর মত এমন সত্যিকার মিথ্যবাদী কোথাও দেখিনি।

বড়দিদি হাসিয়া বলিলেন, "এইবার লাখ কথার এক কথা বলেছিস—'সত্যিকার-মিথ্যবাদী।' তোর বড় জামাইবাবুকে মিছে করে মিথ্যে বলতে কখনো শুনলুম না, যা বলেন—তা সত্যিকার মিথ্যেই বটে! আমিই এক এক সময় এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই যে—"

প্রতিমা চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "অ-দিদি, থাম ভাই, অতটা স্পষ্ট করে আর বোল না, আমার গোঁড়া হিন্দু জামাইবাবু, এখনি—আর্য্যশাস্ত্র আর পতিভক্তির মাহাত্ম্যহানির নরক বর্ণনা নিয়ে হয়ত এমন বক্তৃতা-বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলবেন যে আজ আর থিয়েটার দেখার দফাই নিকেশ হয়ে যাবে! চল ভাই, কাপড় পরবে—"

দিদিকে সে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল।

নবীন এইসব বহুভাষীদের মাঝে পড়িয়া বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এইবার একটু কথা বলিবার সূত্র পাইয়া— নন্তুর কাঁধে হাত চাপড়াইয়া বলিল, "যাও, তুমিও কাপড় পরে এস,—জুতো পায়ে দিও, আমি তোমায় নিয়ে ফ্রন্ট ষ্টলে বসাব—'

বিপিনবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আর আমি অম্নি পেছন থেকে গিয়ে হুলুধ্বনি করব!"

তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া নন্তু সজোরে বলিল, "বয়ে গেল! অসভ্য কোথাকার! নিজের যেমন বিদ্যে, খালি অসভ্যের মত বিয়ের কথা! ছি, ছি,—একটু লজ্জাও করে না। আহা, আবার ভাঙখোরের মত গোঁফে তা দিচ্ছেন দ্যাখ না!—ছিঃ, ঐ গোঁফদুটো দেখলে আমার এত রাগ হয়!"

সগর্ব্বে বুক চিতাইয়া সজোরে গোঁফে তা দিতে দিতে বিপিনবাবু বলিলেন, "গুম্ফ হচ্ছে, রাজপুতদের গৌরবের চিহ্ন! বড় সাধারণ জিনিস নয়! বুঝলে—"

প্রতিমা নন্তুর দিকে চাহিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নন্তু বলিল, "ওঃ। তবে আর কি, তা হলে বড় বড় গোঁফওয়ালা চিংড়ি মাছগুলোও মস্ত লোক, নয়?"

বিপিনবাবু হঠাৎ সে কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি প্রতিমা, অনেকদিন চিংড়িমাছের কাট্লেট খাওয়া হয়নি, কাল স্বহস্তে রন্ধন করে একবার খাইয়ে দাও, তুমি বেশ কাটলেট তৈরি কর সত্যি।"

প্রতিমা সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে নন্তু দারুণ অপ্রসন্নতা সহকারে বলিয়া উঠিল, "ছি ছি, কি পেটুক্ষুরেপণা বাপু! চিংড়িমাছের গোঁফের নাম শুনে অন্নি কাটলেট খাবার ইচ্ছে, ওমা এ কি—"

প্রতিমা বলিল, "এই রে! আবার এই সাপে-নেউলে বেধে যায়! না, না, নন্তু, তুই থাম ভাই, লক্ষ্মীটি আমার! জামাইবাবু—একটু সদয় হোন, আপনার গোঁফ জোড়াটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ওর উন্নতি কামনা করছি, কিন্তু মাপ করুন, আজকের মত থিয়েটার দেখাটা সার্থক হোতে দেন, দোহাই দিচ্ছি—"

নন্তু প্রসাধন-কক্ষের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "খর্ব্দার মেজদি, ওঁর দোহাই দিয়ে পা বাড়িও না, চৌকাঠের কাছেই হোঁচট খেয়ে পড়বে।। উনি যে কি ভয়ানক লোক তা তো জান না—", সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিপিনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "যেন সে তত্ত্বটা ও নিজে আগাগোড়াই জেনে ফেলেছে!—"

প্রতিমা বলিল, "ওকে আর রাগিয়ে দেবেন না, জামাইবাবু, —একটু ঠাণ্ডা হতে দেন।"

বিপিনবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু তুমি সত্যিই থিয়েটারে চলবে? ও দুরভিসান্ধিটা ছাড় না।—"

প্রতিমা সবিনয়ে বলিল, "না, ও-কথাটি বলবেন না।"

বিপিনবাবু গালিচার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া, সুগভীর পরিতাপব্যঞ্জক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায়! মহৎ লোকেরা ঠিকই বলেছেন—"Swine, women, and bees, cannot be turned."

প্রতিমা বলিল, "তা শুয়ার বলুন, গাধা বলুন, থিয়েটার দেখার গরজে পড়ে এখন সব সয়ে নিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন, কাল যদি কাটলেট্ খাবার ইচ্ছে থাকে—"

বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বিপিনবাবু বলিলেন, "আহা সাধু সাধু, সাধে মুনি-ঋষিরা অন্নপূর্ণার পূজা করেন! বাস্তবিক বলছি মনসা, তোমাদের কোন বিদ্যেই আমি দুটি চোখে দেখতে পারি না সেটা ঠিক—কিন্তু ঐ রান্নাঘরের বিদ্যেটা, পেটের জ্বালায় বড় ভক্তি করি! এবং তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধিগুলা যদিচ শুয়ারের গোঁ বস্তুটীর সঙ্গে compare করছি বটে, তত্রাচ—"

প্রতিমা বলিল, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আর তত্রাচ'য় কাজ নাই! তা হলে ঘোর সত্যিকার মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবেন।"

৩

দিদি ও নন্তু বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিনবাবু চাহিয়া দেখিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "খনার বচনে আছে—'অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক ঘা'?"—

নন্তুর ভিতরে সঞ্চিত উচ্চ-বাষ্পের গোলমালটা তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই, সে ক্রুদ্ধ স্বরে—"হুঁ, এইবার হাঁচি টিকটিকি গিরগিটি, সাপ ব্যাং, উচিঙ্গে, গেরো-ফাঁড়া, সব আরম্ভ হোক্! দেখচো মেজদি—"

বিপিনবাবু বলিলেন, "মেজদি, আর এখন কি দেখবে? কাল সকালে ডাক্তারের বাড়ী যাবার সময়, যখন বোন আর বোনপোর অসুখের সেবার জন্যে ধরে আনব তখন মনসা দেবী মজা টের পাবেন।"

বড়দিদি উদ্যত-চরণ সম্বরণ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দ্যাখো, তুমি যদি ওন্নি করে আমাদেব ভয় দেখাও তাহলে আমি বাপু যেতে পারব না। সত্যি, নিজের অসুখের জন্য ভয় করি না, কিন্তু ছেলে যদি অসুখে পড়ে!"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া বিপিনবাবু উৎসাহিত হইয়া ছেলের দোলনার দিকে চাহিয়া সুগভীর পরিতাপের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, ভগবানের রাজ্যের নিরীহ জীব! —কেনই যে এইসব দুরাচার মা'র কাছে এসেছিলে, মা-রা অনাচার অত্যাচারের পূর্ণ—"

অধৈর্য্য হইয়া প্রতিমা বলিল, "থামুন, থামুন!— নিজেরা যেমন বিশ্ববিদ্যালয় দেবতার পাদপদ্মে স্বাস্থ্যরত্নকে তাল্লাক দিয়ে ছেড়ে এসে, এখন হাড়গোড় ভাঙা 'দ'টী সেজে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন,—কোন কাজে এতটুকু ক্ষমতা নাই,—একটু হাঁটতে হলে কি খাটতে হলে, অন্নি পেটে খিল ধরে, বুকে ঝাঁকি লাগে, —মাথা ভোঁ ভোঁ করে, সকলকে তাই মনে করেছেন, না? আমরা অমন আপনাদের মত ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা যাই না,—হুঁ! চল দিদি চল, বাড়ীতে ঝির কাছে খোকা থাকবে, অসুখ-ই বা করবে কেন? আর তোমার অসুখ? ছেলের মা হয়েই তো রাত জাগা অভ্যাস ঠিক করে নিয়েছ ভাই, জামাইবাবুর মিথ্যে ভয় দেখানয় কান দিচ্ছ কেন? চল"—দিদিকে সে টানিয়া তুলিল!

নন্তু দুই দিদির মাঝখানে আপনাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "জামাইবাবুর যা কিছু ক্ষমতা সে শুধু পড়ে পড়ে ল্যাজ নাড়ায়! খালি বচনের ঝুড়ি! কিন্তু একটি কাজ করতে বল দেখি, অন্নি হাত পা ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়বেন অকর্ম্মার সর্দ্দার। একদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে আনতে বললুম, তা যদি ক্ষমতায় হোল! উনি আবার পরকে উপদেশ দেন।"—

বিপিনবাবু ঘাড় হেঁট করিয়া ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া কি-যেন একটা উত্তর ভাবিবার চেষ্টায় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, তাঁহার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্বল্পভাষী নবীনকৃষ্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রসন্নস্মিত-মুখে মৃদুস্বরে বলিল, "Onc tongue is enough for a woman, জানেন ত, আর কত শুনবেন দাদা, এবার উঠুন না, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুক্ষণ থেকে।"

নন্তু বলিল, "আপনি ক্ষেপেছেন? উনি থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন? তা হলে যে অগাধ আলস্যের অপব্যবহার হবে! সে পাত্রই উনি নন!"

বিপিনবাবু সামনে তাকিয়াটার উপর সশব্দে এক মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "রে দুর্ব্বিনীতে! জানো গুরুনিন্দা অধোগতি!"

নন্তু হাসিয়া বলিল, "তা গুরুজনরা যদি অধোগমনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান,

তা হলে একটু-আধটু নিন্দে করে তাঁদের গতি ফেরান চেষ্টাটা এমনই বা মন্দ কি? কিন্তু ভাগ্যিস আমি আপনার তাকিয়া হয়ে জন্মাইনি জামাইবাবু, তা হলে ঐ ঘুসীটা এখনি ঘাড়ে পড়েছিল আর কি!—বাবা!—চলুন মেজ জামাইবাবু, আর মিথ্যে দেরী করা কেন?" সে নবীনের হাত ধরিয়া টানিল।

বিপিনবাবু তদ্দণ্ডেই সুর ধরিলেন, "আহা কি বা মানিয়েছে রে!—"

রাগিয়া উঠিয়া নন্তু বলিল, "বেশ চমৎকার মানিয়েছে রে! চলুন মেজ জামাই-বাবু—"

নবীন উঠিতে উঠিতে বলিল, "দাদা, সত্যিই যাবেন না? আজকের মত চলুন না, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য দেবার জন্যই আজ বহুদিন পরে এই প্লে-টা হচ্ছে, আজকে যাওয়া উচিত।"

বিপিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "উচিত বটে, কিন্তু, কি জানো নবীন, দুনিয়ায় যেখানে যত কিছু অনিষ্ট ঘটে, তার মূলে থাকেন স্ত্রীলোক! সুতরাং এঁদের সঙ্গে পথে বেরুনো সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ!"—

বড়দিদি বলিলেন, "তথাস্তু! তুমি ঘরেই থাক, যখন খিদে পাবে, ঠাকুরকে বোলো, খাবার দেবে।"

থিয়েটার যাত্রীরা নীচে নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের গাড়ী বাহির হইয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইয়া বিপিনবাবু উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমার খাবার দাও, আর মধুসূদন, আমার সাইকেলে হাওয়া পুরে গ্যাসের আলোটা জ্বেলে ঠিক করে রাখো, এখনি বেরুবো।"

৪

থিয়েটার-বাড়ীতে গাড়ী পৌঁছিলে, নবীন নামিয়া টিকিটঘরের দিকে যাইতেছিল, সহসা সামনেই বাইক হাতে করিয়া দণ্ডায়মান বিপিনবাবুকে এক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিপিনবাবু তাহাকে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া নিতান্ত সহজভাবেই বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি টিকিট কিনে ঠিক করেই রেখেছি; এস।" তারপর ভদ্রলোকটীর জিম্বায় বাইক গচ্ছিত রাখিয়া, নবীনকে লইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

নন্তু গাড়ীর দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া বিপিনবাবুকে দেখিয়া ত্রস্তে জুতো মোজা খুলিয়া রুমালে জড়াইয়া বগলে পুরিল! প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে ভেতরে গিয়া বসব, বুঝলে মেজদি, আজ আর বাইরে বস্‌ব না।"

নন্তুর এই আকস্মিক মতি পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড়দি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এই নাও! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন? বাইরে নবীনের কাছে বেশ দেখতে পাবি ত।"

নন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর আমায় বেশ দেখায় কাজ নাই বাপু, ওই দ্যাখো-না, কে এসেছেন। বাবা, আবার!"

কথা শেষ হইতে না হইতে বিপিনবাবু গাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,

—বড়দিদি ও প্রতিমা একযোগে বিস্ময়ে প্রশ্নবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, এ কি কাণ্ড! এ কি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! বিপিনবাবুর চিরাভ্যস্ত অগাধ আলস্যপ্রিয়তার এ কি শোচনীয় অপব্যবহার!

নন্তু ততক্ষণে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ওদিকের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া নামিয়া পড়িল! ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মেজ জামাইবাবু শুনুন, কানে কানে একটা কথা বলি—"

কথাটা সূক্ষ্মকর্ণ বিপিনবাবুর কর্ণগোচর হইল—তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "এই রে, এখানে এসেও কানে কানে কথা! না, কেলেঙ্কারী আর বাকী রাখলে না।"

নন্তু একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—নিকটে কেহ আছে কি না, তারপর অস্ফুটস্বরে খুব সংক্ষেপেই বলিল, "বেশ করব।"

নবীনকে একপাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সে কানে কানে কি বলিল কে জানে, নবীন হেঁট হইয়া কথাটা শুনিল, তারপর হাসিমুখে গাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে নন্তুর নিকট হইতে সঙ্গোপনে কি একটা জিনিস লইয়া চটপট পকেটস্থ করিয়া ফেলিল। নন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখবেন, কাউকে বলবেন না যেন।"

নবীন হাসিমুখে সজোরে ঘাড় নাড়িল, কিছুতে না!

বড়দিদি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছ ত?"

আকাশের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ফোঁশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিনবাবু বলিলেন, "ওঃ। আষ্টেপৃষ্টে। যুগল শ্যালিকার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আকণ্ঠ পবিপূর্ণ করে,—ওর নাম কি—তারপর কি হওয়া উচিত? নীলকণ্ঠ বোধ হয় নয়?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "অন্যায় বলছেন।—বাক্যবাণ গলায় ফোটে না, কানেই ফোটা উচিত, নীলকর্ণ হয়েছেন বলুন বরং। দিদি তুমি ভাবছ কেন ভাই, মাসীমা বাড়ীতে আছেন, না-খাইয়ে তিনি ওই আদুরে ছেলেকে অম্নি ছেড়ে দিয়েছেন কি না? চল চল ভিতরে যাওয়া যাক।"

নন্তু চট করিয়া গাড়ীব পাশ ঘুরিয়া, দিদিদেব আগেই দ্রুত ভিতর দিকে ছুটিল। বিপিনবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে আরে, এ নড়বড়ে চণ্ডী পালায় কোথা? এস এস, তুমি আমাদের কাছে বসবে—"

নন্তু এক লাফে সিঁড়িতে পৌঁছিয়া বলিল, "না গো ধড়ফড়ে সন্নিপাত মশাই, আপনাকে অত অনুগ্রহ করতে হবে না, আপনি যান!"

ঠিক সেই সময় একখানা জানানা-গাড়ী আসিয়া পড়িল, অগত্যা বিপিনবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, নবীনকে লইয়া সরিয়া গেলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বড়দিদি বলিলেন, "দ্যাখ নন্তু, চুপচাপ বসে থাকবি। 'এটা কি' 'ওটা কি' করে চেঁচিয়ে পাশের মেয়েদের যে বিরক্ত করবি, সে হবে না"–

প্রতিমা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, যা না বুঝতে পাববি, তা বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা করিস। ওইখানে বসে যেন সেবারের মত, কে আর মাসতুতো বর, কে আর খুড়তুতো কনে, তা জানবার জন্যে অসভ্যর মত চেঁচামেচি করিসনি, তা হলে গলা টিপে বিদেয় করে দেব বাইরে।"

নন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "না ভাই, আজ আমি কিচ্ছুটি করব না, আমায় বাইরে পাঠিও না। আজ বলে বড় জামাইবাবু এসেছেন, বাবা! আজ আবার বাইরে যায়!"

উপরে উঠিয়া দেখা গেল, বসিবার স্থানের সকল আসনই প্রায় পূর্ণ। তখনও যবনিকা উঠে নাই, মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুজব করিতেছে। বড়দিদি আসন গ্রহণ করিয়া চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এই রে মনসা! পুলিনবাবুর মা আজ যে এখানে!"

পাশের আসন হইতে একটি সুন্দরী তরুণী বলিল, "আপনারাও চেনেন ওঁকে! উনি একটি বিশ্ববিখ্যাত জীব!"

নন্তু যদিও কিছুটি করিবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু এই 'বিশ্ববিখ্যাত জীবটির' পরিচয় জানিবার জন্য এক মুহূর্তেই তাহার কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল! —তৎক্ষণাৎ তরুণীর দিকে চাহিয়া সুকোমল অনুনয়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন, উনি কি করেছেন বলুন।"

"না।" অস্ফুটভাবে—করিয়া বলিল, "হাতী, আর ঘোড়া! চুপ কর বলছি...।"

নন্তু দমিয়া গিয়া জড়সড় হইয়া [বসিল]। তাহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া, অপরিচিতা তরুণীর মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল! সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নন্তুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "কিছু করেননি কিন্তু উনি—এই তোমার মত বয়স থেকে থিয়েটার দেখার নেশায় এন্নি মশগুল হয়েছেন, যে থিয়েটার দেখে দেখে, ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করেছেন, নিজের গয়নাগাঁটি ত গেছেই, এখন পুত্রবধূদের গয়না বাঁধা দিয়ে থিয়েটার দেখার আশা মেটাচ্ছেন। বুড়ো হয়েছেন, তবু প্রতি হপ্তায় থিয়েটার না দেখলে ওঁর চলেই না। আজ নাৎনীর গলা থেকে হার খুলে বাঁধা দিয়ে এসেছেন, বড় ছেলে থিয়েটার-বাড়ী পর্য্যন্ত এসে কত বকাবকি ঝগড়াঝাঁটি করে গেল, ছিঃ, কি ইতুরে কাণ্ড বল দেখি, বিশ্ববিখ্যাত জীব বলব না ভাই?"—

নন্তু সভয়ে বলিল, "বাবা!"—তারপর সে একদৃষ্টে ওপাশে উপবিষ্টা, সেই সুস্থূল গঠনের প্রৌঢ়া রমণীর দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার মত বয়স হইতে এই প্রৌঢ়াকে থিয়েটারের নেশা ধরে। ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

তরুণী উক্ত প্রৌঢ়ার নেশার উগ্রতা সম্বন্ধে চুপি চুপি আরও এমন কতকগুলি ইতিহাস নন্তুকে শোনাইল, যাহার পর নন্তুর বাক্য স্ফুরণের ক্ষমতাও লোপ হইল!— যতক্ষণ না রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুরু হইল, ততক্ষণ তরুণী এক-যাই বলিয়া গেল, আর নন্তু অবাক হইয়া শুনিল।

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হইল, এমনি অপ্রতিহত বেগে চলিতেও লাগিল। চারিদিকে অন্য শব্দ সংযত হইয়া গেল, সকলেই একান্ত আগ্রহে অভিনয় দেখিতে লাগিল, কিন্তু নন্তুর মাথার মধ্যে কি যে গোলমালের জট পাকাইয়া গেল কে জানে, অভিনয় দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ টের পাওয়া গেল না! সন্ধ্যাবেলায় বিপিনবাবুর বেসুরা চীৎকারে—"ও বাবা কি কালো" —শুনিয়া নন্তুর যত না হাসি পাইয়াছিল, এখন অভিনয় দেখিতে তার চেয়েও বেশী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কষ্টেসৃষ্টে সংযত হইয়া সে পাঁচ

মিনিট যদি অভিনয় দেখিতে চোখ ফিরায়, তবে পনের মিনিট কাল ঘাড় বাঁকাইয়া নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকে,—সেই প্রৌঢ়া রমণীর দিকে! প্রৌঢ়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন,—আশেপাশে ঝুঁকিয়া, এই অভিনয় করিতে কোন সালের কোন মাসের কোন তারিখের কোন অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, কি কি অভিনব বঙ্গ কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পার্শ্ববর্ত্তিনীদেব শুনাইতেছিলেন। নন্তু সে সব অমূল্য তথ্য শুনিতে পাইল না, শুধু দেখিতে লাগিল দূর হইত—প্রৌঢ়ার নথ নাড়ার ঘটা। থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার প্রাণ ধুকধুক করিতে লাগিল —তাহার মত বয়স হইতে ঐ প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা থিয়েটার দেখার নেশায় পড়িয়াছিলেন! উঃ, নন্তুকেও যদি অমনই উৎকট নেশায় ধরে! নন্তু ঘামিয়া উঠিল!

একজামিনে পাশ করিবার ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনাই নন্তু কস্মিনকালে ভাবে নাই, কিন্তু অাজ হঠাৎ অতর্কিতে বিপুল দুর্ভাবনার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল—নিজের বয়সটার জন্য? নন্তুর প্রাণটা এতই অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, যে যদি ক্ষমতায় অকুলান না হইত তবে বোধ হয় তদ্দণ্ডেই সে এক ধাক্কায় নিজের বয়সটাকে বিশ পঁচিশ বৎসর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত! কিন্তু সে সুযোগটা কোনমতেই হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আপাদমস্তক পূর্ণ অশান্তিব মাঝে সে আড়ষ্ট হইয়া বসিল।

গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক শেষ হইয়া অভিনযেব প্রথমাঙ্ক শেষ হইল। মেয়েরা আত্মীয় অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, বড়দিদি, মেজদিদি গেলেন, নন্তু কিন্তু যাইতে রাজী হইল না, প্রতিমা আন্দাজেই বুঝিল,—সেটা শুধু বিপিনবাবুর ভয়ে!

যাহাই হউক, নীচে হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন পুলিনবাবুর মা তখন গুটিকতক মেয়েকে জড় করিয়া—এধারে বসিয়া পরমোৎসাহে অভিনয় সমালোচনা শুনাইতেছেন, আর নন্তু দূরে বসিয়া দুই হাতের উপর মুখখানি রাখিয়া, ঘাড় কাৎ করিয়া নিস্পন্দ দেহে, নিস্পলক নয়নে,—তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রতিমা অস্ফুট স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কিরে নন্তু, তুই যে একেবারে মোহিত হয়ে গেছিস!—"

নন্তু চমকিয়া সভয়ে চুপি চুপি বলিল, "না ভাই মেজদি, কি যে বাপু তোমাদের এইসব থিয়েটার দ্যাখার বাই! বড় খারাপ, বড় খারাপ! বড় জামাইবাবু সাধে চিপটেন কাটেন ছিঃ, আর এসব থিয়েটার-ফিয়েটার দেখতে এসো না বাপু, ভারী বিশ্রী জিনিস!—"

মেজদি হাসিয়া বলিলেন, "আরে! তুই যে একেবার পরমহংস হয়ে গেলি। রকমটা কি?"

নন্তু বিরক্ত হইয়া বলিল, "না ভাই, সকল তাতে ঠাট্টা কোর না। আমি আর সাত জন্মেও থিয়েটার দেখতে আসছিনে। ছি ছি, এসব মানুষে দেখে না কি!"—তারপর মেজদির পিঠের উপর ঠেস দিয়া বেশ একটু নিদ্রার আয়োজন করিতে করিতে বলিল, "কাল বাপু আমার স্কুল আছে, বাজে কাজে রাত জাগলে চলবে না, একটু ঘুমুই।"

বড়দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই বল না বাপু, যে আমার ঘুম পেয়েছে! তা নয়, যত দোষ থিয়েটার দ্যাখার ঘাড়ে!"

নন্তু দারুণ অসন্তোষের সহিত বলিল, "হুঁ!" তারপর আড় চোখে পুলিনবাবুর মাতার দিকে একবার চাহিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুদিল। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, যেন থিয়েটার দেখার নেশাটা একটা বিকটাকার দৈত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া,—পিছন হইতে নন্তুর ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া মুখপানে চাহিয়া অসভ্যের মত ফিকফিক করিয়া হাসিতেছে! তাহার হাসি দেখিয়া নন্তুর পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু চেহারার ভীষণতায় চিত্ত এমন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ভয়ে বাক্যস্ফূরণ হইতেছে না! নন্তু আড়ষ্ট, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ!

হঠাৎ দৈত্যটার প্রচণ্ড হাস্যকলরবের ধাক্কা খাইয়া নন্তুর নিদ্রা ছুটিয়া গেল! চমকিয়া বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল, মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নের সঙ্গে, বাহ্যদৃশ্যের বিসদৃশ অসামঞ্জস্য দেখিয়া নন্তু হতভম্ব হইয়া গেল।— ভীতি বিহ্বল নেত্রে চারিদিক চাহিল,—দৈত্যটা কোথা?

মেজদি বলিল "থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে নন্তু, ওঠ—

পূর্ব্ব-পরিচিতা তরুণী পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে নন্তুর মুখপানে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া গেল, "লম্বা ঘুমের মাঝে বেশ পরিষ্কার থিয়েটার দেখলে ভাই।"

নন্তু কোন উত্তর দিতে পাবিল না, শুধু মেজদিকে শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিযা কোনরকম কষ্টেসৃষ্টে নীচে নামিয়া আসিল। পুলিনবাবুব মা'র সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিল, কিন্তু ভিড়ে দেখিতে পাইল না। থিয়েটার-বাড়ীর দুয়ারে—বিশৃঙ্খল কলহবন্যাব ভিড় এড়াইয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলেন, বিপিনবাবু বাইক লইয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গাড়ীতে মেজদি, বড়দি ও নবীনকৃষ্ণ থিয়েটারের দৃশ্যপট, আলোক-সমাবেশ, এবং অভিনয় সৌন্দর্য্যের অজস্র প্রশংসা সমালোচনায় যখন গাড়ী ভবাইয়া তুলিলেন, নন্তু তখন গুম হইয়া ভাবিতে লাগিল পুলিনবাবুর মাতার কথা।

বাড়ীতে গাড়ী পৌছিলে, নন্তু নামিয়া সকলের আগেই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, নবীন ডাকিয়া বলিল, "নন্তু, তোমার সেই জিনিসটা ফেরৎ নাও—"

জুতাজোড়াটা যে নবীনের কাছে দিয়াছিল, সে কথা নন্তু ভুলিয়াই গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেন।"—

নবীন দিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিপিনবাবু পিছন হইতে বাজপাখীর মত ছোঁ মারিয়া রুমালসুদ্ধ নন্তুর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া,—মহা বিস্ময়ে দারুণ আক্ষেপছন্দে বলিলেন, "এ্যা! বিনামা বহনের সৌভাগ্যটা পর্যন্ত নবীনের! আর আমি অভাগা বুঝি সকল তাতেই বঞ্চিত।—"

নন্তু রাগ করিয়া বিপিনবাবুর হাতে জুতাজোড়াটা মায় রুমালসুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া —টক টক করিয়া উপরে চলিয়া গেল! থিয়েটার দেখিয়া আজ তাহার এতই মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে বিপিনবাবুর এই অসহ্য পরিহাস-পারিপাট্যের উত্তরে প্রতিবাদ করিবার মত আধখানা কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

লাফো

সেদিন বিজয়া দশমী।

পাঁচ বৎসর রেঙ্গুণে আছি। সুদূর প্রবাসে নির্জ্জন বাসায় কয়দিন হইতে একলা পড়িয়া থাকায় মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কড়ারে যে ঠিকাদারী কাজগুলা লইয়াছি—চোখ কান বুজিয়া সেগুলার ঝকমারী পোহান ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সারাদিন ছোটলোক চরাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় টাকা আনা পাইয়ের হিসাব লেখার মত অত্যন্ত নীরস কাজে আবদ্ধ হইয়া প্রবাস-বেদনা-পীড়িত চিত্তটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন বৈকালের দিকে কাজকর্ম্ম সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া, ছড়ি ও চাদব লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। সহরের কোলাহল ছাড়িয়া নির্জ্জন পথ ধবিয়া মন্থর পদে বাসাব দিকে ফিরিতেছি, এমন সময় উৎকট গন্ধ চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া একদল ইতর জাতীয় লক্ষ্মীছাড়া ধবণের মগ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। আমায় দেখিয়া তাহারা একটু সংযত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমি চলিয়া যাইতেছি, সহসা সকলের পশ্চাৎ হইতে নীল পাগড়ী, পায়জামা ও মেবজাই আঁটা এক লম্বা-চওড়া আকৃতির বৃদ্ধ মগ অগ্রসর হইয়া সহাস্যে অভিবাদন কবিয়া মগ ভাষায় বলিল, "বাবুসাহেব এদিকে যে?"

দেখিলাম কাঠের কারখানাওয়ালা লাফো মগ। লোকে তাহাকে বলিত 'পাগলা লাফো'। পাঁচ বৎসরব্যাপী আমার এই ঠিকদারী ব্যবসায়ের খাতিরে এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় রাখিতে হইয়াছে। বিশেষ লাফো মগের অমায়িকতার জন্য তাহাকে আমি ব্যবসায় সম্পর্কের অতিরিক্তও একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতাম, ক্রমে সম্পর্কটা হৃদ্যতায় পরিণত হইয়াছিল। লাফোর প্রশ্নের উত্তরে আমিও মগ ভাষায় বলিলাম," একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। তুমি কোথায় যাইতেছ?"

স্বভাব-সিদ্ধ সরল হাস্যে বৃদ্ধ মগ কহিল, "আজ্ঞে, আজ আমাব এই শ্বশুররা কারখানাতে চড়িভাতি করিয়াছেন কি না, এবার ঘরে যাইতেছেন। একলাটি কি করি, তাই উহাদের সঙ্গে বাহির হইয়াছি।"

আমি জানিতাম—তাহারই কাছে শুনিয়াছিলাম—লাফোর স্ত্রীপুত্রাদি কেহ নাই। সে দুইবার বিবাহ কবিয়াছিল, কিন্তু দুই স্ত্রী অতি অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। সে তারপর আর বিবাহ করে নাই। কারবার হইতে বৎসরান্তে তাহার যথেষ্ট আয় হইত। টাকাগুলা মাঝে মাঝে পর্ব্বোৎসব বা অন্য কোন কিছু উপলক্ষ্যে রীতিমত 'দিল-দরিয়া' মেজাজে সে খরচপত্র করিয়া উড়াইত। অবশ্য মগের মুল্লুকে লোকদের স্বভাবটাও অনেকটা এই-রকমই বটে, সুতরাং লাফোর কার্য্যকলাপ কোনওদিন আমার বিস্ময় উদ্রেক করে নাই।

লাফোর কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমারই মত তোমারও 'কি করি' অবস্থা হইয়াছে লাফো? চল আমার সঙ্গে আমার বাসায়,—সেখানে বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে!"

আমার কথা শুনিবামাত্র লাফো তৎক্ষণাৎ কারখানার মজুরগুলাকে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে অগ্রসর হইল। অল্প দূরেই লাফোর কারখানা বাড়ী, সে কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল, কারখানা বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া একবার দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবুসাহেব, বাসায় নাই বা গেলেন, চলুন ঐখানে নিরিবিলি বেশ ঘাট আছে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেইখানে বসিয়া গল্প করা যাক।"

বাসায় যাইবার আগ্রহ আমারও বড় ছিল না, সুতবাং লাফোর প্রস্তাবমত তখনি মোড় ভাঙ্গিয়া বামদিকে রাস্তার ধারে বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিলাম।

প্রকাণ্ড দীঘির জল চন্দ্রালোকে ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে। দীঘির চতুষ্পার্শ্বে গোটাকতক বড় গাছ। নিকটে লাফোর কারখানা বাড়ীটা ছাড়া অন্য কোনও ঘরবাডী নাই, চারিদিকে মাঠ ধু ধু কবিতেছে। চন্দ্রালোকে চারিদিকের দৃশ্য তখন ঠিক একটা চমৎকার চিত্র-শিল্পের মত দেখাইতেছিল।

আমি যেখানটায় বসিয়াছিলেন, লাফো তাহার দুই পৈঁঠা নীচে বসিল। আমি কিছু বলিবাব পূর্ব্বেই লাফো বলিল, "বাবুসাহেব, আপনাদের বাংলা দেশের গল্প বলুন।"

আমি একটি ছোটখাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "লাফো, আজ আমাদের দেশে কত কত ধুমধাম হইতেছে যে তার আব কি বলিব। ঘরে ঘরে আমোদ, আজ বিজয়া দশমী।"

লাফো একটু বিচলিত হইয়া বলিল, "আজ বিজয়া দশমী?—ওঃ, জবর দিন বটে।"

আমি বিজয়া দশমীর উৎসব সংক্ষপে বর্ণনা করিলাম। লাফো কিছু বলিল না, সে দীঘির জলের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে যে আমার কথাগুলাই শুনিতেছিল একথা বলিতে পারি না। আমার বক্তব্য শেষ হইতেই লাফো একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "চমৎকার রাত্রি।"

সহসা ঘাটের দক্ষিণ পাশে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন দেবদারু গাছের ডালে দোদুল্যমান একছড়া টাটকা বনফুলের মালা দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ওটা ওখানে কে রেখেছে লাফো?"

চকিত নেত্রে চাহিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া লাফো বলিল, "আমি সখ করিয়া মালা-টালা মাঝে মাঝে গাঁথিলে ঐখানে পরাইয়া দিই।"

আমি সংশয়পূর্ণ চিত্তে বলিলাম, "তা ওখানে কেন?" লাফো জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, হাসিতে পারিল না। অবনত দৃষ্টিতে ঢোক গিলিয়া, কি যেন একটা কিছু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "জ্যোৎস্না বাত্রি, চারিদিকে খুব ফুল ফুটিয়াছিল—আর কি জানেন, দেবদারু গাছটা আমি বড়—", লাফো থামিয়া গেল।

আমার কৌতুক বাড়িল। বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি?"

সহসা লাফোর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটা খুলিয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারায় তাহার দীর্ঘ বাবরীগুলা উস্কাইয়া বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। চুলগুলা সর্পশিশুর মত মুখের পাশে ফণা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। লাফো একবার দেবদারু গাছটার পানে চাহিল, তারপর দূর আকাশের পানে তাকাইয়া ফিরিয়া বসিল। বেদনা কোমল-কণ্ঠে বলিল, "সত্যই যদি জানিতে চাহেন বাবুসাহেব, আচ্ছা শুনুন তবে বলি।

—বাহিরে আপনারা আমার যে চেহারাটা দেখিতে পান,–বাস্তবিক আমি তাহা নহি, এটা আমার ছদ্মমূর্ত্তি!"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। গ্রীবা উন্নত করিয়া তীব্র স্বরে লাফো বলিল, "আচ্ছা বাবুসাহেব, আপনিও কি আমায় সত্যকার লাফো বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তার সত্য মিথ্যা কি বিশ্বাস করিব? আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি বল দেখি?"

একটু ক্ষুণ্ন হইয়া লাফো বলিল, "আপনি বাঙ্গালী হইয়া, এমন বুদ্ধিমান লোক হইয়াও আমায় ঠাওরাইতে পারেন নাই? আশ্চর্য্য বটে।—আপনি বিশ্বাস করেন কি, আমি বাংলা দেশের একজন খুনী আসামী?"

আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম "অ্যাঁ, সত্য নাকি?"

লাফো দেবদারু গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মগ ভাষাতেই বলিল, "ঐ গাছটায় প্রায়ই ফুলের মালা ঝুলাইয়া রাখি, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কেন?'—আমি জবাব দিই—'সখ', কিন্তু সখ নয়।"—বলিয়া সে নীরব হইল।

আমি এবার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি বাঙ্গালী?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া লাফো বলিল—"আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ সব কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবার দরকারও হয় নাই। কিন্তু আজ আপনি স্মরণ করাইয়া দিলেন —আজ বিজয়া দশমী। আজিকার রাত্রে এখানে কিছু লুকাইব না, সমস্ত সত্য বলিব। বাবুসাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতাম, তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া—ঐ গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে—সে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।"

আমি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি ভয়ানক! আমার নিকট হইতে পাঁচ হাত তফাতে একটা মড়ার মাথা প্রোথিত রহিয়াছে, আর যে তাহাকে খুন করিয়াছে সে আমার সম্মুখে বসিয়া! আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া লাফো তখন পূর্ব্ববৎ মগ-ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল :—

আমাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার সোনাগঞ্জ গ্রামে, রায়বাবুরা সে গ্রামের জমিদার। তাঁহারা যখন দুই তরফে পৃথক হইলেন, তখন 'ভাগের ভাত' খাইতে হইবে বলিয়া বাবুদের নায়েব, আমার পিতৃব্য, বঙ্কু পাঁজা বুড়া বয়সে চাকরী ছাড়িয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন,, আমার বয়স তখন বাইশ বছর।

ছেলেবেলা হইতে আমি খুড়ার যত্নেই মানুষ। পিতা মাতা দেখি নাই। খুড়া লেখাপড়া কিছু শিখাইয়াছিলেন। আমার তেরো ও সতের বৎসর বয়সে যথাক্রমে দুইটি ছোট ছোট বালিকার সহিত বিবাহও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টে মৃতপত্নীক যোগটা এমনই প্রবল ছিল যে উভয়ের কোন পক্ষই ছয় মাসের বেশী পৃথিবীতে টিকিতে পারিল না।

পাঁচজন গ্রাম্য যুবকের মত আমিও ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া এতদিন

ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু খুড়ার কর্ম্মত্যাগের পর তাহা আর পোষাইল না। রায়বাবুদের ছোট তরফের আহ্বানে এবং খুড়ার ইচ্ছাক্রমে, আমি সেইখানেই একটি গোমস্তার চাকরী লইলাম।

আমার পিতা-পিতামহ সকলেই এই সংসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মনিব-গোষ্ঠীর উপর আমার এমনই অগাধ শ্রদ্ধা জমিয়া গিয়াছিল যে, সেই পরিবারে একটী অতি নগণ্য প্রাণীর নিকটেও আমি বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় আ-ভূমি প্রণত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু সেইটা আমার অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। আমার বয়স তখন খুব অল্প, তখন জানিতাম না, সংসারে যে যত নম্র ও ভালমানুষ, সে তত অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগ করে। শীঘ্রই আমার 'নম্রতার' ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। চোখ কান বুজিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। সময় সময় যখন অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম, তখন মনকে বুঝাইতাম যে এই পরিবারে আমার পিতা-পিতামহ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও তাহাই করিতে হইবে।

কিন্তু সেদিন যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন সে সব কথার সবিস্তারিত বর্ণনা করিয়া কোন লাভ নাই, সুতরাং কেবল এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চারিদিক হইতে আঘাত পাইয়া আমার মনের মধ্যে ক্রমশঃ একটা তীব্র বিদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল, এবং আমি নিজেই মানিতে বাধ্য হইলাম যে আমার শরীরটাও রক্তমাংসে গঠিত।

আমার খুড়ার একমাত্র পুত্র শঙ্কর আমার অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট, এবং তাহার চেয়েও পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল খুড়ার কন্যা শোভা। খুড়া নিজে দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, ছেলেমেয়েদুটিও তেমনি সুন্দর হইয়াছিল।

খুড়ার পুত্র শঙ্কর ছেলেবেলা হইতে আমার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল ; সমস্ত বিষয়েই আমি ছিলাম তাহার একমাত্র নির্ভর। তাহার প্রকৃতি ছিল উচ্ছ্বাসিত সরল তারুণ্যপূর্ণ, তাহার মুখখানি বালিকার মত অসঙ্কোচ আনন্দ-উজ্জ্বল ছিল।

গ্রামে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব ব্যাপারে আসর সাজাইতে, আলো জ্বালিতে, প্রতিমার সাজ পরাইতে—এবং যত কিছু বেগার খাটিবার স্থলেই সকলের আগে শঙ্কর আবির্ভূত হইত। আর যখন নিতান্ত কোন কাজ থাকিত না তখন বাঁশের ডগে লোহার তীক্ষ্ণধার ফলাযুক্ত 'কুচে' হাতে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং তীর হইতে 'তাক' করিয়া জলচাবী মীনের উদ্দেশে কুঁচে ছুড়িয়া তাকে গাঁথিয়া তুলিত। শুধু যে মাছের উপরই সদ্ব্যবহার চলিত তাহা নয়, অনেক সময় সাপও মরিত।

ছোট'র উপর অবাধ প্রভুত্বের সুযোগ পাইলে, বড়'র স্বাভাবিক স্নেহ স্বতঃই বাড়িয়া উঠে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, শুধু খুড়ার ছেলে বলিয়া নহে— অনুগত ছোট ভাই বলিয়া নহে,—তাহার নির্ম্মল আনন্দ উজ্জ্বল, প্রীতি-প্রবণ অন্তরাত্মার কোমল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে ভালবাসিতাম!"

লাফো চুপ করিল। আমি বলিলাম—"লাফো, বাঙ্গালা কি ভুলে গেছ? আর মগ ভাষা কেন? বাঙ্গালায় বল।"

সে মগ ভাষাতেই বলিল—"ভুলি নাই বাবুজি— মাতৃভাষা কেহ কখনও ভুলিতে পারে? তবে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর সে ভাষা মুখে উচ্চারণ না করিয়া অভ্যাস

হারাইয়াছি।"—এই বলিয়া লাফো স্থির দৃষ্টিতে দূরস্থ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার ললাটে বিষাদের রেখা অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, লাফো কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—

"আমাব খুড়া কিছুদিন পরে মারা গেলেন। শঙ্করের বয়স তখন ষোল বছর, শোভা বারো বছরে পড়িয়াছে। পিতৃব্যের শ্রাদ্ধশান্তি চুকাইয়া, আমি ভগিনীর বিব্বহ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলাম। শোভা সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাহার মাতুলালয়ের কাছেই কোন গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু উগ্র-ক্ষত্রিয়ের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই সময় এমন কতকগুলি কারণ ঘটিল যে আমাকে বাধ্য হইঁয়া ছোট তরফের কাজ ছাড়িয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুসুমপুরের দে বাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় প্রবেশ করিতে হইল।

দুইজন পাশাপাশি জমিদারের মধ্যে অল্পস্বল্প বিবাদ প্রায় লাগিয়াই থাকে। এই জমিদারেও সেইরূপ ছিল, কিন্তু আমি যখন দে বাবুদের বাড়ী ঢুকিলাম তখন আমার পূর্ব্বকার মনিব-গোষ্ঠী একবাবে খড়গহস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা ছুতায় দুই দলের রীতিমত শত্রুতা বাধিয়া গেল।

উত্তেজনার মুখে সন্ধির অপেক্ষা যুদ্ধের দিকেই সকলের ঝোঁকটা পড়ে বেশী। এই দুই জমিদাব-গোষ্ঠীও পরস্পরের কুৎসা বিদ্রূপ এবং ছিদ্রান্বেষণ করিয়া খুব রোখের সহিতই লড়িতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই দলে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল না—তাহা নহে, কিন্তু শ্রাদ্ধ বেশী দূর গড়ায় নাই।

এ-তরফ হইতে আমাকে ভাঙ্গাইবার এবং অন্য তরফ হইতে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতে লাগিল। এবং এই টানাটানির হিড়িকে পড়িয়া, পুর্ব্বপক্ষের প্রতি আমার ঘৃণাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে আমি সোনাগঞ্জের বাড়ীর সম্পর্ক ছাড়িয়া দে বাবুদের কাছারী বাড়ীতেই আশ্রয় লইলাম। তাহাতে এ-পক্ষের গর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-পক্ষের নিষ্ফল আক্রোশটা চড়িয়াই গেল।

সোনাগঞ্জের বাড়ীতে ছেলেমেয়ে লইয়া খুড়ী থাকিতেন। আমি সেখান হইতে তাঁহাদের সরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করিলাম। ধীরে ধীরে আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ শোভার ভাবী শ্বশুরের মৃত্যু হইল, এবং কালাশৌচের জন্য বিবাহের সময় আরও পিছাইয়া গেল।

শোভার গড়ন বাড়ন্ত ছিল। আমি চিন্তিত হইলাম, কিন্তু শোভার ভাবী স্বামী মনোরঞ্জন আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হোক না, ক্ষতি কি!"

—আমি 'মোনা'কে ভালরকমই চিনিতাম, নিশ্চিন্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসে শোভার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। সামনে আশ্বিন মাস, দে বাবুদের যত্নে আমি ইতিমধ্যে তাঁহাদের জমিদারীর ভিতরই একটু জায়গা লইয়া ছোট একটি বাড়ী করাইলাম এবং আশ্বিনের পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন খুড়ী ও ভাইবোন দুটীকে সোনাগঞ্জ হইতে আনাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

রায়গোষ্ঠীর ছোটবাবু যখন দেখিলেন যে আমি সকল রকমে তাঁহাদের হাত হইতে

খসিয়া পড়িতেছি তখন তিনি মরণ কামড় বসাইবার আয়োজন করিলেন। তাহার পরিণাম যাহা হইল তাহা ভয়ঙ্কর!"

লাফো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আর একবার থামিল। তাহার চোখ দুইটা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, মুখে বিষণ্ণ-বেদনার সহিত একটা ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "তারপর?"

"সেদিন বিজয়া-দশমী! আশ্বিন কিস্তির খাজনা দাখিল করিতে আর দুইদিন মাত্র বাকী আছে। দে বাবুদের পূজাবাড়ীর গোলে জমিদারী সেরেস্তার লোকজন সবাই কয়দিন ব্যস্ত ছিল। দূরে বেলগাঁয়ের মহাজনের নিকট অনেকগুলি টাকা পাওনা ছিল, নায়েববাবু সকাল বেলায় বলিলেন, 'বীরু মহাজনের কদিন থেকে লোক ফিরাফিরি করিতেছে, তুমি ভাই আজ গিয়া চেষ্টা কর, যা করিয়া হউক আজই টাকাটা আদায় করা চাই'।

আমি চলিলাম। অনেক চেষ্টায় সমুদয় টাকাটা আদায় করিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাছে এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ীতে কিছু জলযোগ করিয়াছিলাম। আসিবার সময় বিজয়া দশমীর প্রথামত তাঁহার কাছে এক পাত্র সিদ্ধি খাইয়া আসিলাম।

কুসুমপুরের মাঠে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি এগারটা ; প্রতিমা বিসর্জ্জনের ঢাক ঢোল ও সানাইয়ের বিদায়ী সুর তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। দুই এক ঘর গৃহস্থ রমণী তখনও জাগিয়া আছে, কিন্তু গ্রাম্য পুরুষ সম্প্রদায়ের সকলেই তখন সিদ্ধি ও মদের নেশায় অচেতন! ভদ্রঘরের পুরুষগণ, যাহারা কোনদিন কোন মাদক স্পর্শ করে নাই, তাহারাও আজিকার দিনে নিয়মরক্ষা করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ নিয়মের বাহিরে গিয়াও পৌঁছে।

আমি চলিয়াছি। বামে দামোদর, বর্ষা শেষে তখনও নদের স্রোত উদ্দাম কল্লোলে ছুটিতেছে। রাস্তার দুই পাশে ঝাউ ও তেঁতুল গাছের শ্রেণী। শরতের উজ্জ্বল চন্দ্রালোক চারিদিক ছাইয়া হাসিতেছে। সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিলাম, "দাদা।"

দেখিলাম, শঙ্কর ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। সবিস্ময়ে বলিলাম, "শঙ্কর নাকি!"

মাথায় বাবরী চুল, গলায় প্রসাদী ফুলের মালা, আঠারো বছরের গৌর-সুন্দর শঙ্কর আমার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। আমি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া দ্রুত স্বরে বলিলাম, "কিরে কি হইয়াছে?"

শঙ্করের হাতে সেই কুঁচেটো ছিল, একটা কোলাব্যাং লাফাইয়া চলিয়া যাইতেছে ; চক্ষের নিমেষে তাহাকে কুঁচেয় গাথিয়া শঙ্কর মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা, শীঘ্র বাড়ী চল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি? কি?"

ব্যাংটা ধড়ফড় করিতেছিল, শঙ্কর তাহাকে কুঁচে-শুদ্ধ এক আছাড় দিল ; তারপর কম্পিতস্বরে বলিল, "ছোটবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে!"

শঙ্কর একটির পর একটি করিয়া সমস্ত কাহিনীটা আমায় শুনাইল ; যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, মাথার ভিতর নেশার উষ্ণ-আবেশটা চনচন্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

শঙ্কর বলিল, রায়েদের ছোটবাবু দুইজন নীচ শ্রেণীর প্রজাকে টাকা খাওয়াইয়া বশ

করিয়াছেন, শোভাকে তাহারা ছোটবাবুর বৈঠকখানায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আমি কোন কথা ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না, আমার সমস্ত অনুভূতি ছাপাইয়া একটা রক্তোঙ্কিত দৃপ্ত কঠোরতা হুঙ্কার করিয়া উঠিল—খুন করিব!

আপাদমস্তকে আগুনের হল্কা বহিতেছিল, স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়া জ্বালাময় নিঃশ্বাস ছুটিতেছিল, আমি ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় বলিলাম, "চল, একেবারে কাজ শেষ করে ফেলি, তারপর অন্য কথা!"

দীর্ঘ দ্রুত চরণে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই মনে পড়িল, মনিবের টাকা আমার কাছে আছে। আমি আবার ফিরিয়া মোড় ভাঙ্গিয়া কুসুমপুরের কাছারীর দিকে ছুটিলাম, শঙ্কর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অন্তরে রুদ্র-উন্মাদনার প্রখর তরঙ্গ বহিতেছিল। আমি বলিলাম, "শঙ্কর, তুই ছেলেমানুষ, আজকের মত কুসুমপুরে থাকবি চ, কাল সকালেই মামার বাড়ী যাস—কিন্তু আমি আজ রাত্রেই এক কাণ্ড করব!"

শঙ্কর সাগ্রহে বলিল,"আমিও তোমার সঙ্গী।"

আমার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। বলিলাম, "মরতে ভয় পাবি না?"

সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "—না, কিছুতেই না।"

আমার মনে পড়িল আজ রাত্রে যে কাণ্ড করিব, সেজন্য কাল সকালে এখানে দাঁড়াইয়া সূর্য্য দেখিতে পাইব না। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কিছুই নাই। আদায়ী টাকা হইতে আমার মাহিনা বাবদ ৬০ টাকা কাটিয়া লইলাম, তাহার পর বাকী টাকা ও চালানী রসিদ সব একত্র বাঁধিলাম। কুসুমপুরে বাবুদের বাড়ীর সকল আলো তখন নিবিয়া গিয়াছিল, দেউড়ী বন্ধ হইয়াছিল, শ্রমক্লান্ত লোকজন সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি সদর বাড়ীর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। নিঃশব্দ পদে বারান্দায় উঠিয়া নায়েববাবুর বসিবার ঘরের জানালা গলাইয়া টাকার তোড়া ঝনাৎ করিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম। তারপর নগ্দীর ঘর হইতে একখানা শাণিত ভোজালী সংগ্রহ করিয়া নিঃশব্দে নিদ্রিত পুরী অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলাম।

আমার হাতে ভোজালী দেখিয়া শঙ্কর সভয়ে বলিল, "দাদা, জনকতক লোক নিলে হয় না?"

আমি তীব্র-কণ্ঠে বলিলাম, "না, এ ত সবাইকার কাজ নয়, কেন সবাইকার কাছে হাত পাতব? এ আমাদের ঘরোয়া অপমান, ঘরে ঘরে এর মীমাংসা চাই!"

শঙ্কর মটাস করিয়া কুঁচের তীক্ষ্ণ মুখটা ভাঙ্গিয়া বাশটা ফেলিয়া দিল। বলিল, "আজ ইহাতে ছোটবাবুর চোখদুটো কানা করব!"

আমি কিছু না বলিয়া দ্রুত পদে চলিলাম। শঙ্কব আমার সহিত চলিতে পারিতেছিল না, তবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতেছিল, কিন্তু বিশ্রামের নাম করিল না।

যখন সোনাগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। কোনদিকে একটী মানুষের শব্দ নাই, দূরে দূরে শৃগাল ডাকিতেছে, গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট অন্নজীবী কয়েকটা শীর্ণাকৃতি লোম ওঠা কুকুর এদিক ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাণ্ড জমিদারবাড়ীর ফটক বন্ধ।

সুকৌশলে লাঠিতে ভর দিয়া আমি তড়াক করিয়া প্রাচীরের একস্থানে উঠিলাম। ইঙ্গিতমত শঙ্করও আমার অনুসরণ করিল, কিন্তু পা পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেই আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সহসা একটা দ্বিধায় মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল ; আমি বলিলাম, "শঙ্কর, যদি বেগতিক দেখিস যমের হাতে ধরা দিস, কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিস না!"

প্রাচীর বহিয়া বৈঠকখানা মহলের দিকে অগ্রসর হইলাম, ক্রমে দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া উঠিলাম। বাড়ীর সমস্ত স্থানই আমার পরিচিত—দুই বৎসর পূর্ব্বেও শুভাকাঙ্ক্ষী অনুগত ব্যক্তি হইয়া এই বাড়ীতে খাটিয়াছি। আর, আজ আসিয়াছি প্রতিহিংসালোলুপ পিশাচের বেশে!

আমার রগের শিরাদুইটি স্ফীত হইয়া আঙ্গুলের মত আকার ধারণ করিয়াছিল। নিষিদ্ধ কার্য্যে উগ্র উত্তেজনা আমার কানেব কাছে তখন প্রলয়ের বিষাণ বাজাইতেছিল আর চক্ষের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, বক্ত-বিজলীর তীব্র রেখা!

কিন্তু শঙ্কর প্রতি পদে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বেশ বুঝিলাম সে জোর করিয়া মনটাকে নিদারুণ দানবীয়তায় মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে, তবু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি ঘৃণাভরে বলিলাম, "তুই পালা।"

সে বলিল, "না, কিছুতেই না, আজ মনিবই হোক, আর মহাদেবই হোক, কাউকে মানি না, আজ দাদার পাশে পাশে দাড়িয়ে দাদার ভাই হয়ে কাজ কবব!"

বৈঠকখানায় ছোটবাবুকে না পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, তবে সে অন্তঃপুরে। বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া, ছাদে ছাদে অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সিড়ি দিয়া নামিয়া ক্রমে আমরা ছোটবাবুর শয়নকক্ষের মুক্তদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মূল্যবান আসবাবসজ্জিত কক্ষে, পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায ছোটবাবু নিদ্রা যাইতেছেন, পাশে দুই শিশুপুত্র ও পত্নী নিদ্রা যাইতেছেন।

ছোটবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইবে ; প্রকাণ্ড মুখে একজোড়া মস্ত গোঁফ, মাথায় জাঁদরেল টাক, চেহারা বিপুল।

ছোটবাবুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমার সর্ব্ব শরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সেই কাদাশুদ্ধ পায়ে লাফাইয়া পালঙ্কে উঠিলাম, নিদ্রিত ছোটবাবুব মাথায় এক পদাঘাত করিলাম।

সশব্দে পালঙ্ক কাঁপিয়া উঠিল ; সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শিশুদুইটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল, ছোটবাবুব স্ত্রী অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে কেমন যেন হইয়া গেল, তারপর প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো, ডাকাত ডাকাত!"

চক্ষের নিমিষে শঙ্কর আসিয়া সবলে মুখ চাপিয়া ধরিল!

মুহূর্ত্তপরে নিম্নতলে একটা কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল। শিশুদুইটা ভয়ে কান্না বন্ধ করিল। আমি ছোটবাবুর বুকে হাঁটু দিয়া দৃঢ় হস্তে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া সেই শাণিত ভোজালী শূন্যে তুলিলাম।

ক্ষণমধ্যে আমার মনে হইল, এই ভোজালী এখনি নীচে নামিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে

তপ্ত রক্তধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার মুখ বুক প্লাবিত করিয়া ফেলিবে!—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার চেয়েও তপ্ত—তার চেয়ে তীক্ষ্ণ—সকরুণ আর্ত্তনাদ, আমার মর্ম্মে সবেগে আঘাত করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—সবলে শঙ্করের হাত ছাড়াইয়া পত্নী পতির বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুল মিনতিতে বলিতেছে, "রক্ষা কর বাবা, সর্ব্বস্ব দাও,-আমার সর্ব্বনাশ করো না।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত। তাই ত। এ প্রতিহিংসা কাহাব উপর লইতে আসিয়াছি? কাহার দোষে কাহার সর্ব্বনাশ কবিতে আসিয়াছি? এই নিরপরাধা রমণীর! হাঁ. তা নয়ত কি? এই লোকটার জীবনের যেখানটা লক্ষ্য কবিয়া আঘাত করিব, সেইখান হইতেই এই রমণীর শোণিত উচ্ছ্বলিত হইযা উঠিবে। তবে তবে?—

আমি ছুরি নামাইয়া, আক্রান্তকে ছাড়িয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া পডিলাম। নিম্নে, অঙ্গনে তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়িয়া গিয়াছে! দুড়দাড় করিয়া দ্বার খুলিয়া লোকে বিকট চীৎকার করিতে করিতে দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

আত্ম-মুক্তির জন্য রমণীর প্রাণপণে বলপ্রযোগে শঙ্কর ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম সে নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত হইয়া, অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে তখনও মেঝের উপর বসিয়া। নিষ্ফল উত্তেজনায় আমার অন্তরে তখন যেন একটা প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছিল ; আমি পরুষকণ্ঠে ডাকিলাম—"উঠে আয়।"

শঙ্কর, ভয়ত্রস্তা বালিকার মত চকিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

বাহিরের পদশব্দ ও চীৎকার খুব কাছাকাছি আসিয়া পডিল।

ফাসিকাঠে উঠিবার সময় খুনী আসামী যেমন সবলে কাতরতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নির্ভীকভাবে নিশ্চয-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়—আমার নির্ম্মম কণ্ঠস্বরে শঙ্করও যেন 'মরিয়া' হইযা উঠিয়া দাড়াইল। আমি তাহাকে আর ফিরিয়া তাকাইবার অবসব দিলাম না, বজ্রমুষ্ঠিতে তাহাব হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিলাম।

এবার আর ধীরেসুস্থে ফিরিবার উপায় নাই, লোকজন সকলেই প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে লইয়া বাগানের দিকে খোলা ছাদে ছুটিয়া গেলাম ;—সম্মুখে সঙ্কেত করিয়া আদেশ দিলাম—"লাফিয়ে পড়।"

সভয়ে পিছু হাঁটিয়া শঙ্কর বলিল, "এত উঁচু থেকে?"

আরো কঠোর-স্বরে উত্তর দিলাম, "হাঁ"—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে এক ধাক্কা মারিয়া ছাদের প্রান্তভাগে আনিলাম। ঝোঁক সামলাইয়া ভয়-কাতর শঙ্কর বলিল, "তুমি আগে লাফাও!"

আমি গর্জ্জিয়া উঠিলাম। সে যখন মরণের ভয়ে অভিভূত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর বিশ্বাস কি?

কম্পিত কলেবরে শঙ্করও বলিল, "আমি পারব না, তুমি আগে লাফাও!"

পুনশ্চ তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে হাত ছিনাইয়া পিছাইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র করুণ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর শয়নকক্ষের পানে চাহিল। সে যে কি ভাবিতেছিল, সেই জানে আর ভগবানই জানেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ক্ষণ পরেই দ্বিতলের বারান্দায় লোকজনের উচ্চ কলরব ও অগণ্য আলোব জ্যোতিঃ

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; আমি রূঢ় স্বরে বলিলাম, "আর এক মুহূর্ত্ত শঙ্কর—এখনো বলছি।"

আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "না, না!"

আমার চোখে তখন জগৎ জুড়িয়া খুনাখুনির মেলা বসিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতেছে, আমার রক্ত-লোলুপ চিত্তে এক রাক্ষসী যেন হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দুই হস্তে দৃঢ মুষ্টিতে শাণিত ভোজালী ধরিয়া, আমি চক্ষের নিমিষে তাহার স্কন্ধে বসাইয়া দিলাম!

মুণ্ডটা দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। লুণ্ঠিত দেহটা একবার সজোরে আকুঞ্চিত হইয়া তারপর স্থির হইয়া গেল। একটা বিকট পরিতৃপ্তির উল্লাসে আমার সারা অন্তরাত্মা উন্মাদ হইয়া উঠিল। আমি সেই মুণ্ডের চুলগুলা সবলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ছাদ হইতে লম্ফ দিলাম।

নীচে বাগানে একঝাড় কলাগাছ ছিল, তাহারই উপর পড়িলাম, পা মচকাইয়া গেল। ভ্রূক্ষেপ করিলাম না;—সেই রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া তীব্র-বেগে ছুটিলাম!

কতদূর আসিলাম কে জানে? সম্মুখে ভৈরব তাণ্ডবে প্রবাহিত ক্ষিপ্তস্রোত দামোদর। আমি জলেব কাছে আসিয়া পডিলাম। জলবাশি একবার সবেগে ছিটকাইয়া উঠিল! তারপর আমার অবশ ইন্দ্রিয়গ্রাম আর কিছুই অনুভব করিতে পারিল না।

যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম দশমীর ক্ষীণ আলোকে পশ্চিম গগন পাণ্ডুবর্ণে চিত্রিত। আমার হাঁটু ছাপাইয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর আমি বালির উপর দুই হাতে শঙ্করের মুণ্ড বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আছি! উঠিয়া বসিলাম, মহূর্ত্তে সব স্মরণ হইল। আমি বালকের মত হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

তখন অনুভবশক্তি ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! একবার ভাবিলাম, এই মুণ্ডটা লইয়া আমিও ঐ দামোদরের উচ্ছল স্রোতে হাত পা ছাড়িয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি;—এই দুর্ব্বহ শোক—এই অসহ্য বেদনাকে ফাঁকি দিয়া আরাম লই! কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সেটা বিষম স্বার্থপরতা হইবে! গৃহে বিধবা জননী আছেন, অন্যান্য পরিজনবর্গ আছে, তাহাদের ভার যে একমাত্র আমারই উপর!—আমার এখন বাঁচিবার শক্তি থাক আর নাই থাক, মরিবার স্বাধীনতা নাই, অবশ্যই নাই।

কেমন করিয়া কতদিন পরে, কি উদ্দেশ্যে রেঙ্গুণে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, ঠিক মনে পড়ে না। এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যখন প্রথম আমার মস্তিষ্কে যথার্থ স্থিরতা আসিল, তখন আমি এই নির্জ্জন প্রান্তরে একলা ঐ দেবদারু গাছের তলায় বসিয়াছিলাম। গাছটা তখন ছোট ছিল।

আমার বাক্সে তখনো বস্ত্রাবৃত শঙ্করের মাথা। সেটাকে অনেক রাত্রে গাছের তলায় পুঁতিয়া ফেলিলাম। পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া জমিকে শক্ত করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দিলাম।

পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে পরদিন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে গিয়া নিজেকে বিহারবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বর্দ্ধিষ্ণু মগ কৃষকের ধান্যক্ষেত্রে মজুরী করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

ছয় সাত বৎসর সেখানে থাকিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া যখন রেঙ্গুণে আবার ফিরিয়া আসিলাম, তখন হইতে আমার এই বর্ম্মীজ ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম।

এখানে আসিয়া এক বৃদ্ধ ছুতারের আশ্রয় লইলাম। সে আমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিল না, আমার কল্পিত জীবনেতিহাস শুনিয়া তাহাও অবিশ্বাস করিল না। তাহার কাছে কয় বৎসরের জন্য কাজে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, মাতুলের নামে কিছু টাকা পাঠাইলাম। লিখিলাম, সোনাগঞ্জে আমি একটা খুন করিয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছি, শঙ্কর আমার কাছে আছে, আপনারা ভাবিবেন না!"

বৃদ্ধ ছুতারের গৃহ এখান হইতে কিছু দূরে ছিল। অবসর পাইলেই এখানে আসিতাম, ঐ দেবদারু গাছটীর তলায় বসিয়া থাকিতাম। মাঝে মাঝে ফুলের মালা আনিয়া ডালে টাঙ্গাইয়া দিতাম। আমার এইসব অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে আমার নাম দিল 'পাগলা লাফো'।

দুই সপ্তাহ পরে পত্রের উত্তর আসিলে সাত বৎসর পরে বাড়ীর সংবাদ পাইলাম। বিজয়া-দশমীর পরদিন এক পুষ্করিণীতে শোভার মৃতদহ পাওয়া গিয়াছিল, পুলিশ তদন্তে স্থির হয় যে বালিকা স্নান করিতে নামিয়া অসাবধানে গভীর জলে গিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ; ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া শোভা নিজ নশ্বর দেহের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিয়া লইয়া স্বর্গে গিয়াছে।

যতদিন খুড়ী জীবিতা ছিলেন ততদিন এমনি করিয়া শঙ্করের কুশল লিখিয়াছি। তাহার পর তিনিও মরিয়াছেন। এখন শঙ্করের সংবাদের জন্য কেহ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার নাই, কারণ শঙ্কর আমার কাছে নিরাপদে আছে সবাই জানে!

আমার অনুমান, আমার কৃতকার্য্যের জন্য দেশে কিছুই হাঙ্গামা হয় নাই, এবং খুন করিতেও কেহ কাহাকে দেখে নাই!— বিশেষতঃ, অন্দরমহলের ভিতর এসব ছেঁড়া ল্যাঠা লইয়া কি পুলিশে হাঙ্গামা করে? তাঁহারা সব ঢাকিয়া লইয়াছেন!

সমস্ত জীবনের উদ্বৃত্ত আর একত্র করিয়া দুই বৎসর হইল এই জায়গাটা কিনিয়া লইয়াছি। একজন অংশীদার জুটাইয়া কাঠের কারখানা ফাঁদিয়াছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার মামা, খুড়িমা কি এখনও জীবিত আছেন?"

সে বলিল—"না বাবুজি। আমাদের বংশে এখন আর কেহই নাই, খালি এখন আমি আর শঙ্কর। জমির উপর আমি, নীচে শঙ্কর।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লাফো বলিল—"বাবুসাহেব সবাই ভুলিয়াছে—এখন আমি পাগলা লাফো। আমি ভুলিয়াছি, আমি বাংলাদেশের, বীরেশ্বর পাঁজা। কিন্তু যখনই এই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াই, তখনই অতীতের সমস্ত স্মৃতি সজীব হইয়া আমায় স্মরণ করাইয়া দেয়, আমি পাগল নয়, লাফো নয়, আমি নরঘাতক দস্যু!

সময় সময় ইচ্ছা হয়, ঐ গাছতলাটার চারিদিক লোহার বেড়া দিয়া ওখানটা পাথরে বাঁধাইয়া, উপরে এক বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু তখনই মনে হয়, শঙ্করের অশরীরী আত্মা হয়ত তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে।"

লাফো চুপ করিল। চারিদিকে শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গাছপালাগুলা সমস্ত নিথর নিস্তব্ধ। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। লাফো স্থিরদৃষ্টিতে অল্পক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর সনিঃশ্বাসে বলিল, "বাবুসাহেব, যে শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহার তুল্য শাস্তি শুধু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেন, সারা পৃথিবীর কোন শক্তি আমায় দিতে সমর্থ নয়।"

জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, লাফোর চক্ষে অশ্রু চকচক করিতেছে।

করুণা দেবীর আশ্রম

পৃথিবীতে প্রচুর টাকা থাকে অনেকেরই, কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎ হৃদয় থাকে কদাচিৎ। বৃহত্তর আদর্শের অনুসবণে আত্মোৎসর্গ করিবার সাহস দেখিতে পাওয়া যায় আরও কদাচিৎ।

অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শিবলালবাবু এবং তাঁহার বিলাত ফেরৎ মোটা মাহিনাওলা পুত্র কাণপুর সহরের প্রতিপত্তিশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিবলালবাবুর পত্নী করুণাময়ী দেবী পাইয়াছেন বিপুল পৈত্রিক জমিদারী। বিশেষ ধনী পরিবার। রেডিও মোটবে, ইলেকট্রিক আলোয় আভিজাত্যের সবটুকু গৌরব ইঁহারা আবদ্ধ রাখিতেন না, দেশের ও দশের মঙ্গলে বেশ মোটা দান করিতেন, দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর দায়ে-ঘায়ে প্রচুর সাহায্য করিতেন।

ইঁহারা যখন সমাজত্যক্তা মেয়েদের আশ্রয় দিবার জন্য সহরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে অনাথা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং করুণা দেবী যখন নম্র দীনতায় পূজারিণীর নিষ্ঠা লইয়া সে আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন তখন সহরের অধিকাংশ লোকই বিস্ময়ে হতবাক হইল! যাঁহারা ইঁহাদের ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতেন তাঁহারা শ্রদ্ধাভরে এই পরিবারের মঙ্গল কামনা করিলেন। কেহই বিরুদ্ধ মন্তব্য করিলেন না, কোন প্রশ্নও নয়।

আশ্রমের কায অতি সুচারুভাবে চলিল। দেশ বিদেশের অনেক মেয়ে আসিয়া আশ্রমে স্থান পাইল। তাহারা সকলেই দৈবাৎ পদস্খলিতা, সকলেই পুনরায় সৎভাবে জীবন যাপনে ইচ্ছুক। ইহাদের কাহারও সঙ্গে ছোট ছোট শিশুও ছিল, তাহারাও সমাদরে আশ্রমে স্থান পাইল।

মেয়েরা উপবাস উপাসনায় চিত্ত শুদ্ধ করিয়া আশ্রমের প্রথানুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনায় নবজীবন গঠন করিতে লাগিল। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া পদস্খলিতা মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজচিত্তের নিষ্করুণ রূঢ়তা ক্রমে সহানুভূতি ও অনুকম্পায় পরিবর্ত্তিত হইল। উৎসাহী ধনীগৃহের গৃহিণীরা আসিয়া আশ্রমের সেবা ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে আসিয়া সেবায় যোগদান করিতে পারিলেন না, তাঁহারা দূর হইতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী দেবীর করুণায় আশ্রম সমাজে উঠিল, অর্থাৎ সমাজ ইহাকে সহিয়া লইল। আশ্রমের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নামকরণ হইল—"করুণা দেবীর আশ্রম"।

কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিবার পর আশ্রমে বিপ্লব জাগিল যমুনাকে লইয়া।

চার বৎসর পূর্ব্বে সে যখন আশ্রমে আসে তখন সাত মাস গর্ভবতী সে। অচৈতন্য অবস্থায় তাহাকে যমুনা নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া কয়েকজন সদাশয় ভদ্রলোক উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে দেন। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে সুস্থ করিয়া আশ্রমে পাঠান।

নিজের বা আত্মীয়স্বজনের নামধাম সে কিছুই প্রকাশ করিবে না বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অস্বাভাবিক অল্পভাষী ও অসাধারণ জেদী মেয়ে। কাহারও প্রশ্নের উত্তর দেয় না, শুধু কাঁদে। পদস্খলিতা নারীদের অনেকেই পূর্ব্বজীবনের পরিচয় গোপন রাখিতে চায়, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত ঘরের দুর্ভাগিনীরা। লজ্জা, ঘৃণা, অনুতাপের পীড়নে পীড়িতা এই মেয়েটিকে করুণা দেবীর ইঙ্গিতে আর কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। যমুনা হইতে তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল—তাহার নাম রাখা হইল যমুনা।

যমুনার বয়স বছর পঁচিশ-ত্রিশের বেশী নয়। মুখশ্রী চমৎকার, রং ধবধবে ফর্শা, দেহগঠন লম্বা চওড়া—সাধারণ ধনী-গৃহের ভোগবিলাসী অলস মেয়েদের মত। খানিকটা বোকামি, খানিকটা ভালমানুষী, খানিকটা একগুঁয়েমি মিশিয়া স্বভাবটি তৈরী। কিন্তু সরল মোটে নয়। সব বিষয়ে লুকোচুরি খেলিতে ভালবাসে। কোনও কথার স্পষ্ট উত্তর দেয় না। সর্ব্বদা যেন প্রচ্ছন্ন অভিমানে বিরক্তি-গম্ভীর।

আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী করুণা দেবীর ধৈর্য্য অসীম, স্নেহপরায়ণতা অপরিসীম। আশ্রম তত্ত্বাবধায়িকা বিরজা দেবীকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "সর্ব্বদা কায দিয়ে ওকে অন্যমনস্ক রেখ। সদয় ব্যবহারে ওর স্বভাব সংশোধন কর।"

করুণা দেবীর স্বামীপুত্র ঘরসংসার আছে। সর্ব্বদা আশ্রমে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনি দুবেলা গাড়ী চড়িয়া আশ্রমে আসিতেন, ঘণ্টাখানেক সব দেখাশুনা করিয়া যাইতেন। বিরজা দেবী তাঁর দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী। নিষ্ঠাবতী, নিষ্কপট, ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু বিধবা সে। বুদ্ধিবৃত্তি চৌকশ, সর্ব্বদা অনলস। এইসব বাঁকাচোরা স্বভাবের মেয়েদের বিপথগামী মনকে সিধা পথে আনিবার জন্য তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত।

কায সোজা নয়। অতি-শ্রমের অত্যাচারে তিনিও সময় সময় বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি অসুস্থ হইয়াও পড়িতেন। সে সময় তাঁহার দুই সহকারিণী শ্যামা ও শান্তা আশ্রমের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিত। শ্যামা ও শান্তা আশ্রমের সবচেয়ে পুরাতন আশ্রিতা বিধবা।

যাই হোক, যমুনার দিকে সকলেই সদয় দৃষ্টি রাখিল। যথাসময়ে সে নির্ব্বিঘ্নে এক কন্যা প্রসব করিল।

মেয়েটি,দিনে দিনে বড় হইয়া উঠিল। মেয়েটি খুব সুন্দরী, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু কেমন যেন হাবাগোবা গোছের, জড় মস্তিষ্ক। যথা সময়ের অনেক পরে সে কথা বলিতে শিখিল। যা শিখিল তাও অতি অল্প, অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য।

নিরপরাধ শিশু, ভগবানের জীব। আশ্রমের সকলেই তাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু মেয়েটার দিকে চাহিয়া যমুনার দৃষ্টি কেমন যেন হিংস্র, ভয়াবহ হইয়া উঠিত। সময় সময় মেয়েটার উপর সে অতি রূঢ় ব্যবহার করিত। তখন বিরজা দেবী মেয়েটাকে সরাইয়া অন্যের জিম্মায় রাখিতেন।

আশ্রমে জপতপ পূজা আরাধনার পর মেয়েদের জন্য নানারকম বড়ি প্রস্তুত, পাঁপর প্রস্তুত, মুড়ি-চিড়া ভাজা, আটা ময়দা প্রস্তুত করা হইতে লেখাপড়া লেখা, সৌখিন শিল্পকার্য্য করা পর্য্যন্ত নানাবিধ কার্য্য-বিভাগ ছিল। সব মেয়েই কোন না কোন বিভাগের কাযে মন বসাইযাছিল। যে যে-বিষয়ে সুদক্ষ হইয়া উঠিত তাহাকে সেই বিভাগের কর্ত্রী করা হইত।

যমুনা কোন কাযে মন বসাইতে পাবিল না। কিন্তু আলস্যচর্চ্চার সুযোগ আশ্রমে নাই। কাজেই রান্না ভাঁড়ারের কাযে বাধ্য হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হইত। ক্রমে সে রাঁধিতে শিখিল, তারপর আগ্রহের সহিত রাঁধিয়া বাড়িয়া নিঃশব্দে উৎসাহে সকলকে খাওয়াইতেও লাগিল। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া কাহাবও সহিত কথা সে কহিত না।

করুণা দেবী ও বিরজা দেবী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িযা ভাবিলেন, মেয়েটার এবাব আশ্রমে মন বসিয়াছে। কথা না বলুক, কাযের লোক! গতর খুব!

এমনিভাবে চার বছর কাটিল।

হঠাৎ আশ্রমের অদূরে গঙ্গার ধাবে এক তেজঃপুঞ্জ-কান্তি দিব্য সুন্দবমূর্ত্তি জটাধারী সাধুব আসন পড়িল। সাধুর নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য খ্যাতি শোনা গেল। সাধুর বয়স বোঝা শক্ত; প্রৌঢ় বলিতে বাধে, যুবা বলিতেও সন্দেহ হয।

সহরের নিষ্কর্ম্মা কৌতূহলীর দল ভিড় করিয়া সাধুর চরণে ভাঙিয়া পড়িল।

একদিন সন্ধ্যার অবকাশে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া আশ্রমের মেয়েরাও সাধুকে প্রণাম কবিতে গেল। যমুনাও তাহাদের সঙ্গে গেল।

সাধু সমাদরে তাহাদের বসাইয়া বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলেন। অনেক সদুপদেশ দিলেন।

যমুনা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাধুর দিকে চাহিয়া রহিল। সাধুও বার কয়েক চকিত কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন। তুচ্ছ ব্যাপার, বিবজা দেবী এসব গ্রাহ্য করিবার পাত্রী নহেন। মেয়েদের লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে যমুনা একা গঙ্গাস্নান করিতে গেল। অনেক বিলম্বে আশ্রমে ফিরিল। কৈফিয়ৎ দিল, কাল সাধুকে সে ঠিক চিনিতে পারে নাই, আজ গঙ্গার ঘাটে পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবার সে চিনিতে পাবিযাছে, সাধু তাহার দীক্ষাগুরু। সেইজন্য কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাই ফিরিতে তাহার একটু দেরী হইয়াছে।

মেয়েরা মুখ চাওয়াচায়ি করে। অভিজ্ঞ মনের কোণে সংশয়ের কালো ছায়া বিদ্যুৎবেগে লুকোচুরি খেলে।

বিরজা দেবী কঠোরস্বরে বলিলেন, "একা বাইরে যাওয়া আশ্রমের নিয়ম বিরুদ্ধ। আর যেও না। উনি তোমার গুরু? যেদিন প্রণাম করতে যাবে, শ্যামা কিম্বা শান্তার সঙ্গে যেও।"

কিন্তু বৃথা। তার নির্ব্বাক নিস্তব্ধ একগুঁয়ে প্রবৃত্তির মোড় ফিরানোর চেষ্টা নিরর্থক। সে লুকাইয়া লুকাইয়া একা সাধুর কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল। ধরা পড়িলে নীরবে তিরস্কাব সহিত, ভালমানুষের মত, বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত—যেন

এসব তিরস্কারের অর্থ বোধগম্য করিবার শক্তি তাহার নাই!

বিরজা দেবী বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন—মেয়েটার মস্তিষ্ক বিকৃত।

করুণা দেবী সমস্ত শুনিয়া করুণাভরে বলিলেন, "গুরুদর্শনে যাওয়ায় বাধা দিও না।"

বিরজা বলিলেন, "যে মেয়ের বিচারবুদ্ধি জেগে আছে তাকে গুরুদর্শন কেন, নরক-দর্শনে পাঠাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি বিশ্বাস রাখি, সে সব মেয়ে নরকের আবিলতারাশি দুহাতে তুলে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যের নিরিখে পরীক্ষা করেও পবিত্র থাকবে, আসক্তির পাঁকে নিজেকে ডুবুবে না। সে মেয়ে আছে আশ্রমের মধ্যে ওই শান্তা। শ্যামাকেও শ্রদ্ধা করি, ওর বুদ্ধি আছে, নিজেকে রক্ষা করতে জানে। একদা দৈবাৎ ওর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ছুটে এসে নিষ্কপট সরলতায় বললে, আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন, কেঁদে মরে গেলেও বেরুতে দেবেন না। কিন্তু, এরা ত তা নয়! আমি ভয় করি ওই বিমলা-যমুনার দলকে। ওরা ভিতর গোঁজা, মুখ বোজা বোকা শয়তান। ওদের শিরায় শিরায় এখনও কলষিত কামনার ঢেউ খেলছে!'

করুণা দেবী বলিলেন, "সে ত স্বাভাবিক বিরজা! স্বভাবের বিরুদ্ধে চেতনশক্তিকে জাগ্রত করার সাধনা কি সোজা কথা? তাহলে এ আশ্রমের প্রয়োজন থাকত না। আমরা ওদেব পবিত্র হবার জন্য সহায়তা করব, দুর্ব্বলকে বল যোগাব, ওদের যথাসাধ্য মঙ্গল চেষ্টা করব—এইটুকুই মাত্র আমাদের অধিকার। তারপর যে যার কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট পথে চলবেই। কিন্তু যমুনা—"

"অতি দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, আবছা। পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেত ওর পিছু পিছু ঘুরছে। আশ্রমের তন্ত্রমন্ত্রে তাকে পোষ মানাতে পারি, ভয় করি না, কিন্তু আত্ম সংশোধনে ওর দারুণ অবহেলা, লোভ রয়েছে এখনো প্রেতের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণে—ওকে ভয় করি সেইখানেই।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া করুণা দেবী দুঃখিতভাবে বলিলেন, "নিষিদ্ধ নয় জানি, কিন্তু নিন্দনীয়, তাই বলতে সংস্কারে বাধে। কিন্তু আমার ছেলে বলে ঠিক—এ শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়েদের আবার বিবাহ দেওয়াই উচিত।"

একটু হাসিয়া বিরজা দেবী বলিলেন, "তাতে কোন শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্তান সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা? অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই আছে, এ ক্ষেত্রেও হয়ত দু দশটা থাকবে, কিন্তু অসংযত প্রবৃত্তির ক্রীতদাস যারা, সে সব নরনারীর—"

"হাঁ হাঁ—নৈতিক চেতনা যাদের নিষ্ক্রিয়, সে সব নারীর আবার বিধবা বিবাহ কেন? কৌমার্য্য খণ্ডনও পাপ, অপরাধ। জানোয়ারের বাচ্চা জানোয়ারই হয়, হাজার চেষ্টা করলেও 'মানুষ' তারা হয় না। জানবার উপায় নেই, নইলে জেনে নিতে ইচ্ছা হয় যমুনার মা-বাপ কেমন লোক।"

বিরজা দেবী চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "তাঁরা হয়ত সৎ প্রকৃতিরই মানুষ, কিন্তু যমুনার জন্ম সময়ে যে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল ছিল না তাব প্রমাণ স্বয়ং এই যমুনা।"

"যাই হোক, ওর দিকে লক্ষ্য রেখ।"

কিন্তু লক্ষ্য রাখিয়াও তাল সামলাইতে পারা গেল না। যমুনা লুকাইয়া লুকাইয়া সাধুর

কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একদিন আশ্রম হইতে যমুনার শিশু-কন্যাটি অদৃশ্য হইল!

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িল। সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু যমুনা নির্ব্বিকার!

রাত্রে শিশু মায়ের কাছে ঘুমাইয়াছিল, সকালে উঠিয়া মা দেখে শিশু অদৃশ্য! বিচিত্র রহস্য!

সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল, গঙ্গার তীর হইতে ঝুলি-ঝোলাসহ সাধুও অন্তর্হিত।

গুরুর এই আকস্মিক অন্তর্ধান সংবাদেও যমুনা অবিচল, নির্ব্বাক! সহস্র প্রশ্নেও নিশ্চুপ! অদ্ভুত একজ্ঞায়িতা!

শেষে সংক্ষেপে বলিল, "তিনিই মেয়েকে নিয়ে গেছেন।"

করুণা দেবী আসিলেন। নিভৃতে যমুনাকে ডাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "যমুনা, তুমি কি স্বেচ্ছায় সাধুকে কন্যা দিয়েছ?"

এবার সে জবাব দিল, "হাঁ।"

"কেন?"

উত্তর নাই। সহস্র রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়াও ওই "কেন"-টার উত্তর পাওয়া গেল না।

বিরজা দেবী বলিলেন, "তাহলে কি বুঝবো আমরা ওই তার পিতা? হাঁ কি না —স্বীকার কর।"

যমুনা নির্ব্বাক।

ক্লান্তস্বরে বিরজা দেবী বলিলেন, "জানি, তুমি সাহস করে সত্যকথা বলতে পার না, তোমার সব লুকোচুরি, সব ছলনা। কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যৎ বলতে একটা কথা আছে, সেটা ভেবেছ? নির্ব্বোধ মেয়ে? কি উদ্দেশ্যে তুমি ওই ভণ্ডটার হাতে মেয়ে দিলে?"

নতমুখে যমুনা জবাব দিল, "উনি ভণ্ড নন।"

জ্বলিয়া উঠিয়া বিরজা দেবী বলিলেন, "সাধু, সাচ্চা, মহাপুরুষ—না! তোমার কাছে, আমাদের কাছে নয়। যিনি ভুলিয়ে তোমায় পাপের পথে এনেছিলেন—"

"ভুলিয়ে নয়, ভুল সাধনা প্রণালীর দোষে।"

চমকিয়া করুণা দেবী বলিলেন, "তারই ফল ওই সন্তান?"

অস্পষ্ট স্বরে যমুনা বলিল, "হাঁ। অনুতপ্ত গুরুর উর্দ্ধগতি আজ কর্ত্তব্যের আকর্ষণে রুদ্ধ। নিজের গতি মুক্তির জন্য তিনি ওকে নিয়ে গেলেন, কর্ত্তব্যের খাজনা শুধতে।"

রুষ্ট স্বরে বিরজা দেবী বলিলেন, "রাখো ওসব বড় বড় কথা। উর্দ্ধগতি! আগে অধোগতির ফাঁড়া কাটুক তারপর! উর্দ্ধগতি এখন অনেক দূর! তোমার মত নির্ব্বোধ আহাম্মক মেয়েরাই ওইসব প্রতারকদের কুহকের ফাঁদে পড়ে মরে! এখন মেয়েটাকে ফিরিয়ে পেতে চাও? তাহলে বল তার ঠিকানা।"

যমুনা নির্ব্বাক, অটল, দৃঢ়। লক্ষ প্রশ্নেও কোন জবাব দিল না।

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, আশ্রম হইতে যমুনাও অদৃশ্য!

বিজ্ঞ লোকেরা বলিলেন, "চন্দ্র ঘুরপাক খায় পৃথিবীর চারিদিকে, পৃথিবী ঘুরপাক খায় সূর্য্যের চারিদিকে!"

অনেক চেষ্টাতেও যমুনা, তাহার কন্যা বা সাধুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আশ্রমের মেয়েরা আতঙ্কিত, বিরজা দেবী ক্ষুব্ধ, করুণা দেবী ব্যথিত হইলেন। আশ্রমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় জজ শিবলালবাবু নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতায় পাইপ টানিতে টানিতে প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "Crime is common, তাতে লঘুচিত্ত লোকেরা কুৎসা আন্দোলন করে খুশী হতে চায়—হতে দাও।"

গোলাপ সিংহ

সন্ধ্যা হয়-হয়।

সমস্ত দিনের দারুণ পরিশ্রমকর ব্যাধবৃত্তির পর উত্তেজনাক্রান্ত দেহে আমরা যখন তাঁবুতে ফিরিলাম, গোর্খা জমাদার গোলাপ সিংহের দুঃসাহসিক ব্যাঘ্র-শিকার কাহিনী লইয়া চারিদিকে রীতিমত কোলাহলোৎসব চলিতেছে।

আমাদের অভিযানের লক্ষ্যস্থল গারো পাহাড়ের একটা প্রান্তঃসীমা। এখানকার বিখ্যাত রাজষ্টেটের মহারাজা বাহাদুর, তাঁর বন্ধুস্থানীয় জন চার ইংরেজ রাজপুরুষ এবং মহারাজের অনুচরবর্গের সহিত প্রতি বৎসরের মত এবারেও শিকারের উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আসা হইয়াছে। স্থানটা শহর হইতে দূরে, রীতিমত জঙ্গলী দেশ।

প্রায় আট বৎসর রাজষ্টেটে চাকরী লইয়াছি। প্রতি বৎসরই এই শিকারীদলের সহিত আমাকে আসিতে হয়। প্রতিবারই বিস্তর বাঘ, ভালুক, বুনো-মহিষ, বন্য-বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এবারের মত এমন বিষম বিপদে কখনও পড়ি নাই, এবং গোর্খা গোলাপ সিংহের মত এমন অসম সাহসিক শিকারীর শিকারকৌশলও কখনও দেখি নাই। পাকা শিকারী গর্ডন সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, মহারাজা বাহাদুরের মন্ত্রসিদ্ধ বন্দুকের কৃতিত্ব, এবং এই অধম বাঙালীর বড় সাধের সতের-শো টাকা দামের দোনলা বন্দুকের সব গৌরব ব্যর্থ করিয়া ক্রোধোম্মত্ত ব্যাঘ্ররাজ যখন প্রচণ্ড বিক্রমে মহারাজের হাতীর উপর চড়াও হইয়াছিল, তখন জমাদার গোলাপ সিংহ একখানি মাত্র কুকরীর উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে যে সেই হিংস্র বন্য রাক্ষসের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, কি কৌশলে ও কি ক্ষিপ্রতার সহিত তিন তিনবার তার আক্রমণ এড়াইয়া পেটের তলা দিয়া গুড়ি মারিয়া পার হইয়া আসিল—সেই দারুণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কি ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া, ধীর বুদ্ধি বিবেচনার সহিত তার মুখে ও পাঁজরে ছুরিকাঘাত করিয়া কোন শক্তিতে তাকে জম্মের মত ঠাণ্ডা করিয়া দিল, সে দৃশ্য যেমন অদ্ভুত, তেমনি অস্বাভাবিক। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, সেটা যেন বায়স্কোপের অদ্ভুত দৃশ্য। নচেৎ যে বাঘ তিন তিন বন্দুকের গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ মারিয়া হাতীর মাথায় থাবা বসাইতে ও হাওদায় কামড় দিতে পারে, সে যে কোন আক্কেলে, ওই জমাদারের খুদে কুকরির মুখে শির সমর্পণ করিল—ভাবিয়া পাইতেছি না।

গোলাপ সিংহ লোকটা পদমর্য্যাদাতেও নিতান্ত ছোট। অল্পদিন মাত্র সে এ-দেশে আসিয়াছে, এবং রাজসরকারের অধীনে হাতীশালার জমাদারী পাইয়াছে। সে নেপালী গোর্খা—উপাধি ঠাকুর রাজপুত, অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন লোক। তার শুভ্র প্রশান্ত ললাট, যোড়া ভ্রূ, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকা, সুগঠিত বলিষ্ঠ আকৃতি অভিজাত বংশের সাক্ষ্য দিত এবং নিরক্ষর মূর্খ হইলেও তার চলিবার, বসিবার, দাঁড়াইবার, সেলাম লইবার ও দিবার ভঙ্গিগুলার মধ্যে এমন একটা গুরুগম্ভীর রাজকীয় ছন্দের আদব কায়দা প্রকাশ পাইত, যাতে তাকে নিতান্তই একজন হাতীশালার জমাদার বলিয়া চিনিয়া না রাখিলে হঠাৎ একজন বড়দরের সেনাপতি বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। লোকটা বয়সে প্রৌঢ়।

শিকারী হাতীগুলার তদারকের জন্য সে আমাদের দলের সঙ্গে আসিয়াছিল, শিকারের জন্য আসে নাই। কিন্তু আজ সকালেও সকলের কাছে যার নাম অখ্যাত ছিল, হঠাৎ সন্ধ্যায় তা সুবিখ্যাত হইয়া গেল। অদৃষ্ট আর কাকে বলে! ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে লোকটা অকস্মাৎ 'মোরিয়া' হইয়া যে ধরণের ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের খেলা দেখাইয়াছে, হাওদায় আরূঢ় মহারাজা ও সাহেববৃন্দের জীবন রক্ষার জন্য, লম্ফশীল বাঘের লেজ ধরিয়া যেভাবে তার পিঠে চড়িয়া পাঁজরে কুক্‌রি হানিয়াছে, তাতে সকলেই স্তম্ভিত! বিদেশী রাজপুরুষগণের পর্য্যন্ত প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল আজ—সে!

বাঘ মরিলে, বিপদ কাটিয়া গেলে, সাহেবেরা যখন উল্লাসভরে আনন্দধ্বনি করিয়া করমর্দ্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়াইলেন, তখন বাঘের থাবায় তার পায়জামা ছিঁড়িয়া উরুদেশ হইতে প্রবল বেগে রক্ত ছুটিতেছিল, কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তৎক্ষণাৎ শিক্ষিত সৈনিকের মত রীতিমত মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিয়া, এমন প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিল, যেন এরূপ সম্মানলাভে সে চির অভ্যস্ত এবং দৈহিক যন্ত্রণা বলিতে কোন বালাই তার নাই! স্নায়ুর উপর এই অসামান্য আধিপত্য দেখিয়া আমরা ত চমকিলাম, সাহেবেরাও বিস্মিত হইলেন! লোকটা সত্যই অদ্ভুত!

২

রাত্রে আহারের টেবিলে আমরা বাঙালী হোমরা-চোমরার দল সমবেত হইয়া আজিকার কাণ্ড—তথা গোলাপ সিংহেব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন, "সেই অবস্থায় একমাত্র কুকরি নিয়ে আমি যদি বাঘের মুখে পড়তুম, তা হলে 'চানাচুর বাদামভাজা' ছাড়া আর কিছু হতে পারতুম কি না সন্দেহ!"

নিজের ক্ষীণ দেহের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলাম, "আর আমি হলে ত নিঃসন্দেহে!"

আমাদের দলের মধ্যে সৌরেশবাবু ছিলেন সেই শ্রেণীর ভদ্রলোক, কবির ভাষায় যাকে বলে "পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণু!" তিনি নিজে একজন ভাল শিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, কিন্তু চিড়িয়া শিকার ছাড়া আর কোন শিকারেই তাঁর হাত খেলিতে দেখি নাই! নিতান্ত অপ্রসন্নভাবেই তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এবার আর পারিলেন না। অধৈর্য্য

হইয়া বলিলেন, "নাও বাপু, লোকটাকে নিয়ে তোমরা বেজায় বাড়াবাড়ি করে তুলেছ! বখশীসের লোভে ব্যাটা একটা বাঘ মেরেছে, তার হয়েছে কি?"

ডাক্তারবাবু স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী ; তিনি এতক্ষণ কথা কহেন নাই, এবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "বখশীসের লোভে যদি ওন্নিভাবে প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঘ মারা সহজ হয় সৌরেশবাবু—তা হলে আপনি মারেননি কেন? মহারাজা আপনারও অন্নদাতা, গোলাপ সিংহেরও অন্নদাতা—অন্নদাতার জীবনরক্ষার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করা সকলেরই উচিত ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে সে ধর্ম্মবুদ্ধিটুকুর মর্য্যাদা কে কতটা রেখেছিল হিসাব করুন ত!"

ডাক্তারের এই শ্লেষটুকু আমাদের সকলেরই চিত্তকে নাড়া দিল, কিন্তু সৌরেশবাবু অটল! তিনি সদম্ভে বলিলেন, "হ্যাঃ! জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিল, না হাতী করেছিল! কই মরেনি ত!"

ডাক্তার ধীরে বলিলেন, "কিন্তু মরতে পারে! উরুর গ্লাণ্ডে যেভাবে বাঘের নখ বসেছে, তাতে ভিতরে ভিতরে সেপ্টিক ধরে শীঘ্রই মারা যাবার ভয় রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তেজস্বী—শুধু দেহে নয়, মনেও! বাইরের দিকে সে বেশ সতেজ রয়েছে বটে, কিন্তু তার ভিতরের অবস্থা আমি বুঝেছি। যদিও তার কাছে মিথ্যে কথা বলে সাহস দিলাম, কিন্তু সে নিজেও টের পেয়েছে। হেসে বললে, 'ডাক্তার যতই বল, আমি বুঝতে পারছি, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ আছি, চেষ্টা কর, কিন্তু এতেই আমাকে যেতে হবে'!"

সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট বাবু বলিলেন, "পাহাড়ী প্রাণ বাবা! ওতে মরণ-বাঁচন সবই সমান সয়!"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, সমানই সয়!" ...সে বল্লে, 'আমি দেখলাম, এ সঙ্কটে একটা প্রাণ উৎসর্গ না করলে মহারাজকে নিরাপদ করা যায় না! মহারাজের জীবন বহু মূল্যবান—কিন্তু আমার জীবন অতি অল্পদামের। মরব জেনেই আমি বাঘের ওপর পড়েছিলাম। নিমক খেয়েছি, তার মান রাখব না'?

মন বলিয়া উঠিল—বাঃ! কিন্তু সৌরেশবাবুর ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে হইল!

জুনিয়ার ম্যানেজার বলিলেন,"কর্ত্তা এত ঘায়েল হয়েছে, তবু গোয়ার্ত্তমি ঠিক আছে! ডাক্তার ওষুদে ফোঁটাকতক ব্রাণ্ডি মেশাবে শুনেই এক্কেবারে রুখে উঠেছে! বলে, 'খবরদার ডাক্তার, তা হলে তোমার ওষুধ ছোঁব না। মরতে ত বসেইছি, এ অবস্থায় মদ খাইয়ে আমার দেহ আর অপবিত্র কোর না, আমি বাবা পশুপতিনাথের সেবক, আমাকে শেষ সময়ে সদাচারে যেতে দাও!'—ব্যাটা গোঁড়ার হদ্দ!"

আমাদের টেবিলে তখন ইংরেজী কেতায় পাকস্থলীর কল্যাণে বোতল গ্লাস উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই বিরুদ্ধবাদী অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকটার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া এমন বেপরোয়া সমালোচনা আমরা জুড়িলাম, যা জনসমাজে প্রকাশ করিবার মত নয়! কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই বোধ হয়—বিবেকের কশাঘাত অল্পবিস্তর পরিমাণে পরিপাক করিলাম। কারণ সে রসিকতার দম বেশীক্ষণ রহিল না এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম।

হায় রে!...গায়ের জোরে তাল ঠুকিয়া বিশ্বের সব-কিছু ভালকে ভ্যাংচাইলে যদি বিশ্বজয় করা যাইত, তবে বিশ্বেশ্বরকে বোধ হয় আমরা এতদিন আন্দামানে নির্ব্বাসন দিতাম!

ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন। বলিলেন, "লোকটার গায়ের কাপড় খোলবার পর দেখলুম সর্ব্বাঙ্গে অনেকগুলা বন্দুকের গুলির দাগ রয়েছে। লোকটা আগে কি করত জানেন?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন, "ও নিজে বলে 'পল্টনের বড় সাহেবসুবোদের কাছে আর্দ্দালী ছিলাম।' কিন্তু গুজব শুনেছি, একসময়ে সরকারী পল্টনের বেশ একটা নামজাদা সিপাই ছিল। কোনও গুরুতর অন্যায় করায় চাকরী যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "অন্যায়টা কি?"

তিনি বলিলেন, "তা জানি না। লোকটা এদিকে মূর্খ হলেও আদব কায়দা বেশ সুন্দর জানে ; ইংরেজিও বোঝে একটু, বলতেও পারে। উচ্চারণ ঠিক সাহেবী ধরণের, আমাদের মত কেতাবী গৎ নয়!"

৩

পরদিন সকালে উপর হইতে পরোয়ানা আসিল—আমায়, আহত হস্তী, মাহুত এবং গোলাপ সিংকে রাজধানী অর্থাৎ সহবে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে সরকারী চিকিৎসাগারে তাদের জন্য যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আজই বাহির হইতে হইবে।

পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দুই তিনদিনের পথ অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং তদনুযায়ী যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। রসদ সংগৃহীত হইল, আহতদের শুশ্রূষার জন্য ড্রেসার কম্পাউণ্ডার ঔষধপত্র, ডুলি খাটুলি যোগাড় হইল, জিনিষপত্র বহিবার কুলি আসিল—সব স্থির করিয়া ডেরাডাণ্ডা তুলিতেছিল, এমন সময় আবার পরোয়ানা উপস্থিত। অবসব সময়ে ব্যাধ বাহাদুরগণের চিত্তবিনোদনের জন্য যে বাইজী ঠাকুরাণীগণ নাচগান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন পীড়িতা, সুতরাং তাঁকেও সহরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, তাঁর সারেঙ্গী প্রভৃতি সঙ্গীরাও সঙ্গে যাইবে।

আদেশ পাইয়া চক্ষুঃস্থির! রাগ করিয়া ডাক্তারকে বলিলাম, "আপনি মেডিকেল সার্টিফিকেট ঝাড়বার আর সময় পেলেন না? ঠিক আমাদের বেরুবার মুখেই তোপ দাগে! কেন, আমরা বিদেয় হবার পর অসুখটা মঞ্জুর করলে হোত না?"

ডাক্তার স্মিতমুখে বলিলেন, "সামান্য রক্তামাশায়, ও-তো পথে যেতে যেতেই ভাল হয়ে যাবে। তারপর ঠুংরি খাম্বাজ শুনতে পাবে, মন্দ কি?"

ঠুংরি খাম্বাজের নিকুচি করিয়াছে! এ দুর্গম পথে এ ঝামেলা অত্যন্তই দুঃসহ! তা ছাড়া আমি বিংশ শতাব্দীর অঙ্কে আবির্ভূত হইলেও এবং চাকরীর খাতিরে, এই অমার্জ্জিত প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয় প্রভুঁগোষ্ঠীর সুঙ্গে কারবার করিতে বাধ্য হইলেও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সংস্রব পছন্দের চোখে দেখিতাম না। আমার এই শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য, ঠাট্টা বিদ্রূপের অত্যাচার যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিত হইত, কিন্তু উপায় নাই! আমার রুচি স্বতন্ত্র!

কিন্তু রুচি অরুচির কান্না যেখানে চলে চলুক, চাকরীর কাছে চলে না। চাকর, চাকরই! অগত্যা উপরের হুকুম তামিল করিতে হইল।

দুর্গা বলিয়া বাহির হইলাম। সর্দ্দারীর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া সমস্ত পথ আহত হাতী, মাহুত, গোলাপ সিংহ এবং পীড়িতা বাইজীর সংবাদ লইতে সমানভাবে চোখ কাণ খাড়া রাখিতে হইল। আমার সৌভাগ্যবশে পথের মধ্যে পীড়িতদের কাহারও কোন নূতন উপসর্গ দেখা গেল না। দিনটা নিরাপদে কাটিল।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইল। সন্ধ্যার পর একটা গ্রামের প্রান্তে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রের জন্য সকলের যথোপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া পীড়িতদের আর এক দফা দেখিয়া-শুনিয়া নিজের তাঁবুতে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি—সর্দ্দারের সর্দ্দারীর উপর আর একজনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ উদ্যত হইয়া সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিয়াছে—সে গোলাপ সিংহ! নিজের ডুলির মধ্যে কম্বলমুড়ি দিয়া পড়িয়া সে নীরবে সর্ব্বক্ষণ তার রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছে, ক্ষত যন্ত্রণার জন্য কোন সাড়াশব্দ তার নাই, যখনই কুশল জিজ্ঞাসা করা যাক, মাথা নাড়িয়া নীরবে জানাইতেছে—ভাল, এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে চোখ বুজিয়াই থাক, আর খুলিয়াই থাক, তার লক্ষ্য, যে আমার—শুধু আমারই বা বলি কেন, দলের ছোকরা ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের বাচালতার উপর পর্য্যন্ত ঠিক স্থির আছে, তা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। বাইজীর কুশল জিজ্ঞাসার জন্য পথে আসিতে আসিতে যখনই কেহ তার ডুলির পাশে ঘোড়া থামাইয়াছে, তখনই সে নিজের ডুলি হইতে ঘাড় উঁচাইয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রশ্ন-কারককে লক্ষ্য করিয়াছে। আমি নিজেও সে দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাই নাই, তাতে যুগপৎ লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়াছি, মনে মনে বলিয়াছি, 'ওহে বাপু, আমাকে এতটা অপদার্থ ঠাওরাইও না। যদি ততটা 'বখা' হইতাম, তবে এতদিন মরিয়া ভূত হইয়া হাওয়ায় মিশিয়া যাইতাম। তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সশরীরে এখানে বর্ত্তমান থাকিতাম না।'

কিন্তু যে লোকটা নিতান্তই অধীনের অধীনস্থ, তাকে মুখ ফুটিয়া এতগুলা কথা বলা চলে না। কাজেই বিরক্ত চিত্তে মৌন গম্ভীর থাকিতে হইয়াছে।

তাঁবুতে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি, একজন ছোকরা কম্পাউণ্ডার আসিয়া বলিল, "বাইজী সেলাম দিয়েছে, একবার আপনার দর্শন চায়।"

বলিলাম, "কি দরকার তুমি জেনে এস বাপু।"

ছোকরা চলিয়া গেল এবং গেল যে, তা সেই পথ!...আধঘণ্টা পার হইল, অথচ তার দেখা নাই। তিনটা সিগারেট ভস্ম করিলাম, তবু বাইজীর দরকারের সন্ধান পাইলাম না। এখন কি করা যায়?

মন বলিল কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যই!

অগত্যা নিজেই সন্ধান লইতে উঠিলাম। আমার তাঁবুর পাশেই গোলাপ সিংহের তাঁবু। তাঁবুর দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলাম, সামনেই খড়ের বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিয়া মালা জপিতেছিল। আমায় দেখিয়া অভিবাদন করিল। বলিলাম, "এখন কেমন আছ জমাদার?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি একটা রাত্রিচর ছোট পাখী সাঁ করিয়া আমার মাথার পাশ দিয়া উড়িয়া তাঁবুতে ঢুকিল, পরমুহূর্ত্তে ঝটপট করিয়া উড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় আমার হ্যাটের উপর একটা ঝাপ্টা হানিয়া পলাইল! আমি 'আঃ' বলিয়া মাথা নোয়াইলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গোলাপ সিংহ বলিল,"ওটা কি? চামচিকা?"

বলিলাম, "কি জানি, তা হতে পারে।"

অন্যমনস্কভাবে সে বলিল, "চামচিকার স্পর্শ ভাল নয়।"

বিদ্রূপভরে বলিলাম, "কি হয়? মরে যায়?"

সে একটু হাসিল, উত্তর দিল না। বিদ্রূপের রোখ চড়িয়া গেল, বলিলাম, "হাঁচি, টিকিটিকি, চামচিকে, গিরগিটি তুমিও তা হলে মান?"

সে ধীরভাবে বলিল,"পরিণামদর্শী মাত্রেই মানে। যাক, এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

উত্তরে জানাইলাম, তাহাদেরই খোঁজ তল্লাসে বাহির হইয়াছি। তার যন্ত্রণা কিরূপ, রাত্রের আহার হইয়াছে কি না, ক্ষুধা কিরূপ, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে উত্তর দিল।

কথা চলিতেছে, দূবে চটপট চটিজুতার আওযাজের সঙ্গে গুণগুণ গানের সুর শোনা গেল!

"আমাব মাথা ন্যাড়া কবে দাও হে তোমার
ধাবালো ক্রপের ক্ষুবে
কাল কোঁকড়ানো চুল হে আমাব
চেঁচে ফেলে দাও দূবে।"

চাপা আওয়াজ হইলেও তাতে উৎসাহ-মত্ততার অভাব ছিল না। স্বরে চিনিলাম —সেই ছোকরা কম্পাউণ্ডাব। মনে মনে বলিলাম, "আমিই তোমার মাথা ন্যাড়া করিব, আগাইয়া এস বাপু।"

গোলাপ সিংহ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল,"হুজুর, স্পর্শদোষ বিচারটা অনেকে অলীক কুসংস্কার বলে মনে করেন, নয়? স্থূল স্পর্শ দূরে থাক, একটা নটীর বাতাসের প্রভাবস্পর্শে এই ছোকরার দল কি রকম উদভ্রান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করেছেন কি? এদের এই মত্ততাব পরিণাম—এদের দেহ মন আত্মার সমস্ত কল্যাণ, কোন নিরুদ্দেশের ঠিকানায় যে পাঠাবে, তা এরা জানে না। আপনি এদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, আপনি এদের সংযত করুন, আমার অনুরোধ!"

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা ধ্বনিত হইল যে, অবাক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

ছোকরা ততক্ষণে তাঁবুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, দুয়ারের সামনেই আমাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া—"এই যে! আপনি এখানে?"—বলিয়া দাঁড়াইল!

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হুঁ, তুমি ত আচ্ছা ডুব মেরেছিলে! তাঁর খবর কি?"

ছোকরা সঙ্কুচিতভাবে একবার গোলাপ সিংহের দিকে চাহিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "অনুগ্রহ করে একবার এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

বাহিরে গিয়া তাঁবুর আড়ালে দাঁড়াইলাম, সে চুপি চুপি বলিল, "বাইজী বললেন, আপনি গিয়ে যদি বসেন, তাহলে একটু সঙ্গত বসায়। দু চারটে বৈঠকী গানটান—"

আমি সঙ্গীতভক্ত এবং বয়সে প্রবীণ নহি, ইহা সত্য। কিন্তু তা হইলেও স্থান কাল পাত্রের বিচার ভুলিয়া আমোদে মত্ত হওয়া পছন্দ করি না। উপরওলাদের খাতিরে হাজিরা সহি করিবার জন্য—না হয় বাইজীর গানের আসরে আবির্ভূত হই, তা বলিয়া এই অসুস্থগুলির দায়িত্ব স্কন্ধে থাকিতে এখানে এমন অময়ে নিজের খুসীর খাতিরে 'ভেড়ার গোয়ালে' আগুন লাগাইব? তার উপর গোলাপ সিংহের অনুরোধ মনে পড়িল। গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "মা লক্ষ্মী আছেন কেমন?"

আমার বিশেষণের বহর দেখিয়া সে থতমত খাইল। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

কথাটার পুনরুক্তি করিয়া বলিলাম, "বাইজী ভাল আছেন ত? তাঁকে বিশ্রাম কবতে বলো, এ সময় গানবাজনা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। আর তুমি ওষুধপত্র নিয়ে ড্রেসাবদের সঙ্গে করে একবার এস, হাতীটার ঘা রাত্রেই ড্রেস করে রাখা যাক। নইলে সকালে বেরুতে দেবী হবে।"

ছোকরার মুখের উৎসাহ প্রদীপ্ত আনন্দের আলো এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। কোথায় বাইজীর বৈঠকী গান, আর কোথায় আহত হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা!—আশা করি ছোকরা মনে মনে আমাব সদ্য স্বর্গলাভ কামনা করিল। মুখ আঁধার করিয়া সে চলিয়া গেল। আমিও হাতীর উদ্দেশে চলিলাম।

৪

হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা সমাধা হইল। দলবল লইয়া ফিরিতেছিলাম, তাঁবুর কাছে আসিয়া পৌছিয়াছি, হঠাৎ অসাবধানে বিষম হোঁচট খাইয়া, আছড়াইয়া পড়িলাম। হাতে একটা ঔষধের বোতল ছিল, সেটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইযা হাঁটুর চারিপাশে বিঁধিয়া গেল, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিল!

সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে তাঁবুর মধ্যে আনিল, ক্ষতস্থান ধুইয়া মুছিয়া ঔষধপত্র দিয়া যথারীতি ব্যাণ্ডেজ করিযা দিল। সারারাত বিনিদ্র নয়নে যন্ত্রণার আরাম উপভোগ করিলাম, রাত্রিচর পাখীর স্পর্শ ও গোলাপ সিংহের বাণী মনে পড়িল। লোকটার উপর শ্রদ্ধা বাড়িল।

সকালে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইল। এবার ঘোড়া ছাড়িয়া খোঁড়া পায়ে ডুলিতে আশ্রয় লইলাম। পথের মধ্যে গোলাপ সিংহের জ্বর বাড়িয়া উঠিল, তার দিকে সতর্ক মনোযোগ রাখিতে হইল। আমার সেবাযত্নে সে কুণ্ঠিত হইল, কৃতজ্ঞ হইল, বাবা পশুপতিনাথের নিকট বার বার আমার জন্য কল্যাণ কামনা করিল।

সন্ধ্যায় আবার তাঁবু পড়িল। আহত হাতী ও মাহুত ভাল আছে, আমার পায়ের যন্ত্রণাও তখন কমিয়াছে। কিন্তু গোলাপ সিংহ বে-এক্তার হইয়াছে! বুঝিলাম তাকে 'কালে' ধরিয়াছে, মনটা খারাপ হইয়া গেল। আসন্ন-মৃতের জন্য প্রাণটা সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।

যথাসাধ্য সব কর্ত্তব্যপালন করিয়া শয্যা লইলাম। দিনে ডুলিতে আসিতে আসিতে

বেশ খানিক ঘুমাইয়াছিলাম, তাতেই গত রাত্রের অনিদ্রার গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল। সহজে ঘুম আসিল না। শয্যায় পড়িয়া নানা কথা ভাবিতেছিলাম, পাশের তাঁবু হইতে গোলাপ সিংহের মৃদু কাতরানি কানে গেল। ঘুম যখন হইতেছে না, তখন লোকটাকে একবার দেখিয়া আসা যাক।

উঠিলাম। রক্ষী সৈন্যরা জাগিয়াছিল, তাহাদের একজনের সাহায্যে খোঁড়া পা লইয়া তার তাঁবুতে ঢুকিলাম।

সে চাহিয়া দেখিল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

বসিলাম। বলিলাম, "বল।"

সে বলিল, "কাল আমরা শহরে পৌছাব। পৌছেই আমার ছেলেকে আসবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন।"

পকেট হইতে পেন্সিল ও নোটবুক বাহির করিয়া তার ছেলে শম্ভু সিংহের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম, শহরে পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রাম পাঠাইব।

সে যখন অনেকটা সুস্থ হইল তখন আপনা হইতে পরিচয় দিল যে তার ছেলে 'আংরেজি' শিক্ষিত। নেপাল সরকরের অধীনে 'কাঠমুণ্ডু'তে কি একটা চাকরী করে। তার বিবাহ হইয়াছে, সম্প্রতি একটি সন্তান হইয়াছে। সেই গোলাপ সিংহের একমাত্র পুত্র। ছেলেটি বড় ভাল!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীতে আর কে আছে? তোমার মাতা, স্ত্রী—"

সে মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে জানাইল—"সবাই আছে।" কিন্তু আর কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। তার যন্ত্রণা আবার বাড়িল, সে অধীর হইয়া পড়িল।

যদি ঘা ধোয়াইয়া দিলে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়, সেই ভরসায় ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদেব ডাকিয়া পাঠাইলাম।

বসিয়া বসিয়া তার যন্ত্রণাভোগ দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে চোখ মেলিয়া চাহিল, সনিশ্বার্সে বলিল, "বাবুসাহেব, ঢের কষ্ট করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। অকালে আয়ুক্ষয় করবার মত, দারুণ পাপানুষ্ঠান করে রেখেছি, তার ফল আমায় ভোগ করে যেতেই হবে। দেখুন কি শাস্তি!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করার চাইতে—এইখানেই সজ্ঞানে একেবারে শাস্তিভোগ শেষ করে যাওয়াই ভাল। যা হচ্ছে বেশ ভালই হচ্ছে। হাঁ, আর একটা কথা, শম্ভু এসে পৌছান পর্য্যন্ত যদি জীবিত না থাকি, তবে তাকে বলবার জন্য গোটাকতক কথা আপনার জিম্মায় গচ্ছিত রেখে যাই, তাকে বলতে পারবেন?"

বুক কাঁপিয়া উঠিল, কে জানে কি কথা! আত্মদমন করিয়া বলিলাম, "পারব, বল।"

সে বলিল, "প্রথম কথা—আমার মৃত্যু সংবাদ আমার মাকে জানিয়ে যেন বলে, সতীবাক্য আমার জীবনে সফল হয়েছে, বাঘের থাবাই আমার মৃত্যুর কারণ হোল, তাঁকে

প্রণাম জানিয়ে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা—শম্ভু তার বিমাতাকে যেমন সম্মান করে মাথায় তুলে নিয়েছে, চিরদিন যেন তেম্নি সম্মান করে মাথায় রাখে। তিনি নির্দ্দোষ!"

বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, "তোমার দুই বিবাহ?"

মাথা নাড়িয়া সে চোখ বুজিল। দু' ফোঁটা অশ্রু তার চক্ষুপ্রান্ত বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিযা আর প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না, নির্ব্বাক রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ-পীড়িত কণ্ঠে বলিল, "বাবুসাহেব, শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কখনো পরস্ত্রীর দিকে কুৎসিত কামনার দৃষ্টিতে চাইবেন না। তাতে যে শুধু মানসিক অধোগতি মাত্র লাভ হবে, তা নয়। জীবন অভিশপ্ত হয়ে যাবে। পরস্ত্রীকে পাপভাবে স্পর্শমাত্রই আয়ুঃক্ষয়—সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অধোগতিও অনিবার্য্য, এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়! সচেতন অনুভবশক্তিশীল, বিবেকনিষ্ঠ মানুষের জীবনে এটা পরীক্ষিত সত্য!"

আর কথা হইল না। ড্রেসারবা আসিয়া ক্ষত পবিষ্কার করিতে বসিল। সে কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাবহ দৃশ্য।

কায শেষ হইল, ড্রেসাররা তাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াইযা চলিয়া গেল। যন্ত্রণার প্রথম বেগটা সামলাইয়া সে একটু সুস্থ হইল, আমিও বিদায় নিয়া উঠিলাম।

গোলাপ সিংহ্ শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। এদিকে নিরক্ষর হইলেও সৌজন্য শিষ্টাচাব তাব যথেষ্ট ছিল।

করমর্দ্দন কবিয়া সহানুভূতি-সিক্ত করুণ কণ্ঠে বলিলাম, "এখনো কি যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"খুব।" নমস্কাব করিয়া সে রুদ্রাক্ষেব মালাটি জপ করিবার জন্য তুলিযা লইল। শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ম্লান হাসি টানিয়া বলিল, "পরিণামদর্শী হতে শিখুন বাবুসাহেব! এ জগতে প্রত্যেক কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী!...হবে না যন্ত্রণাভোগ। শয়তানের প্রলোভনে, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য দেহে উৎকট পাপানুষ্ঠান করেছি। দেখুন, সেই দেহের উৎকট শাস্তি যন্ত্রণাভোগ!"

উঠিয়াছিলাম, তার কথা শুনিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম। আরও কথা শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে মালাসুদ্ধ হাত যুক্ত করিয়া সবিনয়ে বলিল, "ক্ষমা করুন, এবার আমায় একা থাকতে দিন। বলবার কথা হয়ত অনেক ছিল—কিন্তু বলাব সময় আর নাই। জীবনশক্তি শেষ হয়ে আসছে ; যতক্ষণ জ্ঞান আছে, পৃথিবীর সব চিন্তা ভুলে ভগবানের নামে আমাকে একান্তভাবে মনোনিবেশ কবতে দিন।"

হৃদয় ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহিব হইল। ভগবানের চরণোদ্দেশে তার মঙ্গল কামনা জানাইয়া নীরবে উঠিয়া আসিলাম।

৫

শহরে পৌঁছিলাম। রাজকীয় হাসপাতালে তাদের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শম্ভু সিংহের নামে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বাসায় ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসিল, খোঁড়া

পা বিষাইয়া উঠিল। তিন চারদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারিলাম না।

গোলাপ সিংহের খবর পাইতেছিলাম—অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছে। সেদিন রাত্রে হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে দেখিতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন শম্ভু সিংহের টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে, সে আজ রাত্রে আসিয়া পৌছিবে। কিন্তু গোলাপ সিংহের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ, রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ।

মাথা ঘুরিয়া গেল। হায় অদৃষ্ট! এমন পাকচক্রে জড়াইয়া কাবু হইয়া পড়িলাম যে শেষ সময়ে নির্ব্বান্ধব অভাগাকে একটু দেখাশুনা করিতেও পারিলাম না। অশান্তিভরে কোনরকমে রাত্রিটা কাটাইয়া সকালেই হাসপাতালে ছুটিলাম, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! রুদ্রাক্ষের মালাধৃত ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া গোলাপ সিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, তার পায়ের কাছে বসিয়া এক সুন্দর প্রিয়দর্শন নেপালী যুবক চোখের জল মুছিতেছে।

শুনিলাম সেই শম্ভু সিংহ। পিতার মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন পিতার বাকরোধ অবস্থা; ভিতরে জ্ঞান ছিল, পুত্রকে চিনিতে পারিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবানের নাম শুনাইতে ইঙ্গিত করে। তারপর পুত্রের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে জপমালাধৃত হাতটি বুকের উপর তুলিয়া শান্তভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বুঝিলাম, আমার কর্ত্তব্য গোলাপ সিংহ আমার জন্যই রাখিয়া গিয়াছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি শেষ করা হইল। শোকার্ত্ত শম্ভু সিংহকে লইযা নিজের বাসায় আসিলাম।

সে একটু শান্ত হইলে নিভৃতে তাহাকে ডাকিযা তাহাব পিতার মন্তব্য জানাইলাম। শম্ভু নীরবে শুনিল, নীরব বহিল। শুধু তার চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সসঙ্কোচে বলিলাম, "আমার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধ ক্ষমা কর ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার বিমাতা কি—", প্রশ্নটা শেষ করিতে মুখে আটকাইয়া গেল।

শম্ভু আমার মুখের দিকে চাহিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তিনি আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নন। তবু তিনি আমার মা, তাঁর জীবনের ইতিহাস বড় বিষাদবহ। তিনি আমাদেরই স্বজাতীয়া, সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর কন্যা। বিবাহও তাঁর সদ্বংশে শিক্ষিত রূপবান যুবকের সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া দূরে থাক—বড় অত্যাচার যন্ত্রণাপীড়িত হয়েছিল। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি সব সত্ত্বেও তাঁর স্বামীর মন ছিল বড় কদর্য্য, প্রকৃতি ছিল হিংস্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম। সৌন্দর্য্যেও তিনি—সন্তান আমি, মাতৃরূপেব কি আর পরিচয় দেব? রূপে মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সেই সৌন্দর্য্যই তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কদর্য্য সন্দিগ্ধ-চেতা স্বামী, সেই সৌন্দর্য্যের জন্যেই সর্ব্বদা তাঁর নিষ্পাপ তেজস্বী চরিত্রকে সন্দেহ করতেন এবং অলীক সন্দেহে উত্তেজিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে সর্ব্বদাই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করতেন।

তাঁর স্বামী ও শ্বশুর মীরাটে সরকারী গোর্খা পল্টনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁরা তখন সপরিবারে সেখানে বাস করতেন। পিতাও সরকারী পল্টনের পনের ষোল বৎসরের পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মঠ সিপাহী। বুয়র যুদ্ধে, চীনা যুদ্ধে কাজ দেখিয়ে তিনি সম্মান ও

পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভাগ্যদোষে তিনিও সেই সময়ে মীরাটে বদলি হন। প্রতিবেশী কন্যার প্রতি অত্যাচারের কথা কাণে উঠতেই তাঁর তেজস্বী বীর চিত্তে অশান্তি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে কাপুরুষোচিত অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, ফলে হিতে বিপরীত ঘটে। তাঁর এই অযাচিত পরহিতৈষণা বৃত্তি সন্দিগ্ধচেতা কাপুরুষকে অধিকতর হিংস্র বর্ব্বরতায় মাতিয়ে তোলে, মেয়েটির ওপর নির্য্যাতন অত্যন্তই বেড়ে ওঠে!

অত্যাচারে অতিষ্ঠ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা বালিকা পালিয়ে এসে পিতার কাছে আশ্রয়-প্রার্থিনী হন, নেপালে তাঁর পিত্রালয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। পিতা সেই সময়ে আইনের সাহায্যে যদি তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন, তবে বোধ হয় সবদিকেই ভাল হোত, কিন্তু সে বুদ্ধি তাঁর হয়নি। নিজের দায়িত্বেই তাঁকে রক্ষা করতে উদ্যত হলেন, পল্টনের চাকরীর নিয়ম লঙ্ঘন করে বিনা ছুটিতে তদ্দণ্ডেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিত্রালয়ে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।

এরকম অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যা করে থাকে তিনিও তাই করেন। পথে সর্ব্বত্রই তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। নেপালের নির্জ্জন দুর্গম পথে চলবার সময় বালিকার রক্ষার জন্য অনেকসময় পরস্ত্রী সম্বন্ধীয় সাধারণ দূরত্বের ব্যবধানও তাঁকে লঙ্ঘন করতে হয়। বাক্য ব্যবহারের এইসব অনাচার, সম্ভবতঃ তাঁর নৈতিক বুদ্ধি ও সংযম-পূত উন্নত মনকে মোহাবিষ্ট কলুষিত করে। তারপর—সন্তান আমি, কি আর বলব? সংযমী চরিত্রবান পিতার ভ্রান্তি ঘটে, সয়তান তাঁর স্কন্ধে ভর দিয়ে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—"

মাথা হেঁট করিয়া সে নীরব হইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল, "জানি না বাবু কার কতখানি দোষ। তবে লক্ষ্য করেছি, বিমাতা চিরজীবন পিতাকে বিজাতীয় ঘৃণা করে এসেছেন। কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন না। যাক সে কথা—তারপর তাঁরা দেশে পৌঁছালেন। সমাজের ঘৃণা এবং আইনের দণ্ড তাঁর মাথার উপর উদ্যত হোল। পলাতক সিপাহি হিসাবে গভর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি অবিলম্বে ধৃত হলেন, দণ্ডিত হলেন, চাকরী গেল। বিমাতাকে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা গৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হলেন। সমাজের নিন্দা ঘৃণার তীব্র উপদ্রব, তীব্রতর হয়ে উঠল, অশান্তি-পীড়িতা পিতামহী অভিশাপ দিলেন—যে দেহের দ্বারা পিতা পরস্ত্রীর পবিত্রতানাশকারী পশুকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করেছেন, সে দেহ যেন অকালে পশুদ্বারাই ধ্বংস হয়ে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।

পিতামহীর অভিশাপ পিতার জীবনে সফল হয়েছে—তবুও বীরধর্ম্মী তিনি, আর্ত্তরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করেছেন, এটুকুও আমাদের পক্ষে মহৎ সান্ত্বনা। বীর তিনি, বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুলাভ করেছেন ; অভিশাপ তাঁর আশীর্ব্বাদ হয়েছে সত্যই!"

সে অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বিমাতা এখন কোথা?"

শম্ভু সিংহ উত্তর দিল, "তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত—কাজেই আমাকে তাঁর সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। মাতা এবং পিতামহীকে শান্ত করে তাকে, আমার দ্বিতীয়া জননী—আমাদেরই পরিবারভুক্ত স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু পিতা গবর্ণমেণ্টের দণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আট বৎসরে

আর গৃহে ফেরেননি। অনেক চেষ্টার পর সন্ধান পেয়ে গত বৎসর দিল্লীতে গিয়ে তাঁকে ধরেছিলাম, বাড়ী ফেরাবার জন্য ঢের চেষ্টা করেছিলাম, বললেন, 'এ মুখ আর কাউকে দেখাব না! তুমি ফিরে যাও, আমার মায়ের আর তোমার মায়েদের ভার তোমার উপর রেখেছি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর গে।' তারপর পুনশ্চ সাক্ষাতের অনিচ্ছাতেই বোধ হয়— সেই রাত্রিই দিল্লী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তারপর, আর তাঁর কোন খবর পাইনি। পেলাম একেবারে এই টেলিগ্রামের সংবাদ, হোল একেবার এই শেষ সাক্ষাৎ।"

দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প, তবু বোধ হল, নিজের ভুলের জন্য তিনি জীবনে দারুণ অনুশোচনা ভোগ করেছেন।"

শম্ভু সিংহ বলিল,"নিরক্ষর হলেও সাধারণ নৈতিক বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান তাঁর যথেষ্ট ছিল। জ্ঞানীর হৃদয়ে বিবেকের তাড়না বড় তীব্র বাবুসাহেব, বড় তীব্র!"

ক্ষমতার জয়

মাঘ মাস। কয়দিন আকাশ মেঘলা হইয়া আছে। দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইয়াছে। মানভূমের প্রচণ্ড পাহাড়ে-শীত অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

রাত্রি তখন একটা। বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া আরামে শুইয়া আছি। সমস্ত দিন সরকারী হাসপাতালের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, অবসাদক্লান্ত দেহটা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। গভীর আরামদায়ক তন্দ্রা ধীরে ধীরে জমিয়া আসিতেছে।

সহসা সদর দুয়ারের কড়া নড়িয়া উঠিল। হেড কম্পাউণ্ডার চন্দ্রনাথের স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "বাবু, ডাক্তারবাবু, শীগগির উঠুন।"

সুখময় তন্দ্রাটি একলাফে—বোধকরি সাধুভাষায় যাহাকে বলে স্বর্গারোহণ, তাই করিলেন। ডাক্তারির ঝকমারিকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া অতি দুঃখে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। জানালা খুলিয়া বলিলাম, "কি হে, কি খবর?"

রাস্তা হইতে চন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "হাসপাতালে একটা সাংঘাতিক জখমি কেস এসেছে। চট ক'রে আসুন।"

জখমি কেসের অবস্থা যতই সাংঘাতিক হউক, নিজের অবস্থা ভাবিয়া বড় কম দুঃখ হইল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, "ইহাই চিকিৎসক-জীবনের ব্রত।"

আমাদের কথার শব্দে ছোট ছেলেটির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সানুনাসিক সুরে কান্না জুড়িল। সুতরাং স্ত্রীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি জামা জুতা পরিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হ'য়েছে?"

উত্তর দিলাম, "হাসপাতাল যাচ্ছি। একটা জখমি কেস এসেছে।"

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া আমার গৃহীত ব্রত সম্বন্ধে এমন একটা শ্রুতিকটু বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন, যাহা শুনিতে পাওয়া কোন চিকিৎসকের পক্ষে শ্রুতি-সুখকর নয়। ইচ্ছা হইল, খুব একটা কড়া জবাব দিই। কিন্তু সেই দুপুর রাতে বাহিরে জখমি রোগী ফেলিয়া ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে বাজে কথার প্যাঁচ লড়িয়া কুরুক্ষেত্র বাধানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে দুঃসাহস প্রকাশ করিলে ছেলে-মেয়ে সব কয়টির ঘুম ভাঙ্গিবে, এবং তজ্জনিত চ্যাঁ-ভ্যাঁ চীৎকার উপদ্রবের আশঙ্কা যথেষ্ট।

গায়ে মোটা কোট চড়াইয়া, জুতার ফিতা বাঁধিয়া ষ্ট্যাথিসকোপ লইয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে চন্দ্রনাথ লণ্ঠন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া উত্তেজনা-রক্ত মুখে বলিল, "চাঁদজোড় কোলিয়ারীর ছোট ম্যানেজার অটলবাবুর পায়ে কে তীর মেরেছে। ডান পায়ের ডিমটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'য়ে তীর বিঁধে র'য়েছে। এখনি অপারেশন করতে হবে।"

কোলিয়ারীর শ্রমিকদের মধ্যে 'গায়ের জোর' নামক ঔদ্ধত্যের বড়াই নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার নয়। কাজেই সেখানে মাবামারি, কাটাকাটি, নানাবিধ কুৎসিত উত্তেজনা-মূলক কাণ্ডের নিত্যনৈমিত্তিক উৎসব লাগিয়া আছে। ইহা তাহাদের সমাজে এমন গর্ব্বের বিষয় যে, শুধু পুরুষেরা নয়, উহাদের স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগিনীরাও তাহাতে মহোৎসাহে যোগদান করে। কোন কারণে এই দুর্ধর্ষ 'মালকাটা' সম্প্রদায়ের বিরাগ-দৃষ্টিতে পড়িলে, শুধু কোলিযারী সম্পর্কিত বাবুরা নহেন, সাহেবসুবারাও মধ্যে মধ্যে উত্তম-মধ্যম লাভ করেন। সুতরাং ইহাদের সংস্রববর্ত্তী একজন পদস্থ বাঙালী ভদ্রসন্তানের পা বাণবিদ্ধ হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, "যে তীর মেবেছে, সে কি ধরা পড়েছে?"

সেই কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথির অন্ধকারমধ্যে এদিক ওদিক তাকাইয়া, চন্দ্রনাথ সন্তর্পণে চুপি চুপি বলিল, "না। কিন্তু এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে। মনে হয়, অটলবাবু কি-একটা কথা চেপে নিচ্ছেন।"

অকাল সুপ্তিভঙ্গে একে মাথা ধরিয়া গিয়াছিল, তার উপর চন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত 'রহস্যে'র গন্ধ মা মনসার উৎসৃষ্ট ধূনার ধোঁয়ার মত তুষ্টিদায়ক বোধ হইল। রাগ করিয়া বলিলাম, "তোমার নবেলিয়ানা রাখ বাপু! এর মধ্যে রহস্য আবার কি থাকবে? ভদ্রলোক চেপেই বা নেবেন কি? হয়ত কুলি-ঠেঙানো, নয়ত মজুরি কাটা—রাগেব মাথায় তারাই কেউ দুশমনি ক'রে থাকবে। কোলিয়ারীতে এসব ত প্রায়ই হচ্ছে।" কথা কহিতে কহিতে আমরা হাসপাতালে পৌঁছিলাম।

২

অটলবাবু সুন্দর সুপুরুষ পূর্ণবয়স্ক যুবা। অল্পদিন হইল তিনি চাঁদজোড় কোলিয়ারীর দ্বিতীয় ম্যানেজার হইয়াছেন। লোকটি বুদ্ধিমান এবং কার্য্যকুশল। কথা-বার্ত্তা আচার-ব্যবহার অতি ভদ্র। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহাদের কোলিয়ারীতে একটা প্রকাণ্ড কয়লাব চাপ খসিয়া

জনকয়েক কুলি হতাহত হয়। সেই দুর্ঘটনা-ব্যপদেশে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। লোকটীর মধ্যে সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার জোর ঘটনাক্ষেত্রে বিশেষরূপে দেখিয়াছিলাম বলিয়া, মনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাবহ স্মৃতি জাগিয়াছিল। সেই ভদ্রসন্তানটির আজ গুপ্তশত্রুহস্তে নির্য্যাতন দেখিয়া প্রাণে বেদনা বোধ হইল।

অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই সুন্দর মুখ উৎকট যন্ত্রণায় নীল হইয়া গিয়াছে। অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে তিনি নিঃশব্দে তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু অবরুদ্ধ ক্লেশে অস্বাভাবিকভাবে সর্ব্বাঙ্গের পেশী বার বার সঙ্কোচবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। চোখের প্রান্ত বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু গড়াইতেছে। রক্তে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।

ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অনেকগুলা শিরা ও পেশী ভেদ করিয়া তীরটা পায়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। সহকারীদের ইঙ্গিত করিলাম, "সত্বর অস্ত্রোপচারের আয়োজন কর।"

ক্লোবোফরম করিয়া অনেকখানি মাংস কাটিয়া তীরটা বাহির করিলাম।

ধীরে ধীরে ক্লোরোফরমের নেশা কাটিয়া আসিতে লাগিল। বাকশক্তি সচেতন হইয়া আসিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া অটলবাবু যন্ত্রণা-পীড়িত স্বরে নেশার ঝোঁকে অস্ফুট কণ্ঠে নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, "চিনিনি কি? চিনেছি। কিন্তু এ দুর্ব্বুদ্ধি ত তার চিরদিন। এ ইতরামির কথা লোকের কাছে প্রকাশ করব কি ক'রে? বংশের কলঙ্ক যে! ওঃ জগদীশ্বর, ওকে দুষ্কার্য্য থেকে বাঁচাও!"

এ কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ? চিন্তিত হইলাম। তীরটা বিষাক্ত ছিল কি না সন্দেহ হইতে লাগিল।

সযত্নে তাঁর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রাণপণ সতর্কতায় সময়োপযোগী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতে মন দিলাম।

পরে প্রমাণ হইল, বেশী না হইলেও তীরটা বিষাক্ত ছিল। শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান যুবার দেহ, তাই রক্ষা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষের কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

কয়েকদিন হাসপাতালে বাখিয়া সঙ্কটজনক অবস্থাটা কাটাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে পাঠান হইল। আমি ও চন্দ্রনাথ প্রথমে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন গিয়া ক্ষত পরিচর্য্যা কবিয়া আসিতাম। পবে চন্দ্রনাথ একা যাইত। প্রায় দেড মাস ভুগিয়া ভদ্রলোক আরোগ্য লাভ কবিলেন। কিন্তু তাঁহার আহত পা-খানি চিরদিনের জন্য একটু খঞ্জ হইয়া রহিল। ইহার মধ্যে যথারীতি পুলিশের হাঙ্গামা হইল ; কিন্তু মূল অপরাধী ধরা পড়িল না।

শোনা গেল, অটলবাবুব অবহেলাপূর্ণ জবানবন্দীতে মোকদ্দমা পণ্ড হইয়াছে। তিনি না-কি বলিয়াছেন যে, ছোটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি রাত্রে একা বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন অন্ধকারে কোথা হইতে হঠাৎ একটা তীর আসিয়া তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়। তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভৃত্যেরা আলো লইয়া ছুটিয়া আসে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া যায়। কে কোথা

হইতে তীর ছুড়িয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার শত্রু কেহ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না! তিনি কাহাকেও সন্দেহ করিতে অনিচ্ছুক।

অটলবাবু সুস্থ হইবার পর কিসের জন্য জানি না, পুলিশ সহসা শান্ত হইল। আর কোন গোলমাল শোনা গেল না। কিন্তু শুনিতাম আমাদের চন্দ্রনাথ অন্তরালে তাহার সঙ্গী-সাথীদের কাছে ওই ব্যাপারের আলোচনাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ভয়ানক অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। চাপা গলায়, ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিত, "অটলবাবু কাপুরুষের মত ভয়ে ছেড়ে দিলেন, এটা নেহাৎ অন্যায় হ'ল। এ লোক প'ড়ে মার খাবে না ত খাবে কে? হ'ত আমাদের ময়মনসিং জেলা, তা' হলে—"

তাহা হইলে বীরদর্পে সে যে কাণ্ড করিত, সেটা ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার ওজন ঠিক রাখিয়া পাকা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হইত কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সরকারী শাসনবিভাগের কর্ত্তাদের কানে সে আস্ফালনের সংবাদ পৌঁছিলে, হয়ত তাঁহারা ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের কোন এক বিশেষ ধারা চন্দ্রনাথের উষ্ণ মস্তিষ্কের উপর জারি করিতেন। সরকারী হাসপাতালের ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদেব আইন-জ্ঞানের অভাব, কাজেই তাহারা বিনা দ্বিধায় চন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করিত। তাহাদের মধ্যে কে কবে কোথায় কিরূপে অনিষ্টকাবী শত্রুনির্য্যাতনে সাফল্য লাভ করিযাছে, তাহার বিববণ সোৎসাহে বর্ণনা করিত।

পাশের ঘরে নিরীহ চিকিৎসক আমি, অবকাশকালে চুরুট টানিতে টানিতে নীরবে তাহাদের আলোচনা শুনিতাম। বুঝিতাম আহত অটলবাবুকে ড্রেস করিতে গিযা, তাঁহার আততাযী সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যেরূপে হউক অনেক কিছু গুপ্ত সংবাদ শুনিযাছে। হয়ত সে সংবাদগুলার কোন ভিত্তি নাই, হযত বা আছে। কিন্তু অটলবাবু যখন স্বেচ্ছায আততায়ীকে নিষ্কৃতিদানে ইচ্ছুক, তখন চন্দ্রনাথেব অনধিকার-চর্চ্চা কেন?

কিন্তু অটলবাবু ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝিতে পারি না। মনে সংশয় জাগে। ক্লোরোফরমের নেশায় তাঁহাকে প্রলাপ বকিতে শুনিয়াছি, তাহা মনে পড়ে—আর মনে পড়ে যখন বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, তখনকার কথা। গুপ্ত ঘাতকের কথা উঠিলেই তিনি মুখ ফিরাইয়া দেওয়ালের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া থাকিতেন! দেখিতাম দেওয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে বোনা ছোট একটি কবিতা টাঙানো রহিযাছে :—

যে পারে অপরে আছাড়ি ফেলিতে
সে ত বলবান নয়।
অপকাবী জনে, যে পাবে ক্ষমিতে
তারি ক্ষমতাব জয়॥

শ্রুতিমধুর নীতি-কথা! কিন্তু প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অপরাধীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা, বাস্তবক্ষেত্রে কয়েকজনের দেখিয়াছি, মনে পড়ে না। ভদ্রলোক কি এতই সেণ্টিমেণ্টাল?

সুতরাং সন্দেহ শুধু সন্দেহমাত্রই রহিযা গেল!

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার ঠিক তেমনি মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রি। রাত্রের আহার সারিয়া সবেমাত্র উঠিয়াছি, এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "চাঁদজোড় কোলিয়ারী থেকে ডাক এসেছে।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম মোটর লইয়া স্বয়ং অটলবাবু উপস্থিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে গভীর বিষাদের ছায়া।

প্রশ্ন করিলাম, "কার অসুখ? আপনার বাড়ীতে নাকি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমার বাড়ীর কাছেই। আমার এক জ্ঞাতিভাই কোলিয়ারীতে চাকরী করেন, তাঁরই অসুখ।"

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি কিছুদিন হইতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কে এক হাতুড়ে চিকিৎসক বন্ধু সে-ব্যাধি কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অবহেলাভরে যথেচ্ছ চিকিৎসা কবিতেছিলেন। সম্প্রতি তার উপর নিউমোনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তাও চিকিৎসক-প্রবরের বিজ্ঞতায় প্রথমটা অবহেলিত হইয়াছে। এখন রোগীর সংজ্ঞালোপ হইয়াছে, অবস্থা সঙ্গীন।

অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া আসিবার জন্য চন্দ্রনাথের নিকট চাকর পাঠাইলাম। জামাজোড়া পরিয়া নিজে অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া আসিলাম। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিস বহিয়া আনিয়া শোফারের পাশে বসিল। নবেলিয়ানা এবং গোঁয়ার্তুমির দোষ যতই থাক, কাজের সময় চন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটপটে হুঁসিয়ার বলিয়া এসব ক্ষেত্রে আমি সকলের আগে তাহাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিতাম।

সমস্ত জিনিসপত্র ঠিক লওয়া হইয়াছে কি না, তার হিসাব পরীক্ষা শেষ হইলে চন্দ্রনাথ বলিল, "কার অসুখ মশাই?"

ম্লান মুখে অটলবাবু বলিলেন, "আমার এক ভাইয়ের।"

আর কথাবার্ত্তা হইল না। মোটর সশব্দে ধাবিত হইল। চুরুট ধরাইয়া রোগীর সম্বন্ধে অটলবাবুকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। শুনিলাম রোগী তাঁহার সমবয়স্ক, খুব শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই কোলিয়ারীতে কুলী-সংগ্রাহকের কার্য্য করিতেছিলেন, কাজটা অটলবাবুর অনুগ্রহেই জুটিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, লোকটির বিদ্যাবুদ্ধি ছিল কম এবং প্রবৃত্তি ছিল অতি হীন। কুসংসর্গে মিশিয়া কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া, কুৎসিত ব্যাধির বিষে শরীর জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লোকটির সন্তানাদি কয়েকটি হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃকৃত পাপব্যাধির ফলে তাহারা অকালে মারা গিয়াছে। এখন সংসারে আছে তাঁহার শুধু চিররুগ্না স্ত্রী এবং হতভাগিনী মাতা।

নীরবে চুরুট টানিতে লাগিলাম। ভগবানের রাজ্যে পাপানুষ্ঠান করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও পরিত্রাণ পাইতে দেখিলাম না। কলেজে পড়িবার সময় স্বাধীনচিত্ততা প্রমাণের জন্য নাস্তিক্যবাদ কপচাইতাম। কুতর্কের আস্ফালনের তাল ঠুকিয়া ভূত-ভগবান সব উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন দেখিয়া এবং ঠেকিয়া দিনে দিনে জ্ঞানলাভ করিতেছি।

যথাস্থানে গিয়া গাড়ী থামিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম!

সামনে একটা বাড়ীর দুয়ারের কাছে কতকগুলা কুলি-মজুর শ্রেণীর লোক বসিয়া,

রাস্তার পাশে খড়কুটা জড় করিয়া আগুন জ্বালিয়া তাপ লইতেছিল। তাহারা শশব্যস্তে উঠিয়া অটলবাবুকে নমস্কার করিল।

অটলবাবু তাহাদের বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর খবর দাও। ডাক্তার এসেছেন । এখন অবস্থা কেমন?"

তাহারা যাহা উত্তর দিল তার সারমর্ম্ম এই—রোগীব অবস্থা এখন সেইরকমই। তবে চোখে আরও ঘোলা পড়িয়াছে। জিভ আরও এড়াইয়া গিয়াছে, প্রলাপের জোর আরও বাড়িয়াছে।

বুঝিলাম—অবস্থা সেইরকম নয়। রকম আরও খাবাপ।

চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া সহসা চমকিয়া উঠিলাম! ইহার হইল কি? উদ্বেগ-বিবর্ণ মুখে, প্রথম চঞ্চল দৃষ্টিতে সে বার বাব সেই বাড়ীব দুযারের দিকে এবং অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিতেছে কেন?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। চন্দ্রনাথ ঢোক গিলিয়া বলিল, "এ বাড়ীতে কার অসুখ?"

অটলবাবু বলিলেন, "আমার এক জ্ঞাতি-ভাইয়ের।"

রুদ্ধশ্বাসে চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল, "যিনি কুলিদের রিক্রুটার বাবু?"

অটলবাবু বলিলেন, "হাঁ।"

চন্দ্রনাথ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল! অতর্কিতে তাহাব কণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড দমকের সহিত নির্গত হইল, "ওঃ!"

ভিতর হইতে লোক আসিয়া ডাকিল, "আসুন।" হতবুদ্ধি চন্দ্রনাথের পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "চল হে!"

৪

ভিতবে গিয়া শয্যাশায়িত সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চমৎকার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ! আক্ষেপ হইল—সদাচারে জীবন যাপন করিলে এই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের অধিকারী নিঃসন্দেহে দীর্ঘজীবী হইতেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দেহের সব যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। জীবনীশক্তি তখন নিঃশেষপ্রায়। সময় থাকিতে সুচিকিৎসা ও সুনিয়ম পালন হইলে, হয়ত কিছু করা যাইত, কিন্তু এখন আর কিছু করিবার সময় নাই। রোগীর বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া বলিলেন যে রোগীর বন্ধু ডাক্তারটি অতিশয় বিজ্ঞ। তিনি চিরকাল ইহাদেব পারিবারিক চিকিৎসকরূপে কত রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন। রোগীর এবারের অসুখেও বরাবর বলিয়াছেন, "কোন ভয় নেই, এ রোগ কিছুই না।" রোগীও তাই বুঝিয়া আর কোন চিকিৎসককে ডাকিতে দেন নাই। যথেচ্ছাচাবী রোগীর কর্ত্তৃত্বই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। আজ অচৈতন্য রোগীর আর কোন কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া, তিনি ও তাঁহার পুত্রবধূ কান্নাকাটি করিয়া অটলবাবুকে সংবাদ দিয়াছেন। অটলবাবু তৎক্ষণাৎ আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়াই আমাদের আনিতে গিয়াছিলেন। এখন আমরা যদি—

নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিলাম। কোন আশা-ভরসার কথা বলিয়া মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগের যন্ত্রপাতি গুছাইতে গুছাইতে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "রোগীর যথেচ্ছাচারের পৃষ্ঠপোষক কোলিয়ারীর সেই কুলি-হন্তারক বিজ্ঞ চিকিৎসকটি এ সময় গেলেন কোথায়?"

একজন উত্তর দিল, "বারো ক্রোশ দূরে একটা ফলারের নিমন্ত্রণ আছে, সেইখানে ছুটেছেন।"

কোলিয়ারীর একজন চাপরাশী রসিকতা করিয়া আর একজন চাপরাশীর উদ্দেশে অস্ফুটস্বরে বলিল, "লুচির নিমন্ত্রণ থাকলে বামুন আঠারো ক্রোশ ছুট দিতেন।"

চন্দ্রনাথ গভীরতর ক্ষোভের সহিত বলিল, "দেব-দ্বিজে ভক্তি রাখবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এইসব ব্রাহ্মণদের রকম সকম দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছি মশাই। আমার ক্ষীণজীবী ভক্তির পরমায়ু বুঝি আর টেকে না।"

মনে মনে বলিলাম, দোষারোপ বৃথা। অকাল-মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পক্ষে মানুষের নিজের দুর্ম্মতিই যথেষ্ট। সে দুর্ম্মতির পৃষ্ঠপোষকতা করিবার লোক তাহারা নিজেরাই খুঁজিয়া লয়। সে চিকিৎসকটি নিমিত্তের হেতু মাত্র।

ব্যর্থ জানিয়াও শেষ চেষ্টা যথাসাধ্য করিলাম। কিন্তু সব বৃথা। গভীর রাত্রে রোগীর মৃত্যু হইল।

শুনিলাম সৎকার করিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। হিসাব করিয়া দেখা গেল, অটলবাবুর শ্যালক ও অটলবাবু ছাড়া মৃতের স্বজাতি কায়স্থ-সন্তান আমি ও চন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত আছি। চিকিৎসকের সজ্জা ছাড়িয়া অগত্যা শববাহকের বেশ ধরিলাম। মৃতের শোকার্ত্তা মাতা ও পত্নীর কাছে অটলবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে রাখিয়া আমরা শেষ রাত্রে শব লইয়া শ্মশানে চলিলাম। সঙ্গে আলো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া জনকয়েক কুলি ও চাপরাশী চলিল।

শ্মশান অনেক দূরে। মৃতের শোকাহতা স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। অটলবাবুই শবের মুখাগ্নি করিতে প্রস্তুত হইলেন।

চিতা সাজাইয়া শব চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। অটলবাবু অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

গভীর মর্ম্মব্যথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর তখন কাঁপিতেছিল। মনে হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরা সেই মঙ্গল-প্রার্থনা, যেন মূর্ত্ত সজীব হইয়া দ্রুত চঞ্চল অগ্নিমুখে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

মনে মনে আমিও শ্রীভগবানের চরণে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিলাম।

পিছন ফিরিয়া দেখি, আমাদের ময়মনসিংহের দুর্ধর্ষ-প্রতাপ, নির্দ্দয় ন্যায়পরায়ণ চন্দ্রনাথ, দীনহীন কাঙ্গালের মত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে অগ্নিকর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে!

জানি সে ভাব-প্রবণ যুবা। তবু এতটা আশা করি নাই। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিদান করা হইল। চিতা জ্বলিয়া উঠিল। অটলবাবু খঞ্জ চরণে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া শ্রান্তভাবে চন্দ্রনাথের পাশে বসিলেন। ব্যথাহত কণ্ঠে ডাকিলেন, "চন্দ্রবাবু!"

চন্দ্রনাথ সাশ্রু নয়নে তাঁহার দু'হাত চাপিয়া ধরিল। আবেগভরে বলিল, "আপনার খোঁড়া পায়ে তার শত্রুতার চিহ্ন চিরদিনের মত রইল। আপনি যদি সেদিন ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতেন, তা হ'লে হয়ত তার পাপের ভার লঘু হ'য়ে যেত। হয়ত তাঁর এমনভাবে ভরাডুবি হ'ত না। ঈশ্বর জানেন! অত্যাচারীর দুষ্কার্য্য আপনি সেদিন স্বেচ্ছায় গোপন করেছিলেন ব'লে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভীরু, কাপুরুষ! মূঢ় আমি! সেদিন অন্যায়ের অত্যাচারে ভয়ানক অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, ক্ষমার অত্যাচার তার চেয়ে শতগুণ ভয়ানক! এ যেন সহ্য করা যায় না।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অটলবাবু বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন, "মানুষমাত্রেই অনেক ভুল ক'রে থাকে! নির্ব্বোধের ভুলের জন্য ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য!"

ব্যস, আর কিছু নয়! স্তম্ভিত হইয়া একবার সেই শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার দিকে —একবার অটলবাবুর খঞ্জ চরণের দিকে চাহিলাম। এতদিনের পর চন্দ্রনাথের কথিত সেই 'রহস্য' আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, কেন, কিসের জন্য এ অত্যাচার? স্পষ্ট বুঝিলাম, যে-কুবুদ্ধি ওই হতভাগ্যকে আজ নিজের অকাল মৃত্যু নিমন্ত্রণে বাধ্য কবিয়াছে, সেই কুবুদ্ধিই একদিন পরশ্রীকাতর হইয়া, হিংস্র উম্মাদনায় নিরীহ জ্ঞাতি-ভ্রাতার মৃত্যু ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছিল। জগদীশ্বর নিরপরাধকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরাধী—যত গোপনেই অপরাধ করুক, তাঁহার বিচারে পরিত্রাণ পাইল না! আশ্চর্য্য তাঁহার বিধান!

অটলবাবুর ক্ষমাসুন্দর বেদনার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিনের পর আজ সেই কার্পেটে বোনা কবিতার শেষ ছত্র দু'টি মনে পড়িল :

'অপকারী জনে, যে পাবে ক্ষমিতে
তারি ক্ষমতার জয়!'

উদয়ন, ভাদ্র ১৩৪০

দীপ্তি

সদর দুয়ারের ওদিক হইতে বালক ভৃত্য জগুয়া হাঁকিল, "বড়া কোঠিকো সরকারবাবু আয়া।"

সামনের নির্জ্জন ঘরে, টেবিলের কাছে চেয়ারে বিমলা বসিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে

দুয়ারের পানে চাহিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিল। বিমলার দেহখানি শীর্ণ দীর্ঘ, চোখদুটি বিষাদমাখা, দুর্ভাবনা ভারে ক্লান্ত মুখখানি শুষ্ক মলিন। কঙ্কালসার দেহের সমস্ত পেশীচর্ম্ম এমন অস্বাভাবিকভাবে শুকাইয়া কুঁচকাইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে তাহার বয়স বাইশ কি বাহান্ন সহসা স্থির করা কঠিন। দারিদ্র্য এবং অমিতাচার —দুষ্ট জীবন যাপনের ফলে তাহার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সজীবতা, যৌবনশ্রী সব যেন অকালে লুপ্তপ্রায়।

বিমলার পরিধানে আধময়লা শাড়ী ও সেমিজ। হাতে কয়েক গাছি কাঁচের চুড়ি ও 'নোয়া'। সীমন্তে সিন্দূর।

টেবিলে একটা সেলাইয়ের কল, এবং তার চারপাশে রেশমী ও সুতার নানারকম কাপড় বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া পাট করিয়া থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে। সেগুলোর দিকে চাহিয়া, মাঝে মাঝে দু একটা অর্দ্ধ সমাপ্ত সেলাই হাতে লইয়া বিমলা অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছে। তারপর আবার দুয়ারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল।

সহসা জগুয়ার ডাক কানে পৌঁছিল। 'বড়া কোঠির' অর্থ বিমলা বুঝিল, পাশের বড় বাড়ীর মালিক হাইকোর্টে ওকালতি করেন, সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন। পূজার ছুটিতে অন্যবারের মত এবারও কাশীধামে বায়ুসেবনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার নাৎনী, দীপ্তি সম্প্রতি আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতেছে। বিমলার সঙ্গে তাহাদের কি দূর কুটুম্বিতা আছে।

সুতরাং বড়া কোঠির অর্থ সহজে বোঝা গেল, কিন্তু সরকারবাবুটিকে এবং এই ঠিক দুপুরের সময় এখানে তাঁহার কি প্রয়োজন—তাহা বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া দৌর্ব্বল্য ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে, সরকারবাবু?"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমি।" বলিতে বলিতে গ্রাম্য সৌন্দর্য্যপ্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টায় কৃত্রিম হাসিমাখা মুখে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল।

. বিমলা চাহিয়া দেখিল, লোকটির চেহারা যেমন বেঁটেখাটো, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। বিশেষতঃ দেহের মধ্যদেশ এত বেশীমাত্রায় পরিপুষ্ট যে অত খর্ব্ব দেহে অত বড় ভুঁড়ি নিতান্তই বেমানান ঠেকে। লোকটির হাত পা কয়খানি দেহের অনুপাতে খর্ব্ব ও স্থূল। মাথার পিছনে গাছকতক কাঁচা পাকা চুল, সামনে প্রকাণ্ড টাক। দাড়িগোঁফ ক্ষৌর নির্ম্মূল। মাংসল সুগোল মুখমণ্ডলের বৃহৎ পরিধির মাঝে ছোট ছোট চোখ ছোট কপাল এবং দুইপাশে ঠেলিয়া বাহির হওয়া চোয়ালের অতি-প্রশস্ততা দেখিতে কেমন শোভন, সে কথা না বলাই ভাল। লোকটির চলিবার কায়দার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য এবং ধীরতা প্রকাশের বেশ একটা চেষ্টা ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র চক্ষুদুটির তীব্র চঞ্চল দৃষ্টিতে, অসার দম্ভপ্রিয়তা, নির্লজ্জ ধৃষ্টতা, খলতা ও লোভের পরিচয় যেন জাজ্জ্বল্যমান।

লোকটির নাকে ও কপালে সযত্ন রচিত তিলক। গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা। পরণে খাট ধুতি, হাতকাটা ফতুয়া, কাঁধে উড়ানি। পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা।

লোকটি ঘরে ঢুকিতে বিমলা একটু থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সসঙ্কোচে . বলিল, "ও-বাড়ী থেকে আসছেন? বসুন!".

লোকটি নিকটস্থ বেতের মোড়ায় বসিলেন। দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনাবশ্যক

ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "কই, মাঠাকরুণটি কই?"

ভিতর মহলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বিমলা বলিল, "খেতে গেছেন। কি দরকার জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

লোকটি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "দরকার? না, এমন কিছু নয়। এই—এইদিক যে যাচ্ছিলাম, তাই একবার এলাম। উকীলবাবুর অর্ডারি জামাগুলা তৈরী হয়েছে কি?"

বিমলা নিজের চেয়ারে বসিল। সেলায়ের কলের ঢাকা খুলিতে খুলিতে বলিল, "প্রায় একটু বাকী আছে, আজই শেষ করে পাঠানো যাবে।"

বিমলাকে কলের ঢাকা খুলিতে দেখিয়া লোকটি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলেন। একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি—আপনিও সেলাই করতে জানেন বুঝি?"

কলের সূঁচে সূতা পরাইতে পরাইতে বিমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

মোড়াটা টানিয়া টেবিলের কাছে আগাইয়া আসিয়া লোকটি মহা ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কই সেলাই করুন ত, দেখি।"

বিমলা একটা অসমাপ্ত সেলাই কলে জুড়িয়া কল চালাইতে লাগিল।

লোকটি খানিক চাহিয়া দেখিলেন। তারপর দারুণ আক্ষেপভরা উত্তেজনার সহিত নিজমনে বলিতে লাগিলেন, "নাঃ, মেয়েদের কোন কাজ আর বাকী রইল না। সকল দিকে এরা পুরুষের টেক্কা দিয়ে চলেছে। আর আমার বড় ছেলেটা। ব্যাটাছেলে হলে কি হবে? তিন তিনবার পাশ দিয়েও পাশ হতে পারলে না। লোকের কাছে বলতে দুঃখু হয়। এদিকে ব্যাটা বিয়ে করেছে, দুটো মেয়ে হয়েছে, শুধু পাশের বেলা অষ্টরম্ভা। আর এইসব মেয়ে, এরা কি না করছে? এরা খটাখট কল চালাচ্ছে, টপাটপ পাশ করছে। বাবুর নাৎনী দীপ্তিকে জানেন ত? সে বি-এ পাশের পড়া পড়ছে গা। কম কথা? পুরুষদের গালে চুণকালি দিচ্ছে। তাতেও লজ্জা নেই।"

লজ্জাটা যে কাহার নাই, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না। কিন্তু বিমলা সত্যই লজ্জিত হইল। এই লোকটির আক্ষেপের মাঝে যে ঈর্ষাপ্রবণ মনের অক্ষম আক্রোশ-দিগ্ধ মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইল, তাহার সামনে বিমলা মাথা তুলিয়া বসিতে কুণ্ঠা বোধ করিল। কৌতূহলী লোকটির আবদার রক্ষা করিবার জন্য সরলচিত্তে সেলাই করিয়া দেখানো যে তাহার উচিত হয় নাই—লোকটির জাতীয় গৌরব অভিমানে তাহাতে কাল্পনিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে, বা অক্ষম পুত্রের জন্য বেদনায় অধীর হইবার আশঙ্কা আছে, একথা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারে নাই বলিয়া মনে মনে ক্ষোভবোধ করিল।

সেলাই শেষ হইলে সেটা বাহির করিয়া বিমলা আর একটা সেলাই কলে জুড়িল। লোকটি সদ্যঃ-সমাপ্ত সেলাইটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া বার বার ডাহিনে বাঁয়ে ঘাড় কাৎ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলাইটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর হতাশক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "নাঃ। কোথাও একটু বাঁকাচোরা নাই। ঠিক সোজা লাইন হয়েছে।"

বাহিরের দিকের দুয়ারের কাছে সেই সময় নরম জুতার খুটখুট্ শব্দ শোনা গেল।

পর মুহূর্ত্তে পর্দ্দা সরাইয়া, একজন আঠারো উনিশ বৎসর বয়সের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকিল। মেয়েটির চেহারা একহারা লম্বা, সুগঠিত। মুখশ্রী প্রখর বুদ্ধিশ্রী দীপ্ত, উজ্জ্বল চক্ষুদুটি কৌতুকচঞ্চল। পরণে সাধারণ শাড়ী সেমিজ, চোখে চশমা, হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার, পায়ে জুতা। ঈষৎ কুঞ্চিত, দীর্ঘ কেশ শোভিত, অনাবৃত মাথা, এবং শাদা সিঁথা মেয়েটির কুমারীত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সরকারমশাই, আপনি!"

২

লোকটি শশব্যস্তে বলিলেন, "কেন কেন? কর্ত্তা আমায় ডাকছেন?"

"না, ডাকেননি। কিন্তু প্রমীলার রাজ্যে আপনি! আশ্চর্য্য ত।" আমি গিয়ে দান্নিকে বলে দেব।"

'দান্নি'—অর্থাৎ 'দাদামণি' শব্দের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা অপভ্রংশ।

লোকটি মহা অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, "না না বোলনি, বোলনি। তাঁর জামাগুলো কেমন সেলাই হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি।"

মেয়েটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "টাকা ধারদেনেওয়ালা শিকার খুঁজতে আসেননি ত? ব্যস, তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত। এবার সরে পড়ুন, কেননা আমি এসেছি।"

তটস্থ হইয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। কর্ত্তার কাছেই যাচ্ছি, মনে করলুম—জামাগুলো তৈরী হয়ে থাকে ত, হাতে করে নিয়ে যাই।"

মেয়েটি অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিল, "মাথায় করে নিয়ে গেলেও কিছু হবে না। ওসব যত্ন আত্তির ঘুসে তাঁকে ভোলাতে পারবেন না। যদি তিনি ভালমানুষি করে ভোলেন, আমি ভুলব না। দান্নিকে স্পষ্ট বলেছি, যদি তিনি পাপকে প্রশ্রয় দেন, আমি তাঁকে পুলিশে দেব।"

সরকার মহাশয়ের চক্ষে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সত্রাসে বলিলেন, "পুলিশে দেবে কর্ত্তাকে?"

মেয়েটি অম্লানবদনে বলিল, "নিশ্চয়। দুটি অসহায় বিধবা ভাদ্র-বৌকে ফাঁকি দিয়ে তাদের সম্পত্তি আপনি যখন গলাধঃকরণ করেছেন, তখন দান্নির মত ভদ্রলোকের উচিত, আপনার গলায় আঙ্গুল দিয়ে সেগুলা টেনে বের করা। তা যদি তিনি না করেন, তা হলে আমি তাঁকে ছাড়ব না। বাবা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জ্যাঠামশাই সাব জজ, কাজেই আইনের মজা আমিও কিছু কিছু বুঝি। আমি তাঁকেও দেখ্‌ব, আপনাকেও দেখব।"

সরকার মহাশয়ের যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। মুমূর্ষু রোগীর মত টানিয়া টানিয়া শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "এ্যাঁ এ্যাঁ—একি কথা? দাদামশাই গণ্যিমান্যি লোক, তাঁকে দেবে পুলিশে। এ্যাঁ, একি মেয়েমানুষ।"

স্মিতমুখে মেয়েটি বলিল, "হ্যাঁ, মনে আছে আমি মেয়েমানুষ। আপনাদের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা। যেমন আপনার বিধবা ভাদ্র-বৌ দুটি—"

"তা—তা—তাদের নাম কোরনি, কোরনি। তারা কি ভদ্দরলোকের মেয়ে? আমার

নামে নালিশ—ও-ও ওয়ারেণ্ট বের করা! এ কি ভদ্দতা? আমি ভাসুর গুরুজন—", ক্রোধের উত্তেজনায় সরকার মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল, "নিজের মান নিজের কাছে সরকারমশাই। আজ আইনের তাড়া খেয়ে ভাসুর গুরুজন সেজে মানের কান্না কাঁদলে চলবে কেন? সময়ে নিজের গুরুত্ব, মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।"

"তু—তু—তুমি জান না সব কথা। তারা পাজী ছোটলোক—", ক্রোধের আতিশয্যে সরকার মহাশয়ের তোৎলামির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বলিলেন, "অ-অতি ছোটলোক।"

"যেহেতু তারা ন্যায্য প্রাপ্যের অধিকার দাবী করে। জানি সব। গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেছেন, তিলক কেটেছেন, ঘটা করে হরিনামের মালা জপ করেন, সব ভাল। ওগুলোকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু ওতে ভণ্ডামী জোচ্চুরি নৃশংসতা ঢাকা পড়ে না। লোকের চোখ আছে, আড়ালে চুপি চুপি সত্য কথা বলে, এমন লোকও আমি দেখেছি।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সেই শহুরে বাবুগুলো ত? তারা বলবেই ত। জ্ঞাতি শত্তুর কিনা। থাকত গাঁয়ে, ত দেখে নিতাম। চালে আগুন ধরিয়ে দিতাম, খুন করতাম। কে ধরত আমায়? গায়েও লেখা থাকত না। বলে কত অমন পার করে দিছি—"

"স্বীকারোক্তিগুলা অত্যন্ত স্পষ্ট হচ্ছে, বিমলাদি সাক্ষী। ভাদ্র-বৌদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবেন, না এবার আমিই পুলিশ ডাকব?" মেয়েটির কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কঠিন!

দমিয়া গিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "কেন?"

"নৈতিক বুদ্ধি আর সৎসাহসের মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষেরই আছে! আপনার মত মানুষকে জেলখানার বাইরে থাকতে দিলে শুধু পতিপুত্রহীনা ভাদ্রবৌদের ক্ষতি নয়, সামাজিক শান্তিরও ব্যাঘাত। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, তখন আঙ্গুল বাঁকাতে মানুষ বাধ্য হয়, যান।" সে দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাইল।

মুখ আঁধার করিয়া সরকারমশাই বাহিরে যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন বোঝা গেল না। তিনি প্রস্থান করিলে মেয়েটি ধীরেসুস্থে একখানি মাদুর মেঝেয় বিছাইয়া শয়ন করিল। বিমলা হতবুদ্ধির মত নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি স্মিতমুখ বলিল, "এবার তুমি সেলাই কর বিমলাদি, আর ত্যক্ত হবার কারণ নেই।"

৩

ভিতরের বারেণ্ডা হইতে শুভ্র বসনা প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকিয়া, নিঃশব্দে সস্নেহ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিলেন। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "কিঞ্চিৎ জ্যাঠামো করছিলাম। আপনি শুনতে পেয়েছেন বোধ হয়? বারেণ্ডায় ছিলেন ত?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "কি করি? ঘরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। দীপ্তি, আমার বাড়ীতে ভদ্রলোকের অপমান, এর জন্যে আমিই ত দায়ী।"

দীপ্তি বলিল, "আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি বড়দি। দান্নির সামনে একটু সমীহ্ করে চলতে হয়, মনের সুখে সব কথা স্পষ্ট করে সরকারমশাইকে বলতে পারিনে। আজ সুবিধেমত চাট্টিখানি সৎপরামর্শ দিলাম।"

বড়দি এ পাড়ার সকলেরই বড়দি। দীর্ঘকাল হইতে বিধবা মা ও মাতামহীর সহিত কাশীবাস করিতেছেন। মা ও মাতামহী এখন পরলোকে। উত্তরাধিকারসূত্রে বড়দি মাতামহীব বাড়ীর অর্দ্ধাংশের অধিকার লাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধাংশ মাসতুত বোন বিমলার অধিকারভুক্ত। বিমলা স্বামীপুত্রকন্যা লইয়া সেখানে থাকে। বড়দি জামা কাটছাঁট সেলাই করিয়া দোকানে চালান দিয়া নিজের খরচ চালান। বিমলার স্বামী পূর্ব্বে কোথায় চাকরি করিতেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় চাকরিটি ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া কয়েক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে দাম্পত্য সুখভোগ, এবং সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। সঞ্চিত পুঁজি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতেছে, মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইতেছে, ছেলেরা পরিবারযোগ্য হইতেছে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী ভদ্রলোকটি এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ভগবানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বাখিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু বিমলা দিনে দিনে উদ্বেগে শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। নিরুপায হইয়া সম্প্রতি সে বড়দির শরণাগত হইয়াছে। কাটছাঁট শিখিয়া অবসরকালে কিছু কিছু সেলাই করিয়া, এইদিক হইতে যৎসামান্য উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে।

দীপ্তির কথার উত্তরে বড়দি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিভীষণের দুর্ব্বুদ্ধি ধরেছিল, তাই সে দাদা রাবণকে আপনজন ঠাউরে দরদ করে রামনাম জপাতে গিয়েছিল। ফলং—"

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল, "বক্ষে পদাঘাত লাভ! সরকারমশাইও আমাব মুণ্ডপাতদানে বঞ্চিত করবেন না, নিশ্চিন্ত আছি। চাকরদের আড্ডায় গিয়ে খবর নিন, শুনবেন—ঘোরতর পরাক্রমে তিনি সেখানে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন।"

প্রৌঢ়া কয়েকটা সেলাই বাছিয়া বিমলাকে সেলাই করিতে দিয়া দীপ্তির পাশে গিয়া শুইলেন। স্মিতমুখে বলিলেন, "জীবনে যদি নিজের মঙ্গল চাস, কখনো নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করিসনি।"

দীপ্তি বলিল, "স্বার্থের অনুরোধে পরের অপকার করতে আমার আপত্তি আছে, মনে করবেন না। আমিও আস্তে আস্তে সেয়ানা হয়ে উঠছি। কিন্তু সরকারমশাই শ্রেণীর সজ্জনদের সুশিক্ষার বহর দেখলে মাঝে মাঝে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই—ওই যা দুর্ব্বলতা, সেই সময়ে নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধনের উগ্র ইচ্ছা জেগে উঠে!"

প্রৌঢ়া একটু হাসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "এদেশের মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় যতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে নিরস্ত হওয়া উচিত, তোমার জন্যে ঠিক ততটুকু পথ মেপে দিয়ে পিতৃ-দায়িত্ব পালন করাই তোমার বাবার কর্ত্তব্য ছিল। তা তিনি করলেন না। যা শেখালেন, রীতিমত যত্নের সঙ্গেই শেখালেন। এখন সামলানো দায়।"

দীপ্তি বলিল, "আমাদের এখন বুঝতে হয়েছে, লেখাপড়া শেখাটা একটা বিশেষ শ্রেণীর আলস্য-বিলাস বা ফ্যাসান মাত্র নয়। মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে সৎ এবং

ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চ্চাটা অত্যন্ত আবশ্যক। আশ্চর্য্য হয়ে এক এক সময় ভাবি—মহর্ষি মনু আজ বেঁচে থাকলে আমাদের দুর্ম্মতি দেখে কি ভয়ানক ক্রুদ্ধই না হতেন!"

বড়দি চোখ বুজিয়াই বলিলেন, "হতেন নাকি? খুব রাগী ছিলেন বুঝি?"

"তাঁর শ্লোকগুলা দেখে তাই মনে হয়। আপনাদের ইষ্টমন্ত্রকেও ছেড়ে কথা কয়েছেন ভাববেন না।"

বড়দি নিদ্রার চেষ্টা ভুলিয়া গেলেন। চোখ খুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলিস কিরে, ঠাট্টা না কি?"

দীপ্তি সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাট্টা? শুনুন তবে—মনুর শ্লোক—

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়ামন্ত্রৈরিতি ধর্ম্ম ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃত মিতিস্থিতিঃ॥"

মানে, স্ত্রীলোকের জাতকর্ম্মাদি কোন মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্ত্রীলোকদের স্মৃতি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই, কোন মন্ত্রেও এদের অধিকার নাই! এতবড় অপার কৃপার দান, আপনাদের বরাতে বরাদ্দ করে গেছেন! আর কি চান?"

"বাপ! শুনলেও যে ভয় করে। মন্ত্রেও অধিকার নেই! স্ত্রীলোকদের উপর ঠাকুরটির এত রাগ! কেন বলতে পারিস?"

দীপ্তি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বোধ হয় সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে চটাচটি হয়েছিল। রাগের মাথায় শাস্ত্র লিখতে বসে ধা করে ঐ শ্লোকটা তাই ঝেড়ে দিয়েছিলেন!"

বড়দি পুনশ্চ চোখ বুজিয়া বলিলেন, "হয়ত তাই। আহা মহর্ষি যখন এসব শাস্ত্র রচনা করেন, তুই তখন কোথায় ছিলি দীপ্তি?"

দীপ্তি পুনশ্চ শুইয়া পড়িল। আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিতে তুলিতে অবহেলা ভরে বলিল, "ধরে নিন—আমি তখন তাঁর গোয়ালঘরে খোটায় বাঁধা পড়ে জাবের সদ্ব্যবহার করছিলুম!"

বড়দি তন্দ্রালসচক্ষে স্মিতমুখে বলিলেন, "আর মহর্ষির স্ত্রী হয়ত সেদিন—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া দীপ্তি বলিল, "ধরে নিন—এই বিমলাদি যা করেন! ভাঁড়ারঘরের অভাব অভিযোগ নিয়ে স্বামীর কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে গিয়েছিলেন। মনে করুন না, গিন্নিবান্নিরা যেমন করেন— এই বাসি পাট সেরে, নেয়ে, আহ্নিক পুজো করে, তা'পর সংসারের অভাব অনটনের চর্চ্চা নিয়ে—স্বামীর নিশ্চিন্ত আরামে শাস্ত্রচর্চ্চার বিরুদ্ধে রীতিমত দু'কথা শুনিয়েই দিয়েছিলেন।"

আশ্বস্ত হইয়া বড়দি বলিলেন, "তাই হবে রে দীপ্তি; আহ্নিক পূজা করে উঠেই গিন্নি গিয়ে চেঁচামেচি করে মহর্ষিকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই মহর্ষি—হুঁ, তাই হবে। নইলে মন্ত্রের অধিকার কেড়ে নেবেন কেন? খামকাই কি এত রাগ হয়?"

দীপ্তি মুচকি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তার কিছু পরেই মহর্ষি আবার বিধান দিয়েছেন,

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥"

বড়দি বলিলেন, "তার মানে?"

মানেটা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দীপ্তি অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "অনুমান করা শক্ত নয় যে, সকালের ঝড় কেটে যাবার পর স্ত্রীর মাথা খোঁড়াখুঁড়িতে বাধ্য হয়ে

—অপ্রসন্ন মহর্ষি খেতে এলেন। স্ত্রী খুব যত্নআত্তি করে পেট ভরে খাওয়াবার পর মহর্ষির রাগ পড়ে গেল। স্ত্রীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে আরামে এক চোট লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে, খুশীর ঝোঁকে আবার ওই বিধান বের করে ফেললেন—'দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ।"

একটু থামিয়া, ঈষৎ হাসিয়া পুনশ্চ বলিল, "নাঃ, ঋষিদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। ওইজন্যেই সরোজবাবু...না বিমলাদি?"

বিমলা সেলাই করিতে করিতে মাঝে মাঝে কল থামাইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় কথাগুলার অর্থ বুঝিবার জন্য উভয়ের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু কিছু বুঝিতেছিল, এমন লক্ষণ আদৌ প্রকাশ পাইতেছিল না, প্রশ্ন-স্পৃষ্ট হইয়া এবার অবসাদ জড়তাগ্রস্ত স্বরে বলিল, "কি?"

"এই স্বর্গভোগেব খাতিরে সরোজবাবু উপার্জ্জন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হযে বসে আছেন, নয়? কিন্তু অতগুলি কাচ্চাবাচ্চা, খাবে কি? স্বর্গের মুরুব্বি কি বলেন?"

৪

বিমলার কন্যা অনূঢ়া ষোড়শী চপলা সেই সময় ঘবে ঢুকিয়া তীব্র বিরক্তির সহিত বলিল, "মা, বাবা ডাকছেন, শীগগীব যাও বাপু।"

হা করিয়া খানিক চাহিয়া থাকিয়া বিমলা আলস্য জড়তাচ্ছন্নের মত বলিল, "কেন রে?"

মেয়েটি অধিকতর বিবক্তির সহিত বলিল, "জানিনে বাপু। ঘুম থেকে উঠে কোথা বেরিয়েছিলেন, সস্তাদামে মাংস কিনে নিযে বাড়ী এলেন। বললেন এখুনি সাঁৎলে রাখতে হবে।"

"তুই যা-না মা। উনুনে দুখানা কাঠ ঘুঁটে দিয়ে—"

"যা তোমার বজ্জাত ছেলেমেয়ে। ওদের সামলাব, না মাংস সাঁৎলাব?"

"দিগে যা না ওর কাছে। একটু আটকে রাখুক।"

"ফের শুয়ে পড়েছেন। ছেলে দিতে গেলে এখুনি খিঁচিয়ে উঠবেন। তুমি চল মা, ওসব সেলাই ফেলাই রাখ। জান ত বাবা কেমন মানুষ। তোমার ওসব সখ কেন বাপু? এস শীগ্গী।"

মেয়ে প্রস্থান করিল। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেলাইগুলা গুটাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "চললুম বড়দি। আমার কিছু কি স্থির হয়ে করবার যো আছে?"

বিমলা প্রস্থান করিল। দীপ্তি স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন কথা বলিল না।

বড়দি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থেকে সরোজের মতিগতি দিন দিন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিজের উপার্জ্জন চেষ্টা নেই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দেবে না, স্ত্রীকে সেলাই ফোঁড়াই করে দু পয়সা আনতে দেবে না। কেবল দেনা করে খোলামকুচির মত পয়সা ওড়াতে চায়। বাড়ীর ইট কাঠ কখানা বেচে এবার যে-কদিন চলে চলবে। তারপর বিমলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে কোথা দাঁড়াবে, কি খাবে, জানি না।"

দীপ্তি বলিল, "প্রবল সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারী। শুধু নাবালক আর বিধবা নয়, বিমলাদির মত সধবাদের অবস্থাও মন্দ দেখছিনে। দৌর্ব্বল্য-ক্লান্ত দেহে, গজেন্দ্রগমনে বেশ চলেছে!"

বড়দি বলিলেন, "হাঁ, বেশ চলেছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন, আলস্য আরামপ্রিয়, যথেচ্ছাচারী, স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব যন্ত্রণা কতখানি, বিমলার কাছে জেনে নিস। এসব দেখে শুনে, তোরা যে বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিস তাতে আশ্চর্য্য হইনে।"

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। নীরবে ভাবিতে লাগিল।

বড়দি খানিক গড়াগড় দিয়া উঠিয়া বসিলেন। সেলাইয়ের কলটা মেঝেয় নামাইয়া কাটা কাপড়চোপড়গুলা গুছাইয়া লইয়া সেলাই করিতে করিতে বলিলেন, "দীপ্তি, তুই বি, এ পাশ করে তারপর এম, এ পড়বি?"

দীপ্তি অন্য মনে বলিল, "সুবিধা পাই ত পড়ব?"

"তারপর কি করবি?"

"আত্ম গঠন।"

"তার মানে?"

"ওই গীতায় যাকে বলে অভ্যাসযোগ, তাই। কিন্তু এখন ভাবনায় পড়েছি, সরোজবাবুর স্বভাব সংশোধনের জন্যে কি করা যায়? দান্নির সঙ্গে আর খানিক পরামর্শ করতে হবে।"

"বিয়ে-টিয়ে কববি না?"

"কেন করব না? তবে সরোজবাবুর মত দায়িত্ববোধহীন কুঁড়ের বাদশাকে নয়, সরকারমশাইয়ের মত অসৎ পথে উপার্জ্জন উৎসাহী অসাধু পুরুষকে নয়। আমি বিয়ে করব এমন সুস্থ সচ্চরিত্র লোককে, যাঁর মগজে ভাববার ক্ষমতা আছে, হৃদয়ে বোঝবার ক্ষমতা আছে, কব্জিতে খেটে খাবার ক্ষমতা আছে।"

বাহির হইতে দাদামণির বুড়া ভৃত্য নিতাই ডাক দিল, "দীপ্তি মা, এখানে আছেন?"

দীপ্তি বলিল, "হাঁ, কেন?"

"কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন।"

"সেখানে আর কে আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "সরকারমশাই।"

দীপ্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে বলিল, "জয় মঙ্গলময়। শুভস্য শীঘ্রং। আসি এখন বড়দি ; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সব বাধাবিঘ্ন জয় করে সত্যের পথে চলতে পারি। ছোট কায ছোট হোক, তবু সে ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য। তার খাতির রাখা চাই।"

তারপর একটু হাসিয়া বলিল, "কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা আইবুড়ো আর বিপত্নীক প্রেম-পিপাসুর প্রণয়ের দরখাস্ত শুনে শুনে উদভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে উঠার চেয়ে, এন্নি সব ছোটখাট কাযের ভিতর দিয়ে নিজের চরিত্র গঠনে মন দেওয়া ঢের ভাল, কি বলুন?"

বড়দি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ করি, ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি কথায় সরকারমশায়েব সুমতি উদ্বোধন কর। বিপদগ্রস্তার উপকার হোক। আর একটু আশীর্ব্বাদ, শ্রীভগবানে মতি থাক।"

দীপ্তি সেইখান হইতে ভূমে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম জানাইয়া শশব্যস্তে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বড়দি পূজার আসনে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। দীপ্তি আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "পায়ের ধুলো দিন বড়দি, আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষর অক্ষরে ফলেছে। সরকারমশায়ের সুমতি উদ্বোধন করা হয়েছে। আর একটা সুখবর, সদুপায়ে খেটে খাবার মত তাঁর একটা চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছি।"

বড়দি বলিলেন, "শুভ, শুভ, তাঁর ভ্রাতৃবধূদের ন্যায্য প্রাপ্য?"

দীপ্তি বলিল, "খুশী হয়ে মিটিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তাঁদের এখানে আনবার জন্যে লোক পাঠানো হল। আমাদের সামনেই সব মিটমাট হবে।"

বড়দি সানন্দে বলিলেন, "একেই ত বলে সুশিক্ষা। সৎকার্য্যে যত্নশীল, উৎসাহ-উদ্যম-তৎপর না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। ওরে তোরা বেঁচে থাক, ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

নক্সা

১

ডেপুটি দেবীপ্রসাদবাবু অত্যন্ত রাশভারি জবরদস্ত হাকিম। আইনে তাঁহার সূচ্যগ্র তীক্ষ বুদ্ধি, বিচারকার্য্যেও তিনি সুকঠোর ন্যায়পরায়ণ লোক। পার্থিব জগতে হাকিমী কার্য্যে নিয়োগ করিবেন বলিয়া যেন প্রকৃতি দেবী তাঁহার সুদীর্ঘ আকৃতিটি সযত্নে কালো বার্ণিশে মাজিয়া উপযুক্তরূপে ঝকঝকে চকচকে করিয়া দুনিয়ায় পয়দা করিয়াছিলেন। এক গেলাসের সুহৃদবর্গ বলিত তিনি অমায়িকচিত্ত খোলা প্রাণ মানুষ। প্রতিবেশী ও অধীনস্থ জনগণ বলিত, তাঁহার মুখের বাঁকা হাসিটুকু বড় ভয়ানক বস্তু!— মাথাটি খাইয়া, সর্ব্বনাশটি সাধিয়া, তবে সেই হাসির মনোরম চমৎকারিতা ডেপুটিবাবুর মুখে সুপরিস্ফুট হয়।

আদালতে ডেপুটিবাবুর অসীম প্রতাপ ; কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্কীর্ণ আয়তনে, সে প্রতাপের প্রভাবটা অত্যন্তই সঙ্কোচ-খর্ব্ব! কারণ গৃহলক্ষ্মী মহোদয়া 'তারে-বাড়া' জবরদস্ত মানুষ। ডেপুটিবাবু মুন্সেফের পুত্র, কিন্তু গৃহিণী উকীলের কন্যা ; সুতরাং বিবেচনাশক্তিতে যাহাই হউন, বলিবার শক্তিটা তাঁহার অসাধারণ! বাড়ীর কর্ত্তা হইতে চাকর-বাকর সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত।

শক্তি-সাধকের "কারণ" বা পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত "স্বাস্থ্যপান" ব্যাপারটিতে সপারিষদ ডেপুটিবাবুর প্রগাঢ় অনুরক্তি। কিন্তু এ অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী ফল—বীভৎস কাণ্ডকারখানার ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া, ডেপুটি-গৃহিণীর মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং

এ বিষয়ে তিনি নিদারুণ খড়্গহস্তা ছিলেন। কিন্তু আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহাই হউক—সুখের বিষয় যে ডেপুটিবাবুর কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা ছিল, সেইজন্য আত্মীয়-সমাজে কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইবার ভয়ে তিনি উকীল-কন্যাকে কিছু খাতির করিয়া চলিতেন। —অর্থাৎ নিরীহ ভালমানুষ সাজিয়া লুকাইয়া মদ খাইতেন, তারপর মাতলামিটা অবশ্য প্রকাশ্যে হইত এবং নেশা ছুটিয়া সুস্থ হইলে স্ত্রীর নিকট যেরূপ সসম্মান অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইতেন, তাহা অবর্ণনীয়!—মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে কখনও বা নিজের কাণ মুলিয়া শপথ করিয়া বসিতেন, এবং পরের শনিবারে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বর্গকে পোলাও-কালিয়ার নামে সাড়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন,—কলিকাতা হইতে ফরমাসী-পোষাক আনাইবার অছিলায়, প্যাক করা কাঠের বাক্সে প্রচুর পরিমাণে রাঙা জলের বোতল আনাইয়া মহোল্লাসে বন্ধুগণকে স্বাস্থ্যপান করাইতেন! শেষে অনেক রাত্রে নেশা জমিবার পর বন্ধুগণ যখন আহারে বসিয়া—বা শুইয়া, মদিরালস কণ্ঠে যথেচ্ছ আনন্দে হো-হা শব্দে চীৎকার করিয়া কালিয়ার আলু চটকাইয়া মাথায় মাখিত ও পোলাওয়ের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পরস্পরের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত—তখন অন্তরালে গৃহলক্ষ্মীর অন্তরটা অনাচারের ভয়ে অত্যন্তই অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিত! বন্ধুবর্গের নিরঙ্কুশ কৌতুক-আনন্দে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বন্ধুবৎসল মুন্সেফবাবু প্রীতিভোজের মাঝখান হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া, হঠাৎ এক সময় সামনের আঁস্তাকুড়ে "ড্যাং গড়াগড়ি" যাইতেন এবং সহানুভূতি-প্রবণ-চেতা সহৃদয় বন্ধুগণ, পরম ঔদার্য্যের নিদর্শন দেখাইয়া মিত্রোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া আবর্জ্জনাপূর্ণ আঁস্তাকুড়ের ক্লেদ-পঙ্কিল পিছল পথে পা পিছলাইয়া—ধড়াধ্বড় আছাড় খাইয়া, সুহৃদ্বরের সাযুজ্য, সালোক্য ও সারূপ্য লাভে ধন্য হইতেন! অন্তরালে ডেপুটি-গৃহিণীর বক্রকুটিল ললাট-রেখা তীব্র কঠিন হইয়া উঠিত, তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থাটা আজিও কোন মনোবিজ্ঞানবিদ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, সুতরাং আমরাও এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহসী নহি!

পরদিন, রবিবারের ছুটির আনন্দ আরামটা ডেপুটিবাবু পরিপূর্ণরূপে বিমল তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন। সোমবারে তাঁহার মেজাজের রুক্ষতায় আদালতে সেরেস্তাদার হইতে আর্দ্দালীরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া থাকিত, সেদিন এজলাসে উপস্থিত মামলাগুলির অবস্থা শোচনীয় হইত!

২

ইতিমধ্যে ডেপুটিবাবুর বিশ্বস্ত আর্দ্দালী কৃপারাম পাঁড়ে গিন্নির নিকট ধমক-চমক খাইয়া, প্যাক-করা পোষাকের বাক্সটার গুপ্ত রহস্য একদিন উদঘাটন করিয়া ফেলিয়াছে! সঙ্গে-সঙ্গে মদ্যগুলি সবই গৃহিণী ঠাকুরাণীর গহনার সিন্দুকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে! মদের অভাবে সে শনিবারের আমোদটা সাঙ্ঘাতিকরূপে "মাটী" হইয়া গেল! ডেপুটিবাবু চটিয়া খুন!—তাহার পরই হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলিয়া তিনি এক বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলেন! প্রত্যেক শনিবারে, ও পর্ব্বোপলক্ষে আদালত বন্ধ হইলে, বন্ধুবর্গকে লইয়া তিনি বাগান-বাড়ীতে হাজিরা দিতে লাগিলেন; বে-দরদে পয়সা উড়াইতে লাগিলেন। ডেপুটিবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছিল, সন্তানাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না;

কাজেই উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে, কে তাঁহার ক্লেশার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করিবে ভাবিয়া সদ্বিবেচক ডেপুটিবাবু অগত্যা নিজেই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উড়াইয়া, উপভোগ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

গৃহ-সংসারের কাযে বিষম বিশৃঙ্খলা বাধিল! ডেপুটি-গৃহিণী বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ডেপুটিবাবুর উচ্ছৃঙ্খলতা-বিকার সংশোধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩

সে শনিবারে আদালত হইতে ফিরিতে, ডেপুটিবাবুর একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া, জল খাইয়া, গোটাকতক সরকারী কাগজে তাড়াতাড়ি সহি করিয়া দিতেছিলেন। বাহিরে সহিস-কোচম্যান গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ডেপুটিবাবুকে লইয়া এখনই বাগান-বাড়ী যাইতে হইবে।

বাহিরের সদররাস্তার উপর হইতে, ইনচার্জ্জ ডেপুটি রাধাশ্যামবাবু ডাকিলেন, "দেবীবাবু, এখনো বাড়ীতে বসে কেন?"

অর্দ্ধ-সমাপ্ত সহিকরা কাগজ ফেলিয়া, ডেপুটিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এই যে যাই!"

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একগাছি ছোট রুল হাতে করিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুয়ার বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া, সশব্দে চাবিকুলুপ লাগাইয়া চক্ষের নিমিষে চাবিটা জানালা গলাইয়া বাহিরের বারাণ্ডায় ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন ঝি, যাও, চাবিটা মোনসোববাবুব স্ত্রীর কাছে রেখে এস, রাত্রি আটটার পর তিনি যখন বেড়াতে আসবেন, তখন এটা আনতে বোলো..."

'নতুন-ঝি' উক্ত মুন্সেফ-পত্নীর বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ, মুন্সেফ-পত্নীই তাহাকে এখানে চাকরী করিতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, দিন পনের মাত্র সে এখানে বাহাল হইয়াছে। ডেপুটিবাবু যে তাহার সামনে কোন-কিছু বলিতে পারিবেন না, তাহা গৃহিণী নিশ্চয় জানিতেন ; সুতরাং নিরুদ্বিগ্নভাবে উল-কার্পেট পাড়িয়া ডেপুটিবাবুর জন্য জুতা বুনিতে বসিলেন। ঝি গুমগুম শব্দে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ব্যাপার কি তাহা যে ডেপুটিবাবু খুব ভালরূপেই বুঝিয়াছেন তাহাতে গৃহিণীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, সুতরাং উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বোধে, নিশ্চিন্তমুখে নীরবে কার্পেটের ঘর বুনিতে লাগিলেন।

নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময় লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া, কাঁচের ফুলদানি গ্লাশকেশ, আয়না ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া টেবিলের জিনিসপত্র টান মারিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া, ডেপুটিবাবু বিপর্য্যয় উৎপাত বাধাইয়া তুলিলেন! গৃহিণী ঠাকুরাণী শান্ত-অবিচল-মুখে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

উপরের ঘরে ডেপুটিবাবুর চীৎকার, গর্জ্জন, বকাবকি শুনিয়া রাধাশ্যামবাবু গতিক ভাল নহে বুঝিয়া নিঃশব্দে রাস্তা হইতে চম্পট দিলেন। ডাকাডাকি করিয়া তাঁহার সাড়া

না পাওয়ায় ডেপুটিবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দাঁত কিড়মিড় করিয়া বিকট ভঙ্গিতে মুখ খিঁচাইয়া, প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চেয়ারের বেত ছিঁড়িয়া, লাথি মারিয়া পোষাকের আনলাটা উল্টাইয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন, "কার হুকুমে, মুন্সেফ-বাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি পাঠালে!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ডেপুটি-গৃহিণী শান্তস্বরে বলিলেন, "মাতলামি কোর না—"

ঘুসি পাকাইয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমার বড় বাড় হয়েছে, যা খুসি তাই করছ, জানো তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব, রক্তারক্তি করব, খুন করব!"—

কার্পেট ফেলিয়া কোলের উপর হইতে রুলটা তুলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, ডেপুটি-গৃহিণী ধীরভাবে বলিলেন, "যা পারো কর, কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি! আমি তোমার মাথাও ভাঙ্গব না, রক্তারক্তিও করব না, খুনও করব না, কিন্তু এই রুল ছুড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মারব যে, পনেরো দিন যেন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার! তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে খবর দেব, যে, আমার স্বামী মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছিল বলে, আমি নিজেই তার পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী করে রেখেছি, এতে আদালতের কার্য্যক্ষতির জন্য মাতাল ডেপুটির যা দণ্ড হওয়া উচিত হোক,—আর আমারও..."

হতবুদ্ধি ডেপুটিবাবু অবসন্ন দেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ডেপুটি-গৃহিণী পুনশ্চ কার্পেট সেলায়ে মনোযাগী হইলেন। সেদিন বাগান-বাড়ীতে বন্ধুগণ আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন!

৪

পরের শনিবারে ডেপুটিবাবু আদালত হইতে বাহির হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া সরাসর বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন, "আজ রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিবেন না, সে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাউক।"

সহিস কোচম্যান বাড়ী ফিরিয়া বিন্দুদাসীর মারফত অন্তঃপুরে সুসংবাদ পাঠাইয়া দিল।

এদিকে ডেপুটি-গৃহিণীও বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলেন, যে, ডেপুটিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণের সকলেই আজ রাত্রে গরহাজির থাকিবেন। কারণ ডেপুটিবাবুর বাগান-বাড়ীতে আজ নাকি মহা মহোৎসব হইবে। সহরের সুপ্রসিদ্ধা চারিজন নর্ত্তকী আজ সেখানে মজুরা করিতে যাইবে। আজ সারারাত্রি সেখানে নাচ গান ও পানের স্রোত চলিবে।

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। তারপর বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যান গাড়ী লইয়া পুনশ্চ বাগান-বাড়ী গিয়া সত্বর বাবুকে লইয়া আসুক, কারণ তাঁহার পেটে কলিক ব্যথা ধরিয়াছে, অতএব বাবুর এখনই আসা চাই..."

ঘণ্টা তিন পরে কোচম্যান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আসিতে পারিবেন না, কারণ সহরের বড় বড় লোক সবাই আজ সেখানে সমবেত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের একা(?) ফেলিয়া চলিয়া আসাটা অত্যন্ত অভদ্রতা হয়, সেজন্য বাবু বলিয়া

দিলেন যে পরিচিত ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়কে ডাকিয়া রোগ-প্রতিকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাইতে...ইত্যাদি।"

যোগ্য কর্ত্তব্যটা গৃহিণী পূর্ব্বাহ্নেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন ; বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যানকে ঘোড়া খুলতে বারণ কর, আমি ঐ গাড়ীতে এখনি বাগানে যাব!"

নতুন ঝি নিজের গালে চড় মারিয়া বলিল, "ওমা, কি ঘেন্নার কথা..."

গৃহিণী এক ধমকে তাহাকে থ করিয়া দিলেন। মাথায় বাঘাথাবা বসাইলে কে ভিজা-বিড়াল সাজিয়া তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবে? স্বামী যখন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান হারাইয়া ইতর আমোদে মত্ত হইয়াছেন, তখন স্ত্রী কাহার সম্মানের ভয়ে শঙ্কিত থাকিবে? মাতালের স্ত্রীকে মাতাল স্বামীর উপযুক্তই দজ্জাল হইতে হইবে, নচেৎ তাহার সহধর্ম্মিত্ব বজায় থাকিবে কি করিয়া? এবং সংসার-ধর্ম্মই বা একাত্মা না হইলে টিকিবে কিরূপে?

এ সকল যুক্তির উপর তর্ক চালাইবার ক্ষমতা ঝিয়ের ছিল না, সে শঙ্কিতভাবে নীরবই রহিল।

বুড়া দ্বারবানটা গৃহিণীর বাপের বাড়ীর পুরান আমলের বিশ্বাসী লোক। গৃহিণীর হুকুম শুনিয়া সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "হায়রে বাপ, দিদিমণি এ কা বোলে হো! জামাইবাবু আজ হাম্‌কো মার ডালেগা!..."

নতুন-ঝিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া গৃহিণী বলিলেন, "দরওয়ানজি এস, গাড়ীর পিছনে ওঠো—"

দ্বারবান হাত জোড় করিয়া অনুনয় কাতরকণ্ঠে ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। গৃহিণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি থাম, লাঠি বাগিয়ে গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাক,—আমার হুকুম—"

দ্বারবান সভয়ে বলিল, "মগর্ জামাই-বাবুকো হাম মু' দেখানে নেই সেকেঙ্গে—"

গৃহিণী বলিলেন, "না পার নেই-নেই, বাগানে ঢুকে গাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেক—"

গাড়ী আসিয়া বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকিল! কোচম্যান দাসীর আদেশমত বাগানের দ্বারবানকে কর্ত্তার কাছে পাঠাইল। কর্ত্তা শুনিলেন, "বাড়ীর গৃহিণীর অসুখ দেখিয়া ডাক্তারবাবু এখানে আসিয়াছেন—বিশেষ জরুরি কোন কথা বলিয়া যাইতে চাহেন।"

সেই সবে-মাত্র গান ও পান সুরু হইতেছে, কর্ত্তা স-টাট্‌কা ছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া "গুড্ ইভনিং ডক্টর" বলিয়া হাত বাড়াইয়া, সহসা ভিতরে দৃষ্টি পড়িতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "এ কি?—"

গৃহিণী তাঁহার হাতটা শক্তজোরে চাপিয়া ধরিলেন, অবশ্য আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ শুভরাত্রি ঘোষণার করমর্দ্দনের জন্য নহে, গাড়ীতে টানিয়া তুলিবার জন্যই!—কর্ত্তা হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে ভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "কি সাহস! কি সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস! ওঃ, অবাক্ করলে!..."

গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গাড়ীতে ওঠো, বাড়ী যেতে হবে।"

কর্ত্তা আকুল হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বাগানে উকীল মোনসোব ডেপুটিরা

সবাই এসেছেন—এ কি কেলেঙ্কারী করতে এলে, আমার জ্যান্ত মুখটা পুড়িয়ে দেবে?"

গৃহিণী ততোধিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আগুন-জ্বেলেছ, বাতাস দিয়েছ, নিজে মুখ বাড়িয়েছ, না হলে আমার ক্ষমতায় কি এত কুলোয়? এখন ভাল চাও ত বাড়ী চল—"

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "ভদ্রলোকরা সবাই রয়েছেন, কি বলব ওঁদের কাছে? দোহাই তোমার, বাড়ী ফিরে যাও—"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "মাত্‌লামি করবার লোভে যাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তারা ত খুব ভদ্দর!— তুমি মানের কান্না রাখ,—ওঠো বলছি গাড়ীতে—"

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া মরিয়া-ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "আমি যেতে পারব না—"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যেতে পারবে না? বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ কর কি? কর কি? পাগল হলে না কি?—"

গৃহিণী বলিলেন "মাতালের স্ত্রীর পক্ষে পাগল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক!—"

গাড়ীর ও-পাশের দ্বার খুলিয়া গৃহিণী ডাকিলেন, "দরওয়ানজি—"

সামনে আসিয়া, লাঠি ঘাড়ে দ্বারবান মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর—"

গৃহিণী তর্জ্জনী উঁচাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁসিয়ার হয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চোলো, মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকে, —হুকুম দিয়ে রাখ্‌ছি, যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি চা্‌লিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সাম্‌লাবে তোমার ডেপুটি মনিব! বলে রাখছি, লাটসাহেবের নাতিই হোক্‌, নাৎজামাই-ই হোক, কারুর খাতির কোরো না—চলো ঐ নাচের মজ্‌লিশে—!"

সভয়ে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমার ঝকমারি হয়েছে,— পাঁচ মিনিট সময় দাও, ওঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে আসি—"

একটু ভাবিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা যাও, দশ মিনিটের মধ্যে না ফেরো ত আমিও ঝিকে আর দরওয়ানকে নিয়ে বরাবর তোমাদের মজলিশে গিয়ে হাজির হব, মনে রেখো—"

ত্রাহি মধুসূদন জপিতে জপিতে ডেপুটিবাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, তারপর পাঁচ মিনিট পার হইতে না-হইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনশ্চ আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল।

পরদিনই ভাড়া চুকাইয়া ডেপুটিবাবু বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধুবিচ্ছেদের বিপুল বেদনা সহিয়া সুরা-সেবা পরিত্যাগ করিলেন। জীবনে আর তাহা স্পর্শ করেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, গৃহিণীর সুশাসন-মাহাত্ম্যে আজকাল ডেপুটিবাবুর গৃহে শান্তিদেবী স্থির-প্রতিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কোন রোগ?

সাধারণ অবিবেচক মানুষ মাত্রেরই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে। তাহারা যার কাছে এতটুকু উপকার পায়, তার কাছেই এতখানি বেশী উপকার পাইবার দাবী করিয়া বসে। এ জুলুম যে তাহাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নয়, নিজেদের অসমর্থতার গ্লানি মোচনের উদ্যম ও সাধনাই যে তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, এ কথা আলস্য-বিলাসী, পরনির্ভর-শীলতা-প্রিয় মানুষরা বুঝিতে চায় না। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বৃথা আত্মাভিমানবশে তাঁহারা যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করে, তাহাই চরম সত্য। অর্থাৎ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষা পাওয়াই তাহাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত, ভিক্ষাদাতার অসামর্থ্য অনিচ্ছা, বিরক্তি বা বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের কাছে বিস্ময় ক্ষোভ ও নিরাকার অদৃষ্টদোষ মাত্র।

দেশের পুলিশের সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মনোভাব যে অনেকটা এইরকম হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা লইয়া সেদিন আলোচনা চলিতেছিল।

সিংহবাবুদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে একটা শুভ-বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি আত্মীয়-কুটুম্ব সমবেত হইয়াছিলেন। গতকল্য বিবাহ চুকিয়াছে, আগামী কল্য পাকস্পর্শ। পাকস্পর্শের আয়োজন বিরাট ; সন্ধ্যার পর বর্ষিয়সী মহিলারা একতলার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া পরদিনের জন্য তরকারী কুটিতেছিলেন। কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালক ও যুবক আত্মীয়, ছাদের অন্যপ্রান্তে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন। সদর বাটীতে কর্ত্তাব্যক্তিদের সভা বসিয়াছে। তে-তলার ছাদে নববধূকে লইয়া অল্পবয়স্কারা আনন্দ করিতেছেন, সুতরাং এই দলটি আর কোথাও মনোমত আশ্রয় না পাইয়া এইখানে আসিয়া জুটিয়াছে।

গ্রীষ্মকাল, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মিটমিট করিয়া তারাগুলি জ্বলিতেছিল। একটা গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া ছাদের মাঝখানে রাখিয়া তার চারিদিকে ঘেরিয়া পাঁচ সাতখানা বঁটি পাতিয়া বসিয়া, মেয়েরা কুটনা কুটিতে কুটিতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন।

ছেলেরা দূরে বসিয়া রাজনীতি ও দেশবিদেশের নানা কথা আলোচনা করিতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে এদেশী ও বিদেশী পুলিশের কার্য্যপদ্ধতির ধারা সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ হইল।

ভারত সম্রাটের খাস রাজধানী লণ্ডন সহরে সামান্য কনেষ্টবলী বিদ্যায় সুশিক্ষাদানের জন্য কি সুন্দব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে—কি চমৎকার প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া তাহাদের নির্ভীক, সত্যসন্ধ, সূক্ষ্ম-ন্যায়পরায়ণ, এমন কি আইনজ্ঞ ও সদ্যঃ-আহতের চিকিৎসা ব্যাপারেও অভিজ্ঞ করিয়া তোলা হয়—তাহাদের সভ্যতা ভব্যতা কতদূর মার্জ্জিত রুচি সঙ্গত ও উন্নত করা হয়, একটি নবীন উকীল তাহারই বর্ণনা করিতেছিলেন।

সে দেশের কনেষ্টবলদের চরিত্র গঠনের জন্য এবং মনুষ্যোচিত কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জনের জন্য সে দেশে কত যত্ন লওয়া হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিতে শুনিতে বালক বিহারীলাল ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আর আমাদের দেশের পুলিশের কর্ত্তারা? এঁরা শুধু তিনটি গুণ দেখে—যত রাজ্যের গুণ্ডাকে পুলিশের কনেষ্টবলীতে ঢোকান। একটি গুণ, সে মনুষ্যত্বহীন, 'পাহাড়ে' বজ্জাত কি না? দ্বিতীয় গুণটি সে সাফাই

হাতে ঘুস নিয়ে, উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাতে জানেন কি না? তিন দফার গুণ, সে বিনা প্রমাণে সন্দেহমাত্রেই নিরপরাধ ভদ্রলোকের ছেলের গলায় হাত দিতে পারে কিনা! এই তিনটি গুণ থাকলেই ব্যস কেল্লা মার দিয়া!"

বিহারীর বয়স বছর চৌদ্দ, সে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাহারা কলিকাতায় থাকে। কলিকাতার প্রহরীদের সে নাকি ভালরকমই চেনে।

বিহারী যখন কথা বলিতেছিল, তখন ডাক্তারী বিদ্যালয়ের ছাত্র মোহনলাল তার চশমাজোড়ার ভিতর হইতে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, বিহারীর করুণ ভাবোদ্দীপক মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। বিহারীর নিগূঢ় মর্ম্মব্যথার কারণটা মোহনের জানা ছিল। হঠাৎ সে সরিয়া আসিয়া বাঁ হাতে বিহারীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কর্কশ সুরে খোট্টাই টানে বলিল, "এই খোঁখা—ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল' কিনিয়েসিস?"

বিহারীকে কে যেন জলবিছুটি মারিল! মুহূর্ত্তে ভীষণ বিক্রমে ছটফট করিয়া, মোহনের বাহু-বন্ধন হইতে নিজের কণ্ঠ মুক্ত করিয়া সক্ষোভে বলিল, "আঃ, ছাড় মোহনদা, কি ফক্কুড়ি করো? যাও!"

মোহন মজলিসে সমাগত সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা ওকে জিজ্ঞাসা করুন—'ক্যা টাকা দিয়ে সাল কিনিয়েসিস' কথাটার মানে কি?"

বিহারী সক্রোধে বলিল, "হ্যাঁঃ! জিগেস কববেন! করুন না, আমি চললুম!"

সে সলম্ফে স্থানত্যাগে উদ্যত হইল। সকলে তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মনঃক্ষোভ দূর করিবার সময়োচিত সান্ত্বনা দিয়া সকলে মোহনের অন্যায় স্বীকার করিলেন। ছোটদেব ক্ষেপাইয়া মজা দেখা, মোহনের একটা পুরাতন ব্যাধি বলিয়া, এক বর্ষিয়সী আত্মীয়া তিরস্কারও করিলেন। মোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু পুলিস কনেষ্টবলদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার কথা স্বীকার করতে ওর লজ্জাই বা কেন? ওঃ বেচারীর সেই শীতের রাত্রের—সেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত খুনী আসামীর মত মুখের ভাবটা—আমার আজও মনে পড়ে! মোষ্ট প্যাথেটিক সিন!"

বিহারীর ক্ষোভের উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে একজন বলিলেন, "ব্যাপারটা কি হয়েছিল হ্যাঁ মোহন?"

মোহন বলিল, "গেল বছর শীতকালের কথা। বোধ হয় ডিসেম্বর মাস হবে। ওর স্কুলের এগজামিনের তাড়া পড়েছে, অনেক রাত অবধি জেগে রোজ পড়াশুনো করছে। একদিন রাত সাড়ে দশটার সময় পড়তে পড়তে হঠাৎ ওর কি একটা পাঠ্য পুস্তকের দরকার হয়। বইখানা ওর এক প্রতিবেশী ক্লাসফ্রেণ্ড চেয়ে নিয়ে গেছল, বিকেলে ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল বুঝি—কিন্তু দেয়নি।

—"বন্ধুর বাড়ী ওদের বাসার খান পাঁচ ছয় বাড়ীর পর, একটা গলির মধ্যে। এগজামিনের পড়াটা তখুনি ঠিক করে রাখবে, মনস্থ করে বিহারী সেই রাত্রেই বইখানা আনতে বন্ধুর বাড়ী গেল।

—"তাড়াতাড়ির জন্যে ভুলেই যাক, কিম্বা কাছেই বন্ধুর বাড়ী ভেবে হোক, ও বেচারী জুতো না পরে—খালি পায়েই গেছল। গায়ে কোট খুলে রেখেছিল, শুধু গেঞ্জীর ওপরে সবুজ রংয়ের একটা র‍্যাপার ছিল।

—"বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখলে, বৈঠকখানার দুয়ার বন্ধ। জানালা খোলা ছিল, ভিতরে আলো জ্বলছিল। যদি ঘরে কেউ থাকে, তার কাছে বইখানা চাইবে—ভেবে, ও বেচারী বৈঠকখানার বারাণ্ডায় উঠে, জানালা দিয়ে উঁকি দিলে। দেখলে, ঘরে কেউ নেই। ও ভাবলে বন্ধুটি বোধ হয় তার অভিভাবকদের সঙ্গে আহারের জন্যে অন্তঃপুরে গেছে। অতএব এ সময় তাঁদের ডাকাডাকি করে, বইয়ের জন্যে বিরক্ত করাটা ভদ্রতা নয়। ফিরে যাওয়াই ভাল।

"নিঃশব্দে ফিরল। গলির মোড়ে এসে দেখে একজন খোট্টা কনেষ্টবল ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে এক মনে এক ধ্যানে খৈনি মর্দ্দনে নিবিষ্ট। সে এতক্ষণ ওর ওপর গোয়েন্দার দৃষ্টি পেতেছিল, কার সাধ্য তা বিশ্বাস করে! বিহারী কাছাকাছি হতেই কনেষ্টবলটা হঠাৎ এগিয়ে এসে বিনা দ্বিধায় হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল!"

বিহারী চমকে উঠল! মেজাজ কেমন তিরিক্ষে দেখছেনই ত। বিরক্তির মাথায় দাঁত. খিঁচিয়ে, একটা অনাবশ্যক দীর্ঘ ঈকার যোগ দিয়ে প্রশ্ন করলে, "কী?"

কনেষ্টবল পরম গম্ভীর চালে, ওর র‍্যাপারটা দেখিয়ে মুরুব্বিয়ানা সুরে বললে, "এই খোঁকা—এ সাল কোথা পেলি?"

হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে এবং এই অপমানসূচক প্রশ্নে অত্যন্ত চটে-মটে, ও ফস করে জবাব দিলে, "কেন? আমি কিনেছি!"

অভিভাবকদের বাদ দিয়ে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে নাবালকের নিজের কর্ত্তৃত্ব জাহির করাটা কনেষ্টবলী আইনে বোধহয়, ওর বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গেল। কনেষ্টবলটি ব্যঙ্গ সুরে বললে, "ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল' কিনিয়েসিস?"

মূল্যের অঙ্কটা ওর জানা ছিল না, এবং তখন বোধ হয় ওর চেতনা হোল যে ক্রয় ব্যাপারের ও যখন বিন্দু বিসর্গও জানে না, তখন সে দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে টেনে নেওয়া সুবুদ্ধি হয়নি! ওর নিজের কথাটা ওব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বুঝে—বিহারীর মাথা বিগড়ে গেল—

বিহারী সজোর প্রতিবাদ করিল, "মাথা বিগড়ে গেল? কক্ষণো নয়! আমি এমন 'ভয়. তরাসে' নয়?"

মোহন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহলে বোধ হয় সাহসের দাপটেই, মহামহিমার্ণব শ্রীমান বিহারীলাল কিঞ্চিৎ আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।"

বিহারী অধিকতর জোরে বলিল, "আত্মহারা কিছুতেই নয়। আমি—"

মোহন বলিল, "I beg your pardon! তা হলে—আত্মবিস্মৃত! যেহেতু পাহারাওলাটা যখন পুনশ্চ রসিকতা করে বললে, সাল কিনিয়েসিস, না 'চোরি' করিয়েসিস? ওই বাড়িমে কি 'চোরি' করতে গিয়েছিলি? তখন স্তম্ভিত বীরপুরুষ নিজের চৌর্য্যবিদ্যার অপটুত্বের প্রমাণ স্বরূপ ক্ষীণকণ্ঠে শুধু জবাব দিলেন, 'আমি চোর নয়। আমি বাবুদের বাড়ীর ছেলে'।"

বিহারী ক্ষোভ-কাতর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু হতভাগা মেড়ো কি তা বিশ্বাস করে?"

নবীন উকীল বলিলেন, "ততটা আশা করা উচিত নয়। কারণ তারা পুলিশের

নিম্নশ্রেণীর প্রহরী মাত্র। লোকের মুখ দেখে চরিত্র অনুমান করা তাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু তুমি যে সত্যিই 'বাবুদের বাড়ীর ছেলে' সেটা প্রমাণ করবার জন্যে তোমার বন্ধুর বাড়ীর ভদ্রলোকদের ডাকলে না কেন?"

অধৈর্য্য হইয়া বিহারী বলিল, "ডাকব কি? তাঁরাও পাহারাওলার কথা শুনে যদি আমায় সন্দেহ করতেন? তা হ'লে?"

সকলে হাসিলেন। মোহন কপট সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তা হ'লেই ত বেচারাকে সদ্য জেলে যেতে হোত! বিহারী আত্মবিস্মৃত নয়, আত্মজ্ঞানী পুরুষ!"

নবীন উকীল বলিলেন, "তারপর?"

মোহন বলিল, "তারপর বুদ্ধিমান বিহারী ও ততোধিক বুদ্ধিমান খোট্টাবাবাজীর মধ্যে আইনজ্ঞানের গবেষণা সুরু হোল। আইনের সূক্ষ্ম জটিল রহস্য ভেদে দু'জনেরই কাণ্ডজ্ঞান সমান; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটার কি যে নিষ্পত্তি হোল, কেউ বুঝলে না। পাহারাওলাটি বোধ হয় ভেবে চিন্তে দেখলে, সে সরকারের নিমকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথোচিত মাত্রায় দুর্ব্বৃত্ত দমন করেছে, রাজ্যে আর চোর ডাকাতের ভয় নেই—সুতরাং ভদ্রদস্তুর প্রথায় কোনরকম সম্ভাষণ না করেই সে গম্ভীরভাবে প্রস্থান করলে। কিন্তু পাহারাওলার স্নেহালিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ করে যখন ঘরের ছেলেটি ঘরে ফিরলেন, তখন অবস্থা শোচনীয়! ঠিক যেন ছ' মাসের ম্যালেরিয়া জীর্ণ কাহিল রোগী!"

বিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দ্যাখো মোহনদা, বাড়াবাড়ি ক'র না বলছি।"

মোহন বিনয়-নম্র-কণ্ঠে বলিল, "সে ইচ্ছা থাকলে বলতাম ধনুষ্টঙ্কারের রোগী! তা কি বলেছি? বরঞ্চ এখন—", বলিয়া বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, সে সস্মিতমুখে বিহারীর দিকে অর্থসূচক কটাক্ষে চাহিল!

বিহারী নবোদ্যমে পুনশ্চ হাত পা ছুঁড়িয়া কি একটা তুমুলকাণ্ড বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। মোহনের বচন গরিমায় ও নয়ন ভঙ্গিমায় দমিয়া গেল! নিরুদ্ধ ক্রোধে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া—ঘাড় গুঁজিয়া রহিল!

নবীন উকীল একটু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারের চোখ—শকুনির চোখই বটে! কিছুই এড়াবার যো নেই!"

আর একজন বলিলেন, "ডায়োগ্নোসিসের জন্য ধন্যবাদ!"

অপর একজন বলিলেন, "রোগ বিকার, সুতরাং নিরাময় প্রয়োজন!"

বিহারী অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া নবীন উকীল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "Forget and forgive, কিন্তু পাহারাওলা মশাই ছোট ছেলের সঙ্গে ওরকম রসিকতা করলে কেন?"

তাঁহাদের অদূরে—ছাদের শেষ প্রান্তে কতকগুলা দেবদারু কাঠের খালি প্যাকিং বাক্স জমা হইয়াছিল। তার অন্তরাল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ন-মাসিমা। সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ওটা বোধ হয় ওদের স্বধর্ম্ম। ওদের প্রভুভক্তি যথেষ্ট। কিন্তু যখন কাজ পায় না, তখন নিষ্কর্ম্মা অবস্থায়, কতকগুলো অকর্ম্ম যোগাড় করে ভুলক্রমে বাধিয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে ওরা ব্যস্ত হয়। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদের স্বভাব দেখেছি—দেশী ঝি-চাকররা কাজে ফাঁকি দিয়ে গল্প করতে আর ঘুমুতে মজবুত; কিন্তু অধিকাংশ বেহারী

ঝি-চাকর-দরোয়ানরা সে পাত্রই নয়! কাজে তারা 'আলে' না। কিন্তু কাজ না পেলেই অকাজে দস্যিবৃত্তি করে বেড়াবে। তা সে খামকা কাউকে সেলাম বাজানই হোক, বা খামকা কারুর মাথা ফাটানই হোক—একটা কিছু ওদের চাই-ই!"

ন-মাসিমা এত নিকটে ছিলেন! খোশগল্পকারীরা সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা কারণে ন-মাসিমার ব্যক্তিত্ব মহিমা সকলেই একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন।

ন-মাসিমা আবাল্য-বিধবা। ধর্ম্মচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা এবং কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন। এখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে সমীহ করে। যেহেতু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাকি রীতিমত প্রখর।

মোহন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আ রে! আপনি এখানে আহ্নিক করতে বসেছিলেন! আমরা ত জানতুম না—"

আহ্নিকের আসনটা ঝাড়িয়া তুলিয়া গঙ্গাজলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "ভেবেছিলাম তোমাদের জানতে দেব না, নিঃশব্দে সরে পড়ব। কিন্তু বিহারী বেচারীর ওপর তোমরা বড় অত্যাচার করেছ—"

বিহারী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "বলুন ত আপনি! এঁরা যেন আমায় কি পেয়েছে!"

ন-মাসিমা বলিলেন, "তাই দেখছি বাবা! ছেলেদের সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে!"

মুহূর্ত্তে সকলে সমস্বরে বলিল, "আসুন—আসুন! বসুন এইখানে।" তিনি বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা, এগুলো আগে পূজার ঘরে রেখে আসি।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে খান-দুই বারকোশ এবং গামলায় ভিজানো কতকগুলা কিসমিস বাদাম পেস্তা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে দুইটী বালিকা। তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কিস্‌মিস প্রভৃতি বাছিবে। আগামীকল্য যজ্ঞ। পোলাওয়ের উপকরণ আজই গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

ছেলেরা ততক্ষণে খান-চার কুশাসন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি! ঝগড়া করতে এসেছি, কথকতা করব না কি?"

মোহন সবিনয়ে বলিল, "আপনার ঝগড়া মানেই কর্ণমর্দ্দন কাহিনী! কান ত বাড়িয়েই রেখেছি মাসিমা—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "তা হ'লে নিরুত্তর হওয়াই ভাল।"

বিহারী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "তা হ'লে মোহনদা আমায় ফের জ্বালাবে ন-মাসিমা। আপনি ওকে একটু বকুন।"

মোহন বলিল, "আমিও ত তাই বলছি। হয় আমি পাহারাওলার গল্প বলি, বিহারী ধনুষ্টঙ্কার প্র্যাকটিস করুক—নয় ন-মাসিমা—"

বিহারীর পুনশ্চ ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম দেখিয়া ন-মাসিমা বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলছি। কিন্তু এটা ধনুষ্টঙ্কার কি জলাতঙ্ক—তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রোগকে কি বলে,

তোমরাই বিচার করো বাছা। বিহারী ত ছেলেমানুষ, ক'লকাতার পথে বেরিয়ে পাহারাওলার বজ্রমুষ্টির ফাঁদে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে পল্লীগ্রামে ঘরের কোণে বসে, একটা নিরেট মূর্খ অদ্ভুত স্ত্রীলোকের কবলে পড়ে যদি আমাকেও ত্যক্ত হ'তে হয়, তা হ'লে তোমরা কি বলবে?"

মুহূর্ত্তে সকলে স্তব্ধ! ক্ষণ পরে মোহন বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আপনাকে? বলেন কি মাসিমা?"

মাসিমা বলিলেন, "যথার্থই বলছি। বেশীদিন নয়। গত শ্রাবণ মাসের কথা। আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঝুলন বসেছে। অতিথিশালায় বিস্তর লোক আসা-যাওয়া করছে, গ্রাম সরগরম! ঠিক সেই সময় আমাদের হুজুগে ঝি মোহিনীঠাকরুণ একদিন বৈকালে এসে খবর দিল—'অ-দিদিমণি, একজন ভৈরবী এসেছেন। তাঁর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে হরিদ্বারে গিয়ে বাস করছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সকলের কাছে ভিক্ষা করে রেলভাড়া যোগাড় করছেন। আপনার কাছেও কাল আসবেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন। সৎ কাজ—দান করলে নিজেরই পুণ্যি'...ইত্যাদি।"

দানের ক্ষেত্রে আমরা পাত্রাপাত্র বিচার করাটা অপরাধ বলেই মনে করি, সে তর্ক তুলিও না। কিন্তু পরিচয় শুনে মনে একটু কৌতূহল জাগল। স্ত্রী ভৈরবী, স্বামী সন্ন্যাসী, হরিদ্বাব-বাসী। ভৈরবী ঠাকরুণ স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করেছেন—এটা নিশ্চয়ই পুণ্যকার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামী যদি হরিদ্বারে বাস করেন, তবে ভৈরবী পত্নী বাস করেন কোথা? প্রশ্নটা অতর্কিতে বাচনিক উচ্চারণ করলুম। মোহিনী জবাব দিলে—'ইনি কাশীতে থাকেন। কাশী থেকে এখানে এসেছেন, ভিক্ষে-শিক্ষে করে রেলভাড়া জোগাড় করবেন'।

মনে কেমন খটকা লাগল। হরিদ্বার যাত্রাই যাঁর উদ্দেশ্য তিনি কাশী থেকে চারশো মাইল পিছু হেঁটে এখানে আসবেন কেন? মনে হোল, মোহিনী ঠিক জানে না, আন্দাজেই সবজান্তা বিদ্যা জাহির করছে।

যাক। কথাটা সেদিনের মত সেইখানেই চাপা পড়ল। আমিও নিজের কাজকর্ম্মের তাড়ায় ভৈরবীর কথা ভুলে গেলুম।

তারপর—দিন পাঁচ-ছয় শরীর অসুস্থ হওয়ায় তেতলার ঘরটায় পড়ে রইলাম। বাইরে কোথা কি হচ্ছে তার খবর পেলুম না। সুস্থ হয়ে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নীচে গেছি, শুনলাম ওদিকের দালানে ঝিয়েদের আড্ডায় পাড়ার মেয়েরা জড় হয়ে মহা সোর-গোল জুড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি?'

ক্ষান্ত ঠাকরুণ, শ্যামার মা, সবাই ভক্তি গদগদকণ্ঠে বললেন, "সেই ভৈরবীঠাকরুণ তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ক'দিন ধরে আনাগোনা করছেন, তাঁদের নানারকম 'ভাল ভাল আশ্চর্য্য' কথা শোনাচ্ছেন। সে সব অদ্ভুত কথা তাঁরা জন্মাবধি কখন শোনেনি। ভৈরবীঠাকরুণটি সে পাত্রী নন। তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী। নিজের জীবনের যে অলৌকিক ধর্ম্মরহস্যময় ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন, তা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁকে সবাই যথেষ্ট পয়সাকড়ি দিয়েছেন।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভাল ভাল কথাগুলা কি?"

কেউ তাঁরা সদুত্তর দিতে পারলেন না। শ্যামার মা প্রশ্ন শুনে রাগ করে বল্‌লেন, 'এ কি ডালভাত রান্নার কথা যে এক নিশ্বাসে গড়গড়িয়ে বলে দেব? আমরা শুন্‌তে হয় শুনে গেছি। অত ভাল কথার মানে কি ছাই বুঝতে পারি, যে আপনাকে বল্‌ব?'

মনে একটু অনুতাপ হোল। আহা, এমন সাধুসঙ্গ আমার বরাতে জুটল না! এত ভাল কথার একটাও আমি শুনতে পেলাম না। একেই বলে দুর্ভাগ্য!

কিন্তু সৌভাগ্যের সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াবার সখ থাকলেও সময় আমার নেই। কাজেই নিজের কাজে ডুব দিলাম। ভৈরবীর কথা আবার ভুলে গেলাম।

অসুস্থতার জন্যে ক'দিন দেবালয়ে যেতে পারিনি। সেদিন দুর্ম্মতি হ'ল, আরতি দর্শনের জন্যে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরবাড়ী গেলাম। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও চললেন।

ঝুলন উৎসব, ঠাকুরবাড়ীতে সেদিন ভীষণ ভীড়। একপাশে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছি, শ্যামার মা আমার হাতে চাপ দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন, 'ন-মাসিমা, ওই দেখুন। ওই সেই ভৈরবী মা।'

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটার ঠিক সামনেই অর্থাৎ নাট-মন্দিরের মাঝখানে এক লম্বা চেহারার প্রৌঢ়া মেয়েমানুষ, মাথার কাপড় খুলে, এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরণে সাধারণ লাল পাড় শাদা সাড়ী, গলায় একছড়া কাঁচের মালা। হাতে দু'গাছি শাঁখা। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মন্দ নয়। কিন্তু সে যাই হোক—সেখানে আর যাই থাক, যথার্থ ভজনানন্দী সাধুর মুখের দীপ্ত লাবণ্য-শ্রী কই?

আমার মন দমে গেল!

তার চোখের দিক চেয়ে আরও আশ্চর্য্য হলাম। দেখলাম, তিনি আরতি দর্শন করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে, পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে—তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছেন। সে অন্বেষণ গভীর মনোযোগপূর্ণ!

দৃশ্যটা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। ভক্তি করবার ভরসাটা অনেক কমে গেল। চোখ আর মন দুটোকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগলাম। তিনি যে কি করলেন, না করলেন, আর দেখতে প্রবৃত্তি হোল না।

আরতি শেষ হবামাত্র প্রণাম করে দেবালয় থেকে সরে পড়লাম। পাছে তাঁর গুণমুগ্ধাদের উৎপীড়নে সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়—সে ভয়টা ছিল।

পরদিন সকালে বিন্দি-ঝি জানালে, কাল সারারাত্রি তাদের সঙ্গে জেগে বসে ভৈরবী মা ঠাকুরবাড়ীতে যাত্রা শুনেছেন!

শুনে ভাবনা হোল ; হরিদ্বার যাবার রেলভাড়া সংগ্রহ করা কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? সে উদ্দেশ্য যদি থাকত, তা'হলে কাশী থেকে রেলভাড়া করে, এই বর্ষার দিনে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত জেগে যাত্রার রং-তামাসা দেখার সাহস অন্ততঃ আমার ত থাকত না, এটা নিশ্চয়। বিশেষতঃ নাটমন্দিরে পুরুষদের ভীড়ের সামনে সেই যে বিসদৃশ ভঙ্গীর দাঁড়ানো, আর সেই যে অনুসন্ধান উৎসুক-দৃষ্টি, সেটা কিছুতেই ভুল্‌তে পারছিলাম না। বিন্দির সংবাদে মন আরও মুসড়ে গেল।

কিন্তু অনধিকার চর্চ্চাটা ভাল নয়। সুতরাং প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বললাম না।

পরদিন বৈকালে কাপড় কাচতে যাব বলে নীচে নামছি, এমন সময় বিন্দি এসে জানালে, "ভৈরবী-মা আপনারা কাছে ভিক্ষা করবার জন্য আসছেন।"

ভিক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। তাঁকে আসতে বললাম। যদিও আমার সময় অল্প, তবুও তাঁর সত্য পরিচয়টা জানবার জন্য ইচ্ছা হোল। ঘরে এনে বসালাম, একটা প্রণামও করলাম। দেখলাম প্রণাম গ্রহণের সময তিনি অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা নিজের পূর্ব্ব-জীবনের পরিচয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় অনিচ্ছুক। কিন্তু এঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব জীবনের বিস্তারিত পরিচয় বিবৃত করতে লাগলেন। সে বিবৃতি এত বেশী, যে সময়ের অভাব স্মরণ করে, আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠ ন্যায়পরাযণ পুলিশ ইনস্পেক্টর স্বামী নাকি পূর্ব্ববঙ্গে কোন জেলায় থাকতেন। স্বদেশী হাঙ্গামার সমযে দেশের লোককে পীড়ন করতে অসম্মত হয়ে তিনি নাকি চাকরী ছেড়ে দেন। তাবপর দেশেব কল্যাণ কামনায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই অবস্থায় তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মবৃত্তান্তও এমনই অলৌকিক দৈব রহস্যপূর্ণ—যার বিবরণ নির্লজ্জ গুলিখোর বদমাইসের মুখেই শুধু শোভা পায়। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মুখে নয়।

বুঝলাম, কোন শ্রেণীর "ভাল ভাল" আশ্চর্য্য কথা শুনে মোহিনী, বিন্দি, শ্যামার মাব দল শ্রদ্ধায আত্মহারা হয়েছে! আমার কিন্তু হতশ্রদ্ধায মরতে ইচ্ছে হোল। আত্মসম্ববণ কবে জিজ্ঞাসা কবলুম, "আপনার ছেলেদুটির এখন বয়স কত?"

উত্তরে শুনলাম, 'একজন বিশ বৎসরের, একজন চোদ্দ বৎসরের। বড় ছেলেটি একটি প্রকাণ্ড পালোয়ান, পশ্চিমের কোন রাজবাড়ীতে সে মোটর ড্রাইভার। ছোটটি প্রকাণ্ড সাধু, সে বাপের কাছে থেকে তপশ্চর্য্যা করে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—দেশোদ্ধার!'

শুনে মোহিত হব কি না ভাবতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটাও মনে উদয় হোল, যাঁর উপার্জ্জনশীল উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমান, তিনি কাশী থেকে রেলভাড়া খরচ করে বাংলাদেশে ভিক্ষা করতে এলেন কেন?

আমাকে স্তব্ধ অন্যমনস্ক দেখে তিনি কি ভাবলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ আমার কানেব কাছে মুখ এনে, গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে চুপি চুপি এমন গুটিকতক কথা বললেন, যা তোমাদের মত উষ্ণ-মস্তিষ্ক ছেলেদের কাছে প্রকাশ করতে আমার সাহস নেই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ন-মাসিমা নীরব হইলেন। তাঁহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

ছেলেবা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল, "পায়ে পড়ি ন-মাসিমা, আমরা কিছুতেই মাথা গরম করব না। আপনার কোন ভয় নেই, বলুন।"

নবীন উকিলটি বাধা দিয়া বলিলেন, "ন-মাসিমা, ওদের বিশ্বাস করবেন না। তিনি কি বলেছেন, তা আমি আন্দাজেই বুঝতে পারছি। আর বোধহয় চেষ্টা করলে বলেও দিতে পারি, তিনি কোন দলের গুপ্তচর; গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবার জন্যে ওরা নিরপেক্ষ

নিরীহ লোকদের অন্নিভাবেই উত্যক্ত করে বেড়ায়। যাক, তাঁর কথাটা বাদ দিয়ে, তারপর কি হোল বলুন।"

ন-মাসীমা বলিলেন, "কচি কচি দুধের বাছাদের হিংসার মন্ত্র শিখিয়ে যারা উত্তেজিত করে বেড়ায়, তাঁরা ভুল করে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করছে এ কথা আমি স্বীকার করি। দৈত্য-শক্তি—ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়, মনুষ্যধর্ম্মও নয়! রাজনীতির কোন তত্ত্বই আমি কস্মিনকালে বুঝি না, বরঞ্চ ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শটা কিছু কিছু বুঝি। যাক সে কথা। তাঁর কথাগুলো শুনে প্রথমটা মনে হোল, তিনি পাশ্চাত্যের আমদানী বিপ্লবপন্থী দলের মারণ মন্ত্র প্রচার করতে এসেছেন! অসৌজন্য হবে— জেনেও স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, আপনারা আত্মিক উন্নতি সাধনার পথ গ্রহণ করে সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন। এসব রাজনৈতিক বিপ্লববাদ, হিংসা-বিদ্বেষচর্চ্চায় আপনাদের দরকার কি? এগুলো যে সাধনপথের সর্ব্বনাশা প্রতিবন্ধক!

"পাকা চোরেরা কি করে জানি না, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পৃথিবীর সংস্রবে বাস করছি। ভাঁড়ারঘরে, আর ছাদে কুল-আচার, আম-আচার চুরি করবার সময় কাঁচা চোরগুলোকে অনেকবার ধ'রেছি! বামাল শুদ্ধ হঠাৎ গ্রেপ্তার হলে তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয় তাও লক্ষ্য করেছি। আমার কথা শুনে মুহূর্ত্তে তাঁর মুখেও সেই ভাব ফুটে উঠল। নিরতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তিনি বললেন, 'হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে! এ সব আমাদের চর্চ্চা করা...এ সব চর্চ্চা ভাল নয়, ভাল নয় বটে। এ সব চর্চ্চা কি ভাল? তা নয় বটে!'

"অবস্থা কাহিল দেখে দয়া হোল, হাজার হোক ভগবানের জীব! মুহূর্ত্তে আমি সে কথা চাপা দিয়ে তাঁর সাধনভজনের সংবাদ নিতে প্রবৃত্ত হলুম। তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। খুশীর আতিশয্যে সম্ভবতঃ আমাকে মোহিনী ঝি বা শ্যামার মার সমশ্রেণীস্থ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন জীব স্থির করে, ভীষণ বিক্রমে আবার আত্মশ্লাঘা প্রচার শুরু করলেন। এ কথাগুলো তোমাদের বলতে বাধা নেই। সুতরাং তিনি যেমন বলেছেন, আমি ঠিক অবিকল বলে যাচ্ছি। তোমরা শোনো।

"জিজ্ঞাসা করলুম, 'মোহিনী বলছিল আপনি ভৈরবী। আপনারা তান্ত্রিক?'

"তিনি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'হাঁ।'

"পুনশ্চ প্রশ্ন করলুম, 'কি ভাবে আপনি সাধন করেন? দিব্যভাব না বীরভাব, না পশুভাব?'

"তাঁর মুখে প্রচ্ছন্ন কাতর ভাবই ফুটে উঠল—স্পষ্ট বুঝলাম, এ প্রশ্নের সামনে তিনি নিজেকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত বোধ করছেন। কাকে দিব্যভাব বলে, কাকে বীরভাব বলে, তিনি তার কিছুই জানেন না। ঢোক গিলে, কষ্টেসৃষ্টে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি সবিনয়ে বললেন, 'দেখুন, আসলে আমি ভৈরবী নয়। ও ঝি-টি, "ভৈরবী" বলে—তাই আমিও বলি। নইলে সবাই বুঝবে না। আমরা হচ্ছি নানকপন্থী।'

"বাংলাদেশে এত ধর্ম্মমত, এত ধর্ম্ম সম্প্রদায় থাকতে, নিজেদের কুলাচার ত্যাগ করে, সুদূর পাঞ্জাবের গুরু নানকের ধর্ম্মমত গ্রহণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে কেমন করে সুলভ হোল, বুঝতে পারলুম না। হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছি দেখে তিনি বল্লেন,

'আমার স্বামী এক নানকপন্থী সাধুর কাছে সাধন নিয়েছিলেন। আমাকেও তাই সেই গুরুর মত নিতে হয়েছে।'

"উত্তম। আপত্তি করবার কিছু নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানকপন্থীদের সাধন প্রণালী বিশেষ রকম না জানলেও কিছু কিছু আমার জানা ছিল। আমি সেই সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করতেই তিনি আর সামলাতে পারলেন না। ভীত, ব্যস্ত, গলদঘর্ম্ম হয়ে সকাতরে বললেন, 'তিনি সাধন গ্রহণ করলেও, সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।'

"বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল মর্ম্ম না জেনে, যারা ফোঁটা তিলক কেটে বৈষ্ণবী সেজে 'জয় রাধে' হেঁকে বেড়ায়, বুঝলাম ইনিও সেই শ্রেণীর নানকপন্থী! মনের দুঃখ মনেই রেখে সবিনয়ে বললাম, 'আপনি কতদিন সাধন গ্রহণ করেছেন?'

"এবার খানিক সাহস গ্রহণ করে, তিনি স্মিতমুখে পুনরায় বললেন, 'অনেকদিন। আমার স্বামী চাকরী ছেড়ে, বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাবার পর আমি তেল মাখা ছেড়ে দিই, চুল বাঁধা ছেড়ে দিই। তাই ত আমাদের দেশের ছেলেরা আমার জন্যে সেই গান বেঁধেছিল, সেই যে! সে গান বোধ হয় আপনারা শুনেছেন, শুনেছেন নিশ্চয়! সেই—সেই—কেন গো মা তোর মলিন বদন, কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ'!

"হায় দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর সাধের সঙ্গীতের অদৃষ্টে এত দুর্গতি ছিল। এবার যথার্থই স্তম্ভিত হয়ে বললুম, 'সে গান বুঝি আপনার জন্যে তৈরী?'

"গণ্ডমূর্খ স্ত্রীলোক অনেক দেখেছি, কিন্তু এত বড় দুঃসাহস প্রকাশের স্পর্দ্ধা আর দেখিনি। কিম্বা বোধ হয়, পল্লীগ্রামে শ্যামার মা, মোহিনী , ক্ষান্ত ঠাকুরাণী শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দলে ভিড়ে, এন্নি সব ডাহা মিথ্যাকথার জাঁকে নিরীহ জীবগুলিকে মোহিত স্তম্ভিত করে, পয়সা আদায়ের সুযোগ পেয়ে তাঁর ভণ্ডামীর স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর মিথ্যাকথার বহর দেখে আমি স্তম্ভিত হলুম, কিন্তু তিনি সেটা নিছক ভক্তিরসের অন্তর্গত একটা বিশেষ করুণ অবস্থা ঠাউরে নিয়ে পুনশ্চ মহা-উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। মুচকি হেসে আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। সে গান শুধু আমার জন্যেই ফরিদপুরের ছেলেরা বেঁধেছিল। শুধু তাই নয়, আমার শ্বশুরের নাম "ভগবানচন্দ্র" কিনা? তাই ছেলেরা তাঁর নামেও গান বেঁধেছিল। সেই যে গান শুনেছেন বোধ হয়—

বাংলার মাটী, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
ধন্য হোক, ধন্য হোক,
ধন্য হোক, হে ভগবান!

"উপসংহারে তিনি পুনশ্চ—বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'আমার শ্বশুরের নাম "ভগবানচন্দ্র" বলে, তাঁর নামে ঐ গান বাঁধা হয়!'

"যেন তাঁর শ্বশুরের নাম 'ভগবানচন্দ্র' না হলে এ গান রচনাই হোত না?"

বিহারী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "জোচ্চোর। একেবারে হস্তীমূর্খ।"

নবীন উকিলটি একটু হাসিয়া বলিলেন, "যারা তাঁকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল, তাঁরা জন্ম জন্ম গোয়েন্দা পাঠান তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আপনাদের মত

লোকের কাছে, মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠাবার সময়, তাঁরা যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্না মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠাতেন, তাহলে তাঁদের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে একটু শ্রদ্ধা করতে পারতুম। যাক, তারপর আপনি কি করবেন বলুন?"

ন-মাসিমা বললেন, "অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ। যথার্থই কেউ তাঁকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার জন্য আমারও দুঃখ হল। আর তাঁকে বেশী কথা বলবার সুযোগ দিলে নিজের ধৈর্য্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী বুঝে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। ভিক্ষার্থীকে রিক্ত হস্তে বিদায় দিতে নাই, তাই একটা নিকেলের আনি দিয়ে তাঁকে বললুম, 'এখন আসুন। আর আমার সময় নেই।'

"আমাদের মোহিনী ঝি, শ্যামার মা, এরা কেউ ছয় আনা, আট আনার কম তাঁকে 'সৎকার্য্যে দান' করেননি। কিন্তু আমার কাছে মাত্র এক আনা তিনি কেন পেলেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুললেন না। সস্মিত মুখে প্রস্থান করলেন।

"পরদিন সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম সেরে একটু অবকাশ পেয়ে, নীচে গিয়ে বসলুম! মেয়ে মহলের মাতব্বরগুলিকে ডেকে, ভৈরবী ঠাকরুণের যথার্থ-ভৈরবীত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে তাদের সাবধান করে দিলুম। কথা বলছি, এমন সময় আমাদের বুড়ো গয়লাখুড়ো, দুধ দিতে এসে একটু দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলি শুনলে। তারপর বললে, 'গ্রামের ভদ্রলোকেরাও ভৈরবী ঠাকরুণের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ-শঙ্কিত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অন্তঃপুরে গিয়ে তিনি গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে, মেয়েদের কাছে যে রকম কথাবার্ত্তা বলে এসেছেন, তাতে সকলেই আশঙ্কা করেছেন, ঠাকরুণটি কি একটা ফ্যাসাদ বাধাবার মতলবে খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন! সকলেই পরস্পরকে সাবধান করছেন! তাছাড়া গয়লাখুড়োও আজ মাঠে গরু চরাতে গিয়ে দেখে এসেছে, মাঠের নির্জ্জন রাস্তায় সাঁকোর ওপর, ঠিক-দুপুরের সময় তিনি বসেছিলেন। এমন সময় কোথা হতে জবা ফুলের মালা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ভীষণ গুণ্ডাকৃতি একটা লোক সেইদিকে এল। তারপর কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে থেকে দুইজনেই নির্জ্জন বনের দিকে চলে গেল।

গয়লাখুড়োকে মিথ্যা কথা বলতে কখনো শুনিনি। যাই হোক, তারপর দিন থেকে ভৈরবী ঠাকরুণ অদৃশ্য হলেন। এরপর আর তাঁর খোঁজ পাইনি।"

উকিল শ্রোতাটি একটু হাসিয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ তিনি এখন নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস করছেন। বুড়ো বয়সে আর কত খাটবেন?"

বিহারী সাতিশয় ক্ষোভের সহিত বলিল, "কিন্তু পুলিশের ক্ষুদে বরকন্দাজগুলোর জন্যেই আমার ভাবনা। ওদের বদ্রিনারায়ণে তীর্থ সেবা করতে পাঠান দরকার, কিম্বা ওদের ভদ্র দস্তুর সহবৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটা স্কুল খোলা কর্ত্তব্য। চাণক্য বলেছেন—'মূর্খে নিযোজ্য মানে তু ত্রযো দোষা মহীপতেঃ। অযশশ্চার্থনাশশ্চ—"

মোহন বলিল, "বাকীটুকু পাঠান্তর করে বল—চক্ষুপীড়ৈব কেবলম।"

ন-মাসিমা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "ধনুষ্টঙ্কারের পর চক্ষুঃপীড়া। ভাল, আমাদের খামকা দুর্ভোগের জন্যে কোন রোগ বরাদ্দ করবে ডাক্তার? জলাতঙ্ক? না স্নায়ু বিকার?"

দুই রূপ

সকালবেলা।

আর্টিস্ট অজয়কুমার তাঁহার স্টুডিওতে বসিয়া ইজেলে একটা ছবি আঁকিতেছিলেন।

বড় ভাই অনিরুদ্ধ আসিয়া তাঁহার সামনে একটা সদ্যপ্রকাশিত মাসিক পত্র খুলিয়া ধরিলেন। একটা ছবি দেখাইয়া বলিলেন, "অজু, এ ছবিটা দেখেছিস? নামজাদা আর্টিস্টের আঁকা।"

অজয় হাত থামাইলেন : ছবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখেছি।"

"এ সম্বন্ধে তোর কি মত? কেমন হয়েছে?"

অজয় ভাইয়ের মুখপানে চাহিযা একটু হাসিলেন। তারপর পুনরায় ছবিতে তুলি চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "আমাকে ক্ষেপিয়ে কেন অপরাধী করছ? দেখতেই ত পাচ্ছ,—মামুলি তারুণ্য!"

"একজন সমালোচক বলছেন—এটা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা!"

"হুঁ। তাতেই ত প্রশ্ন করবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগে। ইনি যদি তাই হন, তাহলে অতি স্থূল লালসার ক্লেদ কাকে বলে?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া স্টুডিও'র দুয়ারে থামিল। ট্যাক্সি হইতে প্রথমে নামিল সৌখীন-পরিচ্ছদধারী রোগা, লম্বা চেহারার শ্যামবর্ণ এক বাঙালী যুবক। তারপর নামিলেন এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা এবং একটি অতি সুন্দরী কিশোরী। উভয়ের পরিধানে মূল্যবান সুদৃশ্য রেশমী শাড়ী, ব্লাউস, পায়ে জরির ফুলকাটা লাল ভেলভেটের নাগরা। হাতে গলায় সৌখীন ধরণের মুক্তা-বসানো কয়েকগাছি চুড়ি, মুক্তার বালা ও মুক্তার মালা। কাঁধের ও মাথার কাপড়ে ঝকঝকে পালিশ করা জড়োয়া শেফটিপিন ও ক্লিপ। কানে দুল।

মেয়েটি সম্ভবতঃ কুমারী। মাথায় কাপড় নাই। চাহনিতে, চলনের ভঙ্গীতে, একটা সুশোভন নম্রভাব। কিন্তু সঙ্কোচের আড়ষ্টতা নাই। চাঞ্চল্যের প্রাখর্য্য নাই।

বয়স্কা ভদ্রমহিলাটির চাল-চলন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। চলিতে, চাহিতে,—হাসিতে, কাশিতে সব বিষয়েই গর্ব্বোদ্ধত ভাব।

তাঁহারা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া দূরের দিকে চাহিলেন। জনতা বা কোন দোকানের মধ্যে হয়ত হাস্যোদ্দীপক কিছু লক্ষ্য করিলেন। সভ্যতা বজায় রাখিয়া অস্ফুট শ্লেষ বিদ্রূপ সহ কি একটা হাসাহাসি কানাকানির তুফান বহিয়া গেল।

তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বড় ভাই বলিলেন "মোহনবাবু নয়? সঙ্গে এঁরা দুজন কে?"

অজয়বাবু সেদিকে না চাহিয়াই নিম্নস্বরে বলিলেন, "ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেবের মেয়ে। ছোট মেয়েটি ওঁর বোন-ঝি। কি some—মিস সেন। কীর্ত্তন গানে first পুরস্কার পেয়েছেন।"

"ও! মিসেস্ মিত্তির! মিঃ মিত্তির তো দেউলিয়া এ্যাটর্ণী! ও-পাড়ার ছেলেরা এঁকেই বলে বার্ণাড শ'র মিসেস্ ওয়ারেণ?"

"আঃ পরনিন্দা নরহত্যার সমান অপরাধ! যাঁকে চিনি না, জানি না, তাঁর কুৎসায় কান না দেওয়াই ভাল। ওতে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অবিচার করা হয়।"

সেই সময় আগন্তুকত্রয় ভিতরে ঢুকিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

শোনা গেল মাসিমা ও তাঁর ভগিনীকন্যা বিভিন্ন রকমের দুই ডজন ছবি তোলাইবেন।

আগন্তুক যুবক মোহনবাবুর সঙ্গে অনিরুদ্ধবাবুর দর-দস্তুর চলিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাসিক পত্রিকাখানা নিকটস্থ টেবিলে রাখিলেন।

মাঝের সেই ছবিখানা খোলা ছিল। ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন। তারপর মাসিকের সেই ছবিটার দিকে একটা চোখ রাখিয়া বাঁকা কটাক্ষে ইজেলের অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিটা দেখিলেন।

একটু অবজ্ঞার হাসি অধরপ্রান্তে খেলিল।

মাসিকের ছবির বিষয়-বস্তু,—বিশৃঙ্খল বেশ-বাস-সমন্বিত, আসর বিহ্বল, দুই নরনারী মূর্ত্তি। ইজেলের ছবিতে দেখা যায় পাহাড়ের পথে একদল তীর্থযাত্রী চলিয়াছে। তাহাদের বেশ-বাস নয়নরঞ্জক নয়। ভাব-ভঙ্গীতে সুরা-বিহ্বলতার পরিবর্ত্তে দৃঢ় অধ্যবসায়ীর রুক্ষ কাঠিন্য।

মহিলাটি মাসিক পত্রটা হাতে লইলেন। ছবিটা সঙ্গী যুবককে দেখাইয়া বলিলেন, "দ্যাখো মোহন, প্রাণবান art."

ভ্রাতৃদ্বয় চকিত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখপানে একবার তাকাইয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহিলাটি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাঁহাদের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিলেন। মিহি মোলায়েম সুরে বলিলেন, "রসজ্ঞ আর্টিস্টের তুলিব টান দেখলেই চেনা যায়। দেশে সত্যিই আর্টের একটা নবযুগ এসেছে। আর্ট জিনিষটা যে কি, লোকে এবার সেটা বুঝতে শিখেছে। দেখো দেখি, কেমন সজীব ভঙ্গী! একেই ত বলে আর্ট!"

শিল্পী ভ্রাতাদ্বয় মাথা হেঁট করিলেন। বড় ভাই মাথা চুলকাইতে ব্যস্ত হইলেন। ছোট ভাই আলোয়ানটা ঝাড়িয়া ঠিক করিয়া গায়ে জড়াইতে লাগিলেন।

বড় ভাইটির দিকে চাহিয়া মহিলাটি ভদ্র-দস্তুর মোলায়েম সুরে বলিলেন, "ছবিখানি সুন্দর হয়েছে, নয়?"

সন্ত্রস্ত হইয়া বড় ভাই বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সুন্দর বৈ কি।"

তারপর মোহনের দিকে চাহিয়া আবার বিভিন্ন ফটোর সাইজ অনুসারে দরের হিসাব আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মোহনকে নগ্ন দেহের রূপালোচনায় নিরস্ত হইতে হইল। জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিয়া বলিল, "ক্যামেরা ফিট্ করুন।" ভদ্রলোক পলাইতে পারিলে বাঁচেন। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকিয়া যন্ত্রপাতি লইয়া খুটখাট শব্দ জুড়িয়া দিলেন।

পলাতক ভদ্রলোকটির উদ্দেশে ইঙ্গিত করিয়া ভদ্রমহিলা মোহনকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "উনিই কি আর্টিস্ট্?"

মোহন মাথা নাড়িয়া, ইঙ্গিতে অজয়বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "উহুঁ। ইনি এঁর ভাই।"

অজয়বাবু তখন পিছন ফিরিয়া নিজের রং তুলি ইত্যাদি গুটাইতেছিলেন। তাঁর পায়ে চটি, গায়ে গেঞ্জির উপর আড়ভাবে জড়ানো আলোয়ান। চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

সেই নিরেট গদ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ভদ্রমহিলা ঘৃণাভরে ঠোঁট উল্টাইয়া নিঃশব্দে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। মোহন খুশী হইয়া নিজের সৌখীন বেশের দিকে চাহিয়া তৃপ্তিভরে হাসিল।

সঙ্গিনী কিশোরী একটু বিরক্ত হইল। সকলের অলক্ষ্যে মাসিমার কোমরে কুনুইয়ের গুঁতা হানিয়া জনান্তিকে বলিল, "ও কি মাসিমা...।"

অজয়বাবু একবার ফিরিয়া চাহিলেন। ব্যাপার যা ঘটিয়া গেল, চোখে না দেখিলেও তিনি অনুভবে বুঝিলেন। মুখের একটি রেখা রূপান্তরিত হইল না। নির্ব্বিকার মুখে ছবি-তোলার কয়েকটি জিনিস টেবিলের উপর হইতে লইয়া তিনিও পাশের ঘরে ঢুকিলেন।

ভদ্রলোক অদৃশ্য হইলে মেয়েটি চাপা-গলায় তর্জন করিয়া বলিল, "মাসিমা, তুমি বড় অসভ্য। মানুষ দেখে ওরকম কর কেন?"

মাসিমা সপ্রতিভভাবে মোহনকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন "চোয়াড়ে ভঙ্গী দেখলে হাসব না? বল ত মোহন? স্টুডিওতে রয়েছেন, আর্টিস্ট উনি। গেঞ্জির উপর আলোয়ান জড়িয়ে,—কোঁচবকের মত—উঁ—ভঙ্গি!"

বলিয়া বিদ্রূপ ভরে নিজের ঘাড় শিটকাইয়া তিনি অদ্ভুত ভঙ্গী করিলেন।

মেয়েটি সরোষে তাঁহাকে পুনশ্চ কুনুইয়ের গুঁতা দিয়া বলিল, "যাও, বোকো না।"

মোহন উভয় পক্ষকে খুশী করিবার জন্য কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। নিরুপায় ভাবে কাষ্ঠহাসি হাসিতে লাগিল। বেচারার অন্তরে অন্তরে ভয় হইতেছিল,—তাহার নিজের সযত্ন-রচিত কেশ বেশ, গরদের পাঞ্জাবী, জরিপাড় ধুতি, সোণার ব্যাণ্ডওয়ালা রিষ্টওয়াচ, সোণার বোতাম বা পাম্পশু'র গঠনে পাছে কোথাও কোন চোয়াড়ে ভঙ্গী প্রকাশ পাইয়া এই সুরুচি বিলাসিনী ভদ্রমহিলার চক্ষুকে পীড়া দেয়। পাছে সেও ওই চোয়াড়শ্রেণীভুক্ত হয়!

মহিলাটি পুনশ্চ অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "যে যাই বলুক। এই আর্টিস্টটি একদম গেঁইয়া! লোকটা বিয়ে করেছে?"

'হ্যাঁ, দুটি ছেলেও হয়েছে।'

'স্ত্রীটিও অম্নি গেঁইয়া!'

মোহন সলজ্জভাবে স্বীকার করিল সে সংবাদটা জানে না।

এদিক ওদিক তাকাইয়া সুদৃশ্য ও সুরুচিব্যঞ্জকভাবে সাজানো স্টুডিওর আসবাবপত্র ও চিত্রাবলী দেখিতে দেখিতে মহিলাটি বলিলেন, "কিন্তু এদিকে রুচিজ্ঞান আছে। দোকানটি সাজিয়েছে ভাল। কি বলিস পারু?"

পারুল চটিয়া বলিল, "আমার অনধিকার চর্চ্চার সখ নাই। তুমি যেখানে যাবে, সেইখানেই এম্নি করবে মাসিমা, ছবি তোলাতে এসে এত কেন?"

এই অশিষ্ট শাসনে ভদ্রমহিলা মনে মনে একটু আহত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সেটা স্বীকার করিয়া মানহানি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কৃপার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখছ মোহন? পারুর বকুনিটা কেমন?"

পরিচয় বেশীদিনের নয়। তবু মোহন বেশ জানিত শ্রীমতী পারুল দেবীর মাসি-মাতাকে চাটুবাদিতা দ্বারা যত সহজে মুগ্ধ করা যায়, পারুল দেবীকে তুষ্ট করা তত সহজ নয়। দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করাও বিপজ্জনক। উনি আই, সি, এস, পিতার কন্যা, নিজেও আই, এ, পড়িতেছেন। বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, প্রকৃতিও তেমনি উষ্ণ। তাঁহার মাসিমার ইঙ্গিতে অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত যুবক পারুল দেবীর হৃদয়-দুর্গ জয় করিতে উৎসুক। কিন্তু তরুণীটির উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রখর শক্তির ধাক্কায় তাহাদের অনেকেই ছিটকাইয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মোহনও যদি কোন কারণে ইহাকে চটায়, তবে ত সেই দলে পড়িবে। তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! বেচারার মানবজন্মটা ব্যর্থ হইবে!

একে ত বেচারা তাহার পৈতৃক অর্থ-সম্পত্তি ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সম্বন্ধে মিথ্যা জাঁকের গল্প শুনাইয়া, ইঁহাদের শ্রদ্ধা-আকর্ষণ করিয়াছে। কলেজ ছাড়িয়াও কলেজে নাম রাখার মিথ্যা গল্প শুনাইয়াছে। তার উপর মোহনের ঈর্ষ্যা ও আশঙ্কা উদ্দীপ্ত করিয়া, মোহনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী রূপ, গুণ, অর্থসম্পদশালী লুব্ধ মুগ্ধ মধুকরের দল ইঁহাদের চারিপাশে সকাল সন্ধ্যা গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে। কে যে কখন মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইবে—ঠিক নাই। উৎকণ্ঠায় বেচারার আহার নিদ্রা মাথায় উঠিয়াছে। আত্মীয়বন্ধুরা কে মরিতেছে, না-মরিতেছে খবর লইবার সময় নাই। সে-সব কর্ত্তব্য এখন তুচ্ছ, ঘৃণিত।

এমন অবস্থায় সে কাহার সপক্ষে কথা কহিয়া কাহাকে অসন্তুষ্ট করিবে?...উভয় সঙ্কট!

অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল!

মধুসূদন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ছবি তোলার জন্য ডাক পড়িল।

বিপুল আড়ম্বরে নানা ভঙ্গীর ছবি তোলা হইল।

বড় ভাই বলিলেন, "দিন তিনেক পরে এসে ছবিগুলো নিয়ে যাবেন। মোহনবাবু, আজ গোটা তিরিশেক টাকা দিয়ে যান। বাকীটা পর্শু চুকিয়ে দিবেন।"

ভদ্রমহিলা মোহনের মুখপানে চাহিয়া আমতা আম্‌তা করিয়া ব্যাগ খুলিতে উদ্যত হইলেন। ব্যাগে অবশ্য অত টাকা ছিল না।

মোহন তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, আমি দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ।"

বাহিরে আসিয়া মোহন বলিল, "এবার পরেশনাথের বাগানে যাবেন ত? ট্যাক্সি ডাকি?"

"এখন বেলা হয়েছে, বাড়ী ফেরা যাক। ও-বেলা বাগান দেখে সিনেমায় গেলেই হবে। শোন মোহন, এদিকে এস—।"

একপাশে মোহনকে ডাকিয়া ভদ্রমহিলা চুপি চুপি বলিলেন, "মোহন, আবার মুস্কিলে পড়েছি। এ মাসেও শ' পাঁচেক দরকার। কাউকে বোল না যেন, তুমি দিতে পারবে?"

গোপনে মোহনের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ! কি অসীম অনুগ্রহ! কি অপরিসীম বিশ্বাস-নির্ভরতা! গর্ব্বে মোহন ফুলিয়া উঠিল! এত সৌভাগ্য কাহারও হয় না, হইবে না!

দ্বিধামাত্র না করিয়া মোহন বলিল, "কবে চাই? কাল?"

"হ্যাঁ। পার্ব্বে ত দিতে?"

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু দেখো যেন কেউ না জানতে পারে। পারুও যেন টের না পায়। এমন কি তোমার বাড়ীর কেউ—"

"বিলক্ষণ! বলতে হবে না কিছু। ওই যে—এই ট্যাক্সি—"

ট্যাক্সি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিনজনে ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

ট্যাক্সি ছুটিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় আর একজন সুবেশধারী রূপবান যুবা সামনে আসিয়া বলিল, "এই রোকো—"

ভদ্রমহিলা সানন্দে বলিলেন, "এই যে অনিল! চিঠি পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, ওখানেই যাচ্ছি। বাড়ী যাচ্ছেন ত?"

"হ্যাঁ, উঠে পড়। এ্যা—ইয়ে, মোহন, তুমি এক কায করো। চার টাকার ল্যাংড়া আম কিনে ঝাঁকামুটে দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এস।"

আদেশের অপেক্ষা মাত্র। মোহন তৎক্ষণাৎ নামিল। অনিল উঠিল। মোহন নিঃশ্বাস ফেলিল।

"আমের দামটা ও-বেলা দিলে হবে ত?"

শুষ্ককণ্ঠে মোহন বলিল, "তাই দেবেন।"

ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ হইল। ভদ্রমহিলা মুখ বাড়াইয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন, "আম ও-বেলা আনলেও হবে। তুমি এখন বাড়ী গিয়ে, খেয়ে"—

বাকী কথা শোনা গেল না। ট্যাক্সি পলায়ন করিল।

অনিলের আগমন ও অভ্যর্থনার ঘটা দেখিয়া বেচারার মন দমিয়া গেল!

বাড়ী আসিয়া টান মারিয়া ঘর্ম্মাক্ত জামাজুতা খুলিয়া মোহন তদ্দণ্ডে জুতা ব্রাস করিতে বসিল।

মা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, "হ্যাঁরে মোহন, পর্শু যে কোম্পানীর কাগজের সুদ বের করে আন্‌লি, তা টাকাগুলো দিয়ে বেরুতে তুর সইল না! গয়লা, মুদি, তিনবার এসে ফিরে গেল! মাসকাবারী বাজার হোল না—"

ভীষণ গম্ভীর হইয়া মোহন বলিল, "হোল না ত কি কর্ব্ব?"

"বটে! আমি সংসার চালাই কি করে?"

"আমি তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

"তোর সঙ্গে কথা বলাই ঝক্‌মারি।"

আর্টতত্ত্বের অন্তর্গত কৃত্রিম মধুর-ভঙ্গীর মুখোস খসিয়া পড়িল। অকৃত্রিম বর্ব্বরতা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুণবান্ পুত্র দাঁত খিঁচাইয়া জবাব দিলেন, "ঝক্‌মারি ত কথা কইতে আস কেন? না কইলে ত বাঁচি!"

"টাকাগুলো এখন দাও।"

"এখন সময় নেই। সময় হলে দেব।"

"বাজার করব কখন? ঠিকে ঝি, এই বেলা হাট-বাজার না করালে, আর তাকে পাব না। আজ আবার দশমী, রাত্রের ঘি-ময়দাটুকুও ঘরে নেই।"

"নেই তা কি করব?"

"টাকা দে।"

"পাব কোথা? ছ' মাসের কলেজের ফিস বাকী ছিল, দিলুম। আরও শ'খানেক লাগবে। নতুন বই কিনতে হবে।"

"আবার কলেজের ফি কি রকম? কলেজ ত ছেড়ে দিয়েছিস।"

ভীষণ গম্ভীর হইয়া পুত্র বলিলেন, "ফের ঢোকা হয়েছে।"

শঙ্কিত হইয়া মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, তাহলে সংসার চালাব কিসে?"

"আমি কি জানি? পড়তে বলেছিলে কেন?"

"পাশ করে দু' পয়সা আনবে বলে। সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হৈ করলে, বছর বছর ফেল হলে, নিজে পড়া ছাড়লে। সর্ব্বস্ব ঘুচেছে, এখন আবার পড়াবার পয়সা পাব কোথা?"

পুত্র নির্ব্বিকার মুখে বলিল, "সই করে দাও। আর একখানা কাগজ ভাঙিয়ে আনি।"

"তারপর? শেষ সম্বল ঘুচিয়ে পেট চালাব কিসে? সে কমবক্তো একরাশ টাকা উড়িয়ে পড়ার অছিলা করে থিয়েটারের নট-নটীর দলে ভিড়ল। শেষে শক্ত রোগ ধরিয়ে বাড়িতে এসে ভুগে ভুগে কত খরচ করিয়ে গেল। তারপর তোমার ফেল হওয়ার দায়ে, আমোদ-প্রমোদের দায়ে, একে একে সব ক'খানা কাগজ গিয়ে ওই চারখানায় ঠেকেছে। ও চারহাজার গেলে—"

রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া ভীষণ হুঙ্কারে পুত্র বলিলেন, "বাড়ীতে টিকতে দেবে, না তাড়াবে? কি মতলব, বল? এখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।"

গতিক মন্দ!...চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে মা প্রস্থান করিলেন।

মোহন স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া পুনরায় জামাজুতা পরিল।

রান্নাঘরে দোয়াত কলম হাতে আসিয়া বলিল, "কোম্পানির এই কাগজ দু'খানার পিঠে সই করে দাও। তোমার টাকার সুদ বেরোয়নি, এতে সই দিলে তবে বেরুবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া মা বলিলেন, "টাকার সুদ বেরোয়নি? তবে যে বল্লি বেরিয়েছে, কলেজের ফি দিয়েছিস।"

দাঁত খিঁচাইয়া ছেলে বলিল, "যেমন তোমার জিজ্ঞাসা করার ছিরি! চব্বিশ ঘণ্টা খিটখিট শুনলে মাথার ঠিক থাকে না। কর শীগ্গির সই।"

কাগজে সহির স্থান দেখাইয়া দিল।

মা তেল হলুদের দাগ হাত হইতে মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সুদ বের করার জন্যে আগে ত এতে সই করতে হোত না।"

"নতুন রুল হয়েছে, এখন থেকে করতে হবে।"

মা বাংলায় সহি করিলেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না। কিসের জন্য সহি করিলেন, তাও জানিলেন না। শিক্ষিত পুত্র, চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধারকর্ত্তা, পিণ্ডদাতা, বিশ্বাসী বংশধর যা বুঝাইল, তাই বুঝিলেন।

কোনমতে মুখে দু মুঠা অন্ন দিয়া মোহন উর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

ঝি আসিয়া বলিল, "টাকা এল মা? দাও হাটবাজার করে আসি।"

শুষ্কমুখে মা বলিলেন, "একটি পয়সাও পাইনি মা। দেখি যদি বিকেলে পাই। কি করি, দশমীর দিন উপোস থাকলে পাছে ছেলের অকল্যাণ হয়, তাই ভয়!"

যথেষ্ট লোকসান দিয়া হাজার টাকার কাগজ বেচিয়া সাড়ে ছয় শত টাকা পাওয়া গেল।

দশ টাকার আম কিনিয়া মোহন ট্যাক্সি হাঁকাইয়া 'মিসেস মিত্তিরের' বাড়ী উপস্থিত হইল।

সেখানে অনিল প্রমুখ বিস্তর বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিল। হাসি গল্প আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল।

আম দেখিয়া সকলে উল্লাসধ্বনি করিলেন। 'মোহনবাবুর উপহার' বলিয়া আম সমাদরে সকলের সেবায় লাগিল। মিসেস মিত্র সাহ্লাদে বলিলেন, "মোহন, তোমাকে আমি দাতাকর্ণ উপাধি দিচ্ছি।"

মোহন কৃতার্থ!

মোহন মিসেস মিত্রকে ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বলিল, "আপনার জন্য ছুটে গিয়ে আজই ব্যাঙ্ক থেকে বের করলুম।"

দেখা গেল ব্যাগে তখনও নোট রহিয়াছে। মিসেস মিত্র সহর্ষে বলিলেন, "খুব উপকার হোল। যদি আরও একশো টাকা দিতে পারতে, ভাল হোত। আগে বলতে ভুলে গেছি।"

"তাতে কি হয়েছে? নিন।"

"টাকাটা তোমার ত? বলে রাখছি এখন কিন্তু ফেরত দিতে পারবো না। তাগাদা দিও না।"

"পাগল!"

"যদি কখনই ফেরৎ না দিই?" বলিয়া মিসেস মিত্র হাসিলেন। মোহনও হাসিল।

চারখানা ট্যাক্সি আনাইয়া সবান্ধবে পরেশনাথের বাগানে রওনা হওয়া গেল। মোহন সঙ্গে চলিল।

হাসি, তামাসা, রঙ্গ-রহস্য—হৈ হৈ!

যখন মোহনের বাড়ীর অদূরে রাস্তা দিয়া ট্যাক্সি ছুটিয়া যায় তখন চকিতে মনে পড়িল মার হাতে পয়সা নাই। কাল একাদশীর উপবাস। সে বাড়ী গিয়া টাকা না দিলে মাকে আজও রাত্রে উপবাস করিতে হইবে।

একবার উসখুস করিল। তারপর...আত্মদমন! রাগ হইল...এই স্বার্থপর বিধবা মাতাটা তাহার সুখের হন্তারক হইয়া কেন বাঁচিয়া আছেন? হাঁ, মরাই ভাল উঁহার। উপবাস করিয়াই মরুন।...কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

চিত্ত দৃঢ় করিল।

বাগানে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করা গেল। তারপর রওনা হওয়া গেল—সিনেমায়। বন্ধুবর্গ সঙ্গে চলিলেন।

রাত্রি ন'টার পর সিনেমা হইতে বাহির হইয়া মিসেস মিত্র ও পারুল দেবীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া মোহন, ট্যাক্সি ভাড়া মিটাইয়া দেখিল—পকেটে অবশিষ্ট আছে মাত্র ছয়টি পয়সা। বাকী উনপঞ্চাশ টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা খরচ হইয়াছে, আম, সিগারেট, চা, চপ, কাটলেট, সিনেমা ও ট্যাক্সি ভাড়ায়!

মনে পড়িল কাল বিধবা মাতার একাদশী। আজ রাত্রেও তাঁহার খোরাক নাই!

মিসেস মিত্র মোলায়েম সুরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শুভরাত্রি জানাইয়া বিদায় দিলেন। পারুল বলিল, "কাল সকালেই আসবেন মোহনবাবু—"

মোহন শূন্য পকেটে হাত দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।*

বর্ষবাণী, ১৩৪৩

পাঠশালার স্মৃতি

এ দেশের তথাকথিত পাঠশালার গুরুমহাশয়দের স্মৃতি,—অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মনকে বুড়া বয়সেও ক্লান্ত করিযা তোলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশে বর্ধমান রাজবংশের বদান্যতায় আমরা শৈশবে যে পাঠশালায় পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম,—সেখানকার সুমধুব স্মৃতি আজও আমার মনকে শ্রদ্ধাবহ আনন্দ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ধমান বাজবাডির উত্তরে 'শূলীপুকুর'। ঢেউ-খেলানো প্রাচীর শোভিত এই পুষ্করিণীর পূর্ব কোণে ছিল আমাদের আদরের পাঠশালা—নাম ছিল তৎকালে—'রাজ বালিকা বিদ্যালয়'।

সম্পূর্ণ পর্দানসীন বিদ্যালয। শিক্ষয়িত্রী ছিলেন সে সময়ে দুইজন,—স্বর্গীয়া পূজনীয়া শৈলজাকুমারী দেবী, এবং স্বর্গীয়া পূজনীয়া মধুমতী দেবী। উভয়ই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা।

বেত্রের জোরে নয়, শুধু আন্তরিক মমতাপূর্ণ নিষ্কপট স্নেহের জোরে ইঁহারা সমস্ত ছাত্রীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এমন পরিপূর্ণ মাতৃধর্মব্রতা, অপরিসীম স্নেহময়ী, ধৈর্যশীলা, সদা প্রসন্না, কোমল-স্বভাবা শিক্ষয়িত্রী আমার জীবনে বুঝি আর দেখি নাই।

বয়োজ্যেষ্ঠা শৈলজাকুমারী দেবীকে আমরা 'বড় গুরুমা' বলিতাম। তিনি সুবিখ্যাত স্বর্গীয় 'কবীন্দ্র' রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল-বিধবা কন্যা। বাংলা ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রণালীর খুঁটিনাটির দিকে তিনি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। নীরস বিষয়কে সরস করিয়া বুঝাইবার, দুর্বোধ্য ব্যাপারকে সহজবোধ্য করিবার কৌশলগুলি তিনি বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ পড়িবার সময় আমাদের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র অমনোযাগী হইলে তিনি বাল্যজীবনে তাঁহার পিতার কাছে কিরূপ আগ্রহে

* শ্রীমতী জযন্তী লাহিড়ীর আনুকূল্যে প্রাপ্ত।

ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে ঘটনার কথা বলিতেন। বলিতেন—"আজও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমস্ত পাতা আমি চোখের সামনে দর্পণের মত দেখতে পাই।"

শুনিয়া আমাদের— বিশেষতঃ আমার উৎসাহ ঘোরতর মাত্রায় বাড়িয়া যাইত। যে হেতু বাড়িতে 'পড়া ধরিবার' জন্য আমাকেও পিতৃদেবের অবকাশ খুঁজিয়া,—তাঁহার উপরই উৎপাত চালাইতে হইত। পিতৃদেব তখন সরকারী পেন্সনে নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইলেও, আশপাশের পীড়িত ব্যক্তিরা তাঁহাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র 'ডাক্তারবাবু'কে দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেয় নাই। পড়ার আরম্ভেই হয়ত পিতার জরুরী 'ডাক' (call) আসিত, বই রাখিয়া, উঠিয়া যাইতেন। আবাব সুযোগমত তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতাম। ছোটদের পড়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

পরবর্তী জীবনে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়াই আমাব সাহিত্যসেবার 'হাতে খড়ি' হয়। কিন্তু সে কথা এখন যাক।

দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী মধুমতী দেবীর প্রকৃতিতে কতকগুলি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। ইনি একাধাবে পরম স্নেহময়ী ও কঠোর ন্যায়পবায়ণা ছিলেন। বিদ্যালয়ে রাজবাড়ির আত্নীয় সম্পর্কীয অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, এবং বাজবাড়ির অনেক পদস্থ কর্ম্মচারীদের ঘরেব মেয়ে পড়িত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু অশিষ্ট, দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। বড় গুরুমা কিছু বেশিমাত্রায় ভালমানুষ, ইহাদের গর্বিত ধৃষ্টতা দেখিয়াও দেখিতেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি 'ছোট গুরুমা' প্রশান্ত গাম্ভীর্যে প্রত্যেক বালিকার চালচলনের প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য রাখিতেন যে কাহারও ফাঁকি দিবাব যো ছিল না।

সে সময় বিদ্যালয়ের 'বাস' দুইখানি ছিল— আধুনিক মোটর চালিত নয়। খাঁটি পৌরাণিক দুইটি কবিয়া বৃহৎ আকারের বলদ বাহিত গাড়ি। গাড়ির ভিতরে 'বাসের' অনুরূপ দুটি বেঞ্চি। প্রত্যেক ক্ষেপে কুড়ি বাইশটি মেয়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছিত। দৈনিক প্রায় দুই ক্ষেপ করিয়া প্রত্যেক গাড়ি মেয়েদের আনিত ও বাড়ি পৌঁছাইযা দিত। কখনো এক ক্ষেপ চলিত।

গাড়িতে আসা যাওয়ার সময়, বিদ্যালয়ের বেতনভোগী গাড়োয়ান ও ঝি সঙ্গে থাকিত। ঝিকে মেয়েরা সমীহ করিযা চলিত। কিন্তু দৈবাৎ কোনদিন ঝি সঙ্গে না থাকিলে, দুষ্ট মেয়েদের চীৎকার-হৈ হৈ করিবার সদিচ্ছাটা কিছু প্রবল হইত। গাড়োয়ান তখন ধমক দিয়া থামাইত।

এমনই এক ঝি-শূন্য গাড়িতে বিদ্যালয় যাওয়ার পথে একদা এক দুর্ঘটনা ঘটে। অভিভাবকগণের পদমর্যাদায় অহংকৃত দুইটি বালিকার প্রবোচনায উৎসাহিত হইয়া, গাড়িসুদ্ধ মেয়ে খুব এক চোট অসংযত হল্লা করিযা আনন্দ উপভোগ করিল। গাড়োয়ান ভদ্রভাবে অনুরাধ করিযা যখন পারিল না, তখন চলন্ত গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িযা গাড়ির সমস্ত জানালাগুলা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। পথচারী কৌতূহলী পথিকদের কাণ বাঁচাইয়া, শাসাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "এই সব বেযাদবি! শেষে ইস্কুলের বদনাম হবে। চল, আজ সব গুরুমাদের জানাব।"

বিদ্যালয়ে আসিয়া ঝি'র মার্ফৎ বাহির হইতে সে—সেই পাঁচ হইতে 'বারো বৎসর বয়স্কা ক্ষুদ্র 'বেয়াদবদের' দুর্বৃত্ততার কাহিনী গুরুমাকে জানাইল। স্কুলে বড় গুরুমা তখনও আসেন নাই।

যিনি এ ব্যাপারে পালের গোদা— তিনি বিচারার্থে ছোট গুরুমার টেবিলের সামনে আসিলেন।

রাজবাড়ির কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহে ভাগ্যক্রমে জন্মলাভ করায়, মেয়েটি স্বভাবতঃ ধরাকে সরাজ্ঞান করিত। নির্ভীক উগ্রতায় অজস্র মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল।

তাহার প্রভাবপুষ্ট আরও তিন চারিটি মেয়ে, তাহার পক্ষভুক্ত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হইল।

অকস্মাৎ ড্রয়ার হইতে বেত বাহির হইল! টেবিলে বেত আছড়াইয়া রুষ্ট স্বরে ছোট গুরুমা বলিলেন, "আমি তোমাদের কথা শুনব না। তোমরা সবাই মিথ্যে কথা বলছ। শৈল শুধু সত্যি কথা বলে, শৈল—এদিকে এস। বল, ঠিক কি কি হয়েছে?"

নগণ্য ছোট মেয়েদের দলভুক্ত হইয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া সভয়ে বিচার-কার্য নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ইহাদের অসম সাহসে অনর্গল মিথ্যা বলিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া, নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া, অতিশয় দীনতা বোধ করিতেছিলাম।

আমার পিতৃদেব কথায় কথায় আমাদের উপদেশ দিতেন, "খুন করে সত্য স্বীকার করে ফাঁসি যেও। তাতে আমি শান্তি পাব। কিন্তু মিথ্যে বলে প্রাণ বাঁচিও না। তা'হলে দুঃখিত হব।"

পিতার উপদেশ পালন করিতে গিয়া—সেই অভ্যাস যে স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, নিজে টের পাই নাই।

২

কিন্তু এত মেয়ের ভিড়ের মধ্যেও ছোট গুরুমা আমার সে অভ্যাসটুকু কি করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন জানি না। সুতরাং আকস্মিক আহ্বানে চমকিত হইলাম! নিজের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে সেইদিন প্রথম সচেতন হইলাম। অকপটে সত্য বলিলাম। আসামীরা মৃদু শাস্তির সঙ্গে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিল।

'পালের গোদা' সগর্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং ছোট গুরুমার 'কেলাসে' সেদিন ধর্মঘট করিয়া কাহাকেও যাইতে দিবে না—বলিয়া দল পাকাইল।

এক সময় আমাকে আড়ালে পাইয়া সে খুব উদ্ধতভাবে তর্জন গর্জন করিল। বলিল তাহার ক্ষমতাশীল অভিভাবকগণকে জানাইলেই ছোট গুরুমা কর্মচ্যুত হইবেন...ইত্যাদি। শেষে আমার পেন্সিল কাড়িয়া লইয়া জানাইল, আজ তাহাদের সঙ্গে ধর্মঘটে আমাকেও যোগদান করিতে হইবে।

ধর্মঘটের সংবাদ ছোট গুরুমার কানে পৌঁছিল। প্রশান্ত মুখে মৃদু হাসিলেন। নিজে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরা না পড়তে আসে, না-ই আসবে। তোমার পেন্সিল চেয়ে আন, তোমাকে আমি পড়াব-ই।"

ভগ্নদূতের মত গিয়া ভয়ে ভয়ে বিদ্রোহিণীদলকে আদেশ জানাইলাম। তাহারা আমাকে দলে না পাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর আদেশ গ্রাহ্য করিল! পেন্সিলটি ফেরত দিল।

সেদিন একাই ক্লাসে পড়িলাম।

পরদিন বিদ্রোহিণীরা বিনা বাক্যে ক্লাসে যোগদান করিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাহাদের বিশেষ মনোযোগ কোনকালে ছিল না,—হইলও না।

ছোট গুরুমা আমাদের ভূগোল, ইতিহাস পড়াইতেন। অঙ্ক ও বোনা এবং সেলাই শিখাইতেন। অঙ্ক আমার ভাল লাগিত না, কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন মুখের স্নেহোজ্জ্বল হাসিটুকু পুরস্কার পাইবার লোভ ছিল আমার প্রবল। উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেই—অঙ্কবিদ্যা ভাল লাগিল। তখন ঝোঁকের মাথায় ভীষণ অঙ্ক কসিতে লাগিলাম।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রত্যেক বৎসর আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার পাইতাম। একবার ওই শিক্ষাবিরোধী মেয়েগুলির প্রভাবে পড়িয়া কিছুকালের জন্য শিক্ষার উৎসাহে ঢিলা দিয়াছিলাম। যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে সেই অতি পরিপক্ক মেয়েগুলির বিপুল অভিজ্ঞতাব কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধচিত্তে সময় নষ্ট করিতাম। নিজের অবনতি নিজে লক্ষ্য করি নাই।

একদিন ছুটিব অবকাশ সময়ে ছোট গুরুমার ঘবে আসিয়া, বড় গুরুমা কি সব কথা মৃদুস্ববে আলোচনা করিতেছিলেন। তার মাঝে হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত ছোট গুরুমাব একটা কথা কানে পৌঁছিল—"ভেবেছিলাম, শৈল আমাব এবাব টেক্কার ওপর টেক্কা দেবে, কিন্তু এখন দেখছি, —শৈলর আর শেখার দিকে মনোযোগ নেই।" চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখ বেদনায় সকরুণ!

হৃদযে দারুণ আঘাত পাইলাম। আমায় তিনি এত ভালবাসেন। আমার জন্য তিনি বেদনা পাইতেছেন! মনে হইল, এর চেযে মরণ ভাল।

পরীক্ষা আসন্ন। কয়দিন প্রাণান্তিক চেষ্টায় খাটিলাম। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষকগণেব (তখন বাজ-কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদেব বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন ; শিক্ষয়িত্রীগণ সে সময় পর্দানশীন হইতেন) কেহ একজন খুশীর আতিশয্যে আমার পিঠ চাপড়াইয়া খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ফল বাহির হইলে দেখা গেল, পরীক্ষার পুবা নম্বর ৩০০ মধ্যে আমি ২৯৮ পাইয়াছি।

ছোট গুরুমা কিছুই বলিলেন না। সম্ভবতঃ বাহবা পাইলে আমি গোল্লায় যাইব. — বা অন্য মেয়েরা মনঃক্ষুণ্ন হইবে,—এ বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু তিনি সন্তোষের আতিশয্যে বিস্মৃত হইতেন না। বড় গুরুমারও এদিকে অপক্ষপাত গাম্ভীর্য ছিল। স্বভাবতঃ তিনি অতি ধীর, শান্ত ও স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার খুশী শুধু টের পাইতাম সেই দিন,— যেদিন বিনা-দৌবাত্ম্যে আমরা অল্প সময়মধ্যে ভালরূপে সকলে দৈনিক পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করিতাম। সেদিন শেষ ঘণ্টায় তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সরস-মিষ্ট ভাষায় রামায়ণ বা মহাভারত হইতে বাছিয়া বাছিয়া, নীতি ও ধর্মমূলক আদর্শ চরিত্রের গল্প বলিতেন। এই গল্পের প্রভাব আমাদের উপর খুব বেশী কাজ করিত। অর্থাৎ শেষ ঘণ্টায় ক্লান্ত মস্তিষ্কের পক্ষে আরামদায়ক—ভাল ভাল গল্প শুনিতে পাইবার লোভে আমরা উৎসাহের সহিত পড়াশুনা ঠিক করিয়া ফেলিতাম। গল্পের ভাল লোকগুলির মত নিজেরাও ভাল লোক হইবার জন্য মনে মনে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতাম। আমাদের মধ্যে কাহারও প্রতিজ্ঞা হইত— "আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে কোন বাজে কথা বলিব না"— কাহারও প্রতিজ্ঞা

হইত—"বাড়িতে গুরুজনদের প্রত্যেক আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব"— কাহারও প্রতিজ্ঞা হইত—"গাড়িতে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে পনের দিন কোন পথচারী ব্যক্তির মুখদর্শন করিব না" ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনায় সে বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষা পাইয়াছিলাম হয়ত অল্পই, কিন্তু অনাড়ম্বর সরলতায় সৎপ্রকৃতি গঠনেব উপযোগী সৎশিক্ষা পাইয়াছি প্রচুর। রাজবাড়ির আত্মীয় সম্পর্কীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের ক্ষত্রিয়কুমারী সে সময় বিদ্যালয়ে পড়িত। ইহাদের কাহারও কাহারও সহিত আমার গভীর অন্তরঙ্গতা ঘটিয়াছিল। তার মধ্যে জয়াদেবী (ইনি স্বর্গীয় মহারাজ আফ্‌তাবচন্দের মহিষীর বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠা ভগিনী) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ক্লাসে ঢুকিয়া ইনি সকলের আগে যত্ন করিয়া আমার পাশে স্থান লইতেন। তাঁহার স্বভাবে আভিজাত্যের সুকোমল সৌজন্যের সহিত এমন আশ্চর্য সরলতা ও সহৃদয়তা ছিল যে মুগ্ধ হইতাম। দুঃখের বিষয়, অল্প বয়সেই জয়াদেবী লোকান্তরিত হ'ন।

আমাদের বিদ্যালয়টি বহুকাল পরে স্থানান্তরিত হইয়া মহারাণী অধিরাণী গার্লস স্কুল নামে খ্যাতিলাভ করে। বর্তমানে উহা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে উহা অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে তাহা নাই। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রাণের স্নেহ ও শ্রদ্ধা যেখানে সজীব,—শিক্ষা সেখানে অত্যন্ত আনন্দময়। আজও মনে পড়ে, দৈবাৎ কোন কারণে যেদিন অভিভাবকগণ আমাকে বিদ্যালয়ে যাইতে দিতেন না, সেদিন মর্মান্তিক ক্লেশে অশ্রু সংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।

পাঠশালা, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৪৫

ভূমিকম্প

বাংলা ১৩৪০ সাল। তারিখটা পয়লা মাঘ।

তিথিটা সেদিন অমাবস্যা। সকালে নিত্য-ক্রিয়া জপাহ্নিক শেষ করে স্মরণ হল, আজ অন্ন সমস্যার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি,— অর্থাৎ রাঁধা-বাড়ার দুর্ভোগ আজ নাই। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ফল দুধ ছাড়া আর কিছু আমার প্রয়োজন নাই। আর সে প্রয়োজনটুকু মেটাবার ভার চাকর লছমণ বাবাজীর উপর।

লছমণকে ডেকে বাজার খরচের পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠালাম। চা প্রস্তুত করে পানান্তে নিশ্চিন্ত হয়ে শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করলাম।

পেনশেন-প্রাপ্ত বুড়া মানুষ আমি। একমাত্র পুত্র হরনাথ রেলওয়ে এ্যাসিসট্যান্ট ষ্টেশন মাস্টারের চাকরি নিয়ে সপরিবারে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। গৃহিণী বহুকাল পূর্বে লোকান্তরে গেছেন। অন্য আত্মীয়স্বজন কেউ নাই। মুঙ্গেরে বাসা ভাড়া করে চাকর নিয়ে একা থাকি। সাধন-ভজনের পাগলামি কিঞ্চিৎ আছে, অতএব নির্জনতায় আরাম

বোধ হয়। দৈবাৎ কখনও বিশেষ অসুস্থ হলে পুত্র ও পুত্রবধূ এসে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু হৈ-চৈ হট্টগোল সয় না। সুস্থ হলেই চলে আসি, নির্জনতার মাঝে। পুত্র-পুত্রবধূ উদ্বিগ্ন হয়, অনুযোগ করে। বুঝি, তারা চায় আমাকে কাছে রাখতে। কিন্তু লোকসঙ্গ, কোলাহল, সাধন-ভজনের ব্যাঘাত যে আমাকে পীড়িত করে, তা তারাও বোঝে। অতএব উভয়পক্ষ থেকে আপোস নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, অসমর্থ হলে উভয়পক্ষের কারও সেবার প্রয়োজন হলেই—তাদের কাছে যাব। অন্যথা নয়।

স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল। স্বপাক আহার, গঙ্গাস্নান, নির্বিঘ্ন সাধন-ভজনের মাঝে বেশ সুস্থ আছি। লছমণ চাকরটিও ভাল। কাজকর্ম নীরবে করে। কথা বলে শুধু বাইরের হুজুক মীমাংসার জন্য এবং আমার অন্যমনস্কতা ত্রুটি সংশোধনের জন্য। কৃতজ্ঞতা বোধ করি। লছমণ না থাকলে ঠিক সময়ে স্নানাহার করা, বা রন্ধন ব্যাপার গুছিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। যেদিন সে অসুস্থ হয় বা অনুপস্থিত থাকে, সেদিন আমাকে রন্ধনের চেষ্টা ছেড়ে শুধু ফল-দুধ খেয়ে থাকতে হয়। ব্যাপাবটা ভালই লাগে। শরীর হাল্কা থাকলে সাধন-ভজনের সুবিধা বোধ হয়।

কিন্তু কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়িটা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর সয় না। আমি বোধ হয় খেয়ালের ঝোঁকেই সময় সমষ বুড়া বয়সের পক্ষে, অনুপযুক্ত মাত্রায় উপবাসটা বেশী করে থাকি। ফলে দুর্বলতার মাত্রটা বেড়ে গিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। শয্যাশাযীও হই। তখন স্মরণ হয়, সাধন-ভজনেব পক্ষে সে অবস্থা সুবিধাজনক নয়। তারপর ভযে ভয়ে দেহযন্ত্রকে নিয়মিত আহার দিই। যথোপযুক্ত নিদ্রা বিশ্রামের ব্যবস্থা করি। সুস্থ হই সত্বর। তারপর অন্যমনস্কতার ঝোকে পুনশ্চ ভুল করতে উদ্যত হলেই, লছমণ সাবধানতার সঙ্গে আমাকে সামলে রাখে।

চাকরটি সৎ। তার মা, ভাই, ভাজ, এই পাড়াতেই থাকে। বাড়ীতে গিয়ে সে দু'বেলা খেযে আসে। শীত ও বর্ষার রাত্রে তাকে নিজের বাডীতে থাকতে বলি। শোনে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হোক, শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোক, খেয়ে বাত্রে আমার বাডীতে এসে ঘুমায়। ছেলেটার দুর্দশা দেখে ক্লেশ হয। রাগ করি। ধমক দিই। প্রত্যুত্তরে গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়— "ওখানে থাকলে রাতে আমার ঘুম হবে না। কেবল ভাবনা হয়, যদি আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যান! কে দেখবে তখন?"

ইচ্ছা হয জবাব দিই, "যিনি বিশ্ব চরাচরকে দেখছেন, তিনি আমার কথা ভুলে যাবেন, এটাই বা তোকে বললে কে?"

কিন্তু বলি না। বলা বৃথা। যে সর্বদ্রষ্টা, অদৃশ্য পবিদর্শকটির উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি বলে মনে করি, আমিও যে সময় সময় তাঁকে ভুলে যাই! সুদীর্ঘ জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সয়েছি, বহু অবস্থায় পডেছি, অনেক ধাক্কা খেয়ে টের পেয়েছি তিনি আছেন— আছেন! অত্যন্ত কাছে আছেন! আমরা ভুলে গেলেও কার সাধ্য তাঁকে ভোলায়!

কিন্তু সে গুপ্ত সংবাদ কি বাচনিক ভাষায় এই ছোট ছেলেটাকে বোঝাতে পারি? অসম্ভব! চুপ করে থাকি।

২

বহু বিলম্বে সেদিন লছমণ বাজার থেকে ফিরল। বাজারের জিনিসপত্র পাশের ভাঁড়ারঘরে রেখে আমার কাছে এসে হিসাব দিল। বললাম, "সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এত দেরী হল কেন?"

দেহাতি হিন্দিতে সে বললে, "বাবু, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এক রাশিতে সপ্তগ্রহ যোগ হয়েছিল?"

বাজার থেকে যেদিন সে বিলম্বে ফেরে, সেদিন কিছু না কিছু বাজার গুজবগত প্রশ্নের আক্রমণে আমায় বিব্রত করে। সুতরাং বিস্মিত বা বিচলিত হলাম না। যোগবশিষ্ট রামায়ণ বন্ধ করে বললাম, "সে সময়কার দলিল-দস্তাবেজ তো বাপু আমি দেখিনি। কাজেই বলতে পারলুম না। কিন্তু সপ্তগ্রহ যোগের কথাটা তুই শুনলি কার কাছে?"

"বাজারে ঘিউওয়ালার দোকানে বসে একজন জ্যোতিষী বলছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় একবার সপ্তগ্রহ যোগ হয়েছিল, সেই যোগের ফলেই নাকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটেছিল। আবার আজ সেইরকম সপ্তগ্রহ যোগ ঘটবে। এর ফলে না কি পৃথিবীতে ভয়ানক ভয়ানক অনেক কাণ্ড ঘটবে! কি হবে বাবুজি?"

তার কিশোর মুখে ভীতি ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটে উঠল।

চুপ করে রইলাম। অবকাশ সময়ে কিছু কিছু জ্যোতিষবিজ্ঞানের চর্চা করি। রাশি বিশেষে গ্রহ বিশেষের যাতায়াতের ফলাফল যে সত্যই বিস্ময়াবহ বৈচিত্র্যপ্রদ, তা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি। সমগ্র পৃথিবীর উপর এবং ব্যক্তিগত জীবনের উপর সে ফল দৃশ্যমান হতেও দেখেছি। এমন কি নিজের জীবনেও—বহু, বহুবার! ওইজন্যই তো আমার আজ সয় না আত্মীয়স্বজনের মায়া মমতা, সয় না সংসারের হট্টগোল, সয় না লোকসঙ্গ, সয় না রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বার্থনীতির উগ্র কোলাহল! তাই তো এই নির্জনতার মাঝে পালিয়ে এসে, খুঁজি জপ, তপ, ধ্যানের মাঝে চিত্তশুদ্ধি! খুঁজি আত্মজ্ঞান! উপলব্ধি করতে চাই আত্মার আত্মেতর পরম সুন্দরকে!

কিন্তু যাক সে কথা।

লছমণের কথা শুনে স্মরণ হল জ্যোতির্বিদগণের অভিমত। সত্যই আজ সেই দিন! মকর রাশিতে শনি পূর্ব থেকেই অধিষ্ঠান হয়েছেন। কিছুকাল ধরে আরও চার গ্রহ একে একে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর কাল গেছেন রবি, আজ সেখানে যাবেন চন্দ্র। একটা রাশিতে পাঁচটা গ্রহযোগ দেখেছি, ছয়টা গ্রহযোগ দেখেছি। কিন্তু সাতটা গ্রহ সমাবেশ হতে আমার জ্ঞানে কখনও দেখিনি। যোগটা অদ্ভুত! কে জানে এর ফলে পৃথিবীতে কতজনের কত আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয় বা ভাগ্য পরিবর্তন ঘটবে! কত রাজ্য সাম্রাজ্যও হয়তো উলটে পালটে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হল গত ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় সিংহ রাশিতে সূর্যগ্রহণের কথা। যে গ্রহণটা জ্যোতিষবিজ্ঞানের মতে খুব বিশেষত্বসূচক। জ্যোতিষীরা সে গ্রহণের ফলাফল গণনা করে খুব গণ্ডগোল করেছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দু জ্যোতিষীরা। তাঁরা তো অকুতোভয়ে বলে বসেছেন এইরকমভাবে স্থির রাশিতে সূর্যগ্রহণের ফলে, ছয়মাস মধ্যে পৃথিবীর কোথায় কোথায় কবে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে, তার সন-তারিখের

ঐতিহাসিক হিসাব! পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা কেমন করে ও কি করে ভূমিকম্প ঘটে, তার হিসাব বেশ দেখান। কিন্তু কবে ঘটবে তা বলতে পারেন না। সে বিষয়ে দক্ষতা দেখি আমাদের হিন্দু জ্যোতিষীদের।

অবশ্য সে সূর্যগ্রহণের পর পুরা পাঁচমাস কেটেছে। আশপাশের কারও কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখিনি। কিন্তু ছয়মাস তো এখনো কাটেনি। সেটা স্মরণ রাখা উচিত।

তার উপর আজ সপ্তগ্রহ যোগ!

মনটা বিষণ্ণ হল। কিন্তু কিশোর লছমণ বেচারাকে সান্ত্বনা দেওয়া চাই।

একটু হেসে, অর্থাৎ হাসবার চেষ্টা করে বললাম, "কি আর কচু হবে? পৃথিবী যেমন চলছে, তেমনি চলবে। বড় জোর যাদের ভাগ্য ফলন্ত, তাদের সৌভাগ্য উথলে উঠবে। আর দুর্ভাগাদের দুঃখের আর একটু বাড়বাড়ন্ত হবে। সে তো হয়েই আছে, ভাবনা কি?"

একটু চুপ করে থেকে সে বললে, "চলুন বাবুজি, আমরা দাদাবাবুর কাছে যাই।"

তার দাদাবাবু—আমার পুত্র। বিস্মিত হয়ে বললাম, "কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করে সে বললে, "যদি আপনার সাংঘাতিক অসুখ বিসুখ কিছু হয়—"

"হতে পারে। তাতে কি হয়েছে? পৃথিবীসুদ্ধ সকল লোকের জন্যই দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। শুধু আমার জন্য চিন্তা কেন?"

"আপনি বুড়া মানুষ। যদি—"

"যদি কি?"

"যদি মারা যান—?"

"মৃত্যুর জন্য প্রত্যেক মানুষেরই প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা উচিত। এতে 'যদি'-র বালাই নাই। তার জন্যে অনর্থক দৌড়-ঝাঁপ ছুটাছুটি করা এই ক্লান্ত দুর্বল দেহে পোষাবে না। মরি এখানেই মরব।"

ব্যাকুল হয়ে সে বললে, "আমি—আমি তাহলে কি করব?"

হেসে বললাম, "কিছু না। মরবার সময় আমাকে শুধু শান্তিতে মরতে দিস। কেঁদে কোকিয়ে গোলমাল করিসনি। তাহলে আমার মরার আরামটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝলি?"

"বুঝেছি। আচ্ছা বাবু, মরাটা কি?"

"এ-ঘর থেকে, ও-ঘরে যাওয়া! আবার কি?—যা, খেয়ে আয় বাড়ী থেকে। আমি গঙ্গাস্নান করতে চললাম, তুই চাবি দিয়ে যা।"

"চলুন আমিও গঙ্গাস্নান করব। আজ অমাবস্যা...।"

"তোর মাকে বলে আয় তাহলে। ফিরতে দেরী হবে, অনেকটা পথ। তারা তোর খাবার নিয়ে বসে থাকবে। হয়তো ভাববে।"

"আচ্ছা। একটু সবুর করুন। আমি ছুটে গিয়ে মায়িকে বলে আসি।"

পট্টবস্ত্র ও গরম গায়ের কাপড় কাঁধে ফেলে, গীতা ও জপের মালা নিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে বেরুলাম। লছমণ বাড়ীতে খবর দিয়ে অল্পক্ষণ পরে ছুটতে ছুটতে এসে সঙ্গ ধরল।

৩

কষ্টহারিণীর ঘাটে গিয়ে স্নান করে ভিজা কাপড় ছাড়লাম। পট্টবস্ত্র পরে, গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে ঘাটের উর্ধ্বাংশে একপাশে বসে গীতা পাঠ করতে লাগলাম।

বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পাঠ করছি। হঠাৎ অনুভব হল আমার সর্বাঙ্গ মৃদু কম্পনে দোল খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার মাথাটা যেন ঘুরছে!

বিস্মিত হলাম! বেলা ২টা বেজে গেছে, এখনো খাইনি বলে কি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি? উপরের সিঁড়িটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে এদিক ওদিক তাকাবার চেষ্টা করলাম। মনে হল মাথাটা যেন উত্তরোত্তর বেশী ঘুরছে।

হঠাৎ পৃথিবী যেন কেমন কেমন হয়ে উঠল। নির্জীব ধরিত্রী সহসা জীবন্ত আস্ফালনে অধীর মত্ততায় টলমল করে উঠলেন। মাটীর অভ্যন্তরে একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা কামান গর্জন করে উঠল। ছুটল যেন শত শত রেলগাড়ীর ইঞ্জিন পায়ের নীচে পূর্ণ বেগে! গুড় গুড় গুড় গুড়ুম! গুড়ুম! গুড় গুড় গুড় গুড় গুম—গুড় গুড় গুড়।

চলল শব্দ অবিশ্রান্ত! মনে হল আকাশের যেখানে যত বজ্র আছে, সব একসঙ্গে মাটীর উপরে ও নীচে প্রচণ্ড গর্জনে পরস্পরকে হিংস্র আক্রোশে আঘাত করছে!

কি ভয়াবহ শব্দ চারিদিকে। কানে তালা ধরে গেল! সামনে গঙ্গার জলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা তুলে ঝাঁপিয়ে এসে কয়েকটা সিঁড়ি ডুবিয়ে দিলে। জল আবার সরে গেল, আবার তেড়ে এল। গঙ্গা রীতিমত লম্ফঝম্প করছেন যে, হতভম্ব হয়ে গেলাম। হল কি! একসঙ্গে গোটা পৃথিবীর জলমাটী সবাই ক্ষেপে গেল? ঘাটের অনড় অচল সিঁড়িগুলা যে ঘুরন্ত লাট্টুর মত বনবন্ করে ঘুরছে। গঙ্গা যে লাফাতে লাফাতে ক্রমশঃ উপরদিকেই ধাওয়া করে আসছেন! ব্যাপার কি?

বোধ হয় গড়াতে গড়াতে এসে লছমণ আমাকে জড়িয়ে ধরলে। আতঙ্ক-শুষ্ক কণ্ঠে বললে, "ধরতি টলতা, ধরতি টলতা। মাট্টী পাকড়েকে বাবুজী।"

ওঃ তাই! ভূমিকম্প! হেঁট হয়ে দু'হাতে মাটী চেপে ধরলাম।

কিন্তু না, এ তো কম্পন নয়, নর্তন নয়। এ যে মল্লযুদ্ধ! ধরিত্রী যে আগে ছুটছে, পিছে হটছে ; লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে! কার সঙ্গে যেন কুস্তি লড়ছে! অথবা রুদ্ধ বেদনায় কিংবা ক্ষিপ্ত ক্রোধের উচ্ছাসে ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় সেটা হয়তো যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত ধরিত্রীর নিভৃত মর্মকেন্দ্রসঞ্চিত, দারুণ প্রাকৃতিক বিষবাষ্পের বিস্ফোরণ! কিন্তু দার্শনিকের ভাষায় বা কবির ভাষায় বোধ হয় এটাকে বলা উচিত রুদ্ধ কারা ভেঙে বিশাল শক্তিশালী দানবের দল হুহুংকারে গর্জন করে বেরিয়েছে। শোনা যাচ্ছে অবিশ্রাম শব্দ— গড় গড় গড় গড়াম! গড়াম!... দড়াম দড়াম্ দড়াম্! ভাঙছে ওরা পৃথিবীকে।

লাল বাষ্পজালে সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়ে গেল!

চিন্তাশক্তি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। স্তম্ভিত মূঢ় চিত্তের মাঝে সপ্তগ্রহযোগের স্মৃতিটা অস্পষ্টভাবে স্মরণ হল। পৃথিবীর জড় অণু-পরমাণুগুলা কি হাতুড়ি, বাটালি, কুড়ুল, শাবল নিয়ে সজীব হয়ে উম্মত্ত-বিক্রমে পৃথিবীটা চুরমার করে ফেলছে? কিম্বা সাতটা গ্রহ একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করে, পৃথিবীর ঘাড়ের উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল? হল কি?

আতঙ্কেই বোধ হয় লছমণের চৈতন্য লোপ হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে আমার পাশে লুটিয়ে পড়ল। তার মাথাটা কষ্টে-সৃষ্টে টেনে কোলে তুলে নিলাম। নিজেরও মাথার ভিতর সব গোলমাল হয়ে আসছিল। হঠাৎ খুব জোর একটা ঝাঁকুনি মাটীর ভিতর থেকে ঠেলে উঠল। মাথা আরও ঘুরে গেল, দুর্বল স্নায়ুমণ্ডলী বিহুল বিবশ হয়ে গেল। আমারও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল।

ভিতরে ভিতরে মৃদু অনুভূতি অন্তরলোকের চেতনাকে স্পর্শ করল,— ফিরে গেছি সুদূর অতীতের শৈশবে। মায়ের স্নেহময় কোলে শুয়ে নির্ভয়ে সানন্দে দোল খাচ্ছি- দোল—দোল—দোল!

আরামের আবেশে মনে হল ঘুমিয়ে পড়লাম।

৪

কতক্ষণ পরে জানি না, জ্ঞান ফিরে এল। চোখ তখনও খুলতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমি যেন অনড় অচল পাষাণস্তূপে পরিণত হযেছি।

এই কি মৃত্যু?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মূর্চ্ছাহত লছমণের কথা। তাই তো, সে কোথা? বেচারা বেঁচে গেছে কি? আহা বাঁচুক, মায়ের বাছা!

মনে হল, আমি মরেই গেছি। যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভাবতেও স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, প্রকৃতিব কি নিদারুণ উম্মত্ততা-লীলা দেখেছি।

অজ্ঞাত সংস্কার বশে আপনা আপনি জিহ্বা উচ্চারণ করলে, "আমাদের এখানে তো এই পর্যন্ত হল। সপ্তগ্রহ যোগের ফলে, আজ আরও কত জায়গায় যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটল—"

সহসা সচেতন হয়ে অনুভব করলাম *ঠোঁট* নড়ছে, জিহ্বা কথা বলছে, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে আমার ধ্বনি বেরুচ্ছে না। খুব স্নায়বিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছে কি?

ধীরে ধীরে মাথা আরও পরিষ্কাব হয়ে এল। সেই অদ্ভুত ভয়াবহ আন্দোলন ও গর্জনের স্মৃতি স্মরণ হল। স্তম্ভিত চিত্তে বিহুলভাবে খানিক ভেবে বললাম, "কে ঘটালে এমন সর্বনেশে কাণ্ড?"

প্রশ্নটা বোধ হয় নিজেকেই নিজে করেছিলাম। উত্তরের প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কানে পৌঁছাল এক গম্ভীর মধুর শান্ত কণ্ঠস্বর:

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট! ময্যের বিশন্ত্যো মদ্বিভূতযঃ॥'

মনে হল্ নিস্তেজ নির্জীব স্নায়ুমণ্ডলীতে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা লেগে গেল। তীক্ষ্ণ মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলাম। মনে হল পেয়েছি আমার বিস্ময় বিমূঢ় প্রশ্নের উত্তর! সত্যই তো 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—! ঠিক! এ জগতে একমাত্র তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় শক্তি আর কি আছে? একমাত্র তিনিই তো অনন্ত সংসারে বিরাজমানা।

চোখ চাইলাম। চোখে ঠেকল অস্পষ্টভাবে—এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী অদূরে বসে

চণ্ডীপাঠ করছেন। আমি শুয়ে রয়েছি অজ্ঞাত স্থানে একটা টিনের ঘরে। পৃথিবী এখন শান্ত স্থির।

পায়ের কাছ থেকে মৃদু স্বরে কে ডাকলে—"বাবুজি।"

চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম লছমণ ডাকছে। হাত বাড়িয়ে বললাম, "লছমণ? কাছে আয়।"

লছমণ কাছে এসে বসল। চশমাটা এনে আমার চোখে পরালো। তারপর নীরবে আমার হাতে হাত বুলাতে লাগল। কথা কইলাম না। চণ্ডীপাঠ তখনও চলছিল, কান পেতে তাই শুনতে লাগলাম। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগল শুধু সেই একছত্র —"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা।"

চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত করে সন্ন্যাসী এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, "হাঁ করুন, এবার দুধ খান।"

তিনি ফিডিং কাপে করে অল্প অল্প দুধ আমার মুখে ঢেলে দিলেন। পানান্তে বুঝলাম শুধু দুধ নয়, তাতে ব্র্যাণ্ডিও মেশানো আছে। বিস্মিত হয়ে বললাম, "এটা কি সরকারী হাসপাতাল?"

"না, এটা আমাদের অস্থায়ী সেবাভবন।"

"কদিন আমি এখানে আছি?"

"চারদিন। আপনার ভাগ্য ভাল ফাঁকা জায়গায় ছিলেন। বাড়ীতে থাকলে পিষে মারা যেতেন। এ শুধু শক লেগেছে।"

"বাড়ী পড়ে গেছে আমার?"

"শুধু আপনার নয়, গোটা মুঙ্গের শহরসুদ্ধ সবাইকার। জামালপুর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রেললাইন বেঁকেচুরে তেউড়ে গেছে। টেলিগ্রাফের তার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। খবরাখবর বাইরের পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নেপাল-টেপালের অবস্থা যে কি হয়েছে, তা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।"

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, "লছমণ, তোর বাড়ীর সবাই কেমন আছে?"

শুষ্কস্বরে, খুব সহজভাবে সে বললে, "সব মরে গেছে বাবু। মায়ি, ভাই, ভৌজি, কেউ বেঁচে নেই।"

ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম পিঠের নীচে ধরিত্রী টলমল করছেন। টিনের ঘর ঝনঝন শব্দে কাঁপছে। শুনলাম কোলাহল : "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প! সবাই বাইরে বেরিয়ে পড়।"

জড়িত স্বরে বললাম, "বাইরে যা লছমণ।"

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে চৈতন্যহীনতার মাঝে ডুব দিলাম। অলক্ষিতে অন্তশ্চেতনার অঙ্কে আবার সেই ক্ষীণ অনুভূতি জাগল, মায়ের কোলে শুয়ে দোল খাচ্ছি—দোল—দোল —দোল।

সত্যই কি বিরাট প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের মাঝেও আমরা মায়ের কোলে রয়েছি? এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

অন্তরের অন্তস্তলে উদাত্তকণ্ঠে কে বলে উঠল, "একৈবাহং জগত্যত্র...।"

অপূর্ব শান্তিতে প্রাণ ভরে গেল। মনে হল নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৫

ক্রমে সুস্থ হলাম।

দিনের মাথায় দশ পনেরবার মৃদু ভূকম্পন তখনো চলছে।

চারিদিকে ত্রাস। চারিদিকে সর্বস্বান্তঃ মানুষের শোকার্ত হাহাকার। যাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, তারা উত্তর বিহার ছেড়ে যে যেখানে পারছে, চলে যাচ্ছে। বাকী সকলে খোলা মাঠে তাঁবু বা কম্বল টাঙিয়ে টিনের ছাউনি তুলে, অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

খবর আসতে লাগল, শুধু মুঙ্গের নয়—পাঁচ মিনিটের সেই প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে বারোটা সুবৃহৎ জেলা ফুটিফাটা হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। মরেছে লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা।

দিনের পর দিন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জেলাগুলি থেকে বিস্তারিত খবর আসতে লাগল। বিস্ময়ের সীমা রইল না। কল্পনাতীত মাত্রায় ধন-প্রাণহানি!

ভূমিকম্পের ধাক্কায়, যারা বাড়ী চাপা পড়েনি, কোনমতে বেঁচেছে যারা, তারা সবাই দেখছি কেমন যেন হতবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন কাটছে, তবু তারা ভেবে ঠিক করতে পারছে না, যে ব্যাপারটা কি হল?

আশ্চর্য ব্যাপার! সহজ অবস্থায় দেখেছি আমার সামান্য অসুখের চিন্তায় লছমণ অধীর হত। রাত্রে ভয়ে ঘুমাতে পারত না। কিন্তু এখন সবচেয়ে প্রিয় আত্মীয়দের মৃত্যুতে দেখছি—সে আশ্চর্যরকম স্থির। ওদের মৃত্যুশোক যেন তার অসাড় চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করতে পারেনি। সে কাঁদতে ভুলে গেছে, নিঝুম হয়ে বসে বসে শুধু ভাবে। প্রশ্ন করলে জবাব পাই—"ভাবছি বাবুজি, কি করে এমন হল?"

সেই এক প্রশ্ন! প্রত্যেকের মুখেই প্রত্যহ শুনছি ওই এক কথা!

ছেলেটাকে চোখে-চোখে রাখি।

হরনাথ ছুটি নিয়ে বাংলা দেশ থেকে এসে উপস্থিত হলেন। আর কোন ওজর আপত্তি চলবে না। এবার আমাকে এবং লছমণকে তার সঙ্গে যেতেই হবে। সে এখন হুগলী না মগরা কোথাকার ষ্টেশন মাষ্টার হয়েছে। তার কোয়াটারের কাছেই আমার জন্য নিরিবিলি একটা বাসা ঠিক করে দেবে...ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ব্যবস্থা সে স্থির করেছে জানালে।

সরকারি লোকজনের সাহায্যে তখন স্থানে স্থানে ধ্বংসস্তূপ অপসারণ কার্য চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সে সাহায্য—পাদ্য-অর্ঘ্য মাত্র। ১৪দিন কেটে গেছে, এখনো ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সব শবদেহগুলি উদ্ধার করা হয়নি। গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে এক একটা পাড়ায় পথ চলা দুষ্কর।

হরনাথের বলিষ্ঠ বাহু অবলম্বন করে লছমণ ও জনকতক কুলিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম নিজের বাসার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জিনিষপত্র কিছু উদ্ধার করতে। ঘর কয়খানার ছাপ্পরের চাল ও পাকা দেওয়াল বেশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েই পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে আছে। পাড়াসুদ্ধ সব ঘরবাড়ী, দোকানগুলির সেই এক অবস্থা।

অনেক কষ্টে ধ্বসস্তূপ সরিয়ে টাকার বাক্স ও কাপড়-চোপড়ের বাক্সটা তোবড়ানো দোমড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেল। বিছানা, বাসন সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা যৎকিঞ্চিৎ ভাল ছিল, গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিলাম।

দোমড়ানো টাকার বাক্সটা খুলে দেখলাম তিনশো তের টাকা ঠিকই আছে। আশ্চর্য! চোদ্দ পনেরদিন ধরে এতগুলো টাকা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পোঁতা আছে, কেউ টের পায়নি!

আমি নিজেও তো এগুলার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হরনাথ এসে এগুলার কথা স্মরণ করালেন, তাই মনে পড়ল।

মনে হল এ তো তুচ্ছ কয়েকটা টাকা। কত লোকের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পদ এখনো ধ্বংসস্তূপের নীচে রয়েছে। সম্পত্তির অধিকারীরাও অনেকে সেইসঙ্গে ইহলীলা শেষ করেছে। কে তার খবর রাখে?

ধ্বংসস্তূপ সরাতে সরাতে কুলিরা বলাবলি করতে লাগল, এই বস্তির ফেকু পাঁড়ে চানাচুরওয়ালার মৃতদেহ ক'দিন আগে ইসমাইল মুদির দোকানে পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের সময় সে ইসমাইলের দোকানে তেল, নুন, মরিচ ইত্যাদি কিনতে এসেছিল। অকস্মাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ঘরদোর ভেঙ্গে ক্রেতা-বিক্রেতার ঘাড়ে পড়ে। দুজনেই মারা গেছে। মৃতদেহ দুটা যখন উদ্ধার করা হল, তখন দেখা গেল তেল নুন মরিচ পাশে পড়ে রয়েছে। মৃত ইসমাইলের বুকে মাথা গুঁজে ফেকু চিরনিদ্রিত।

ফেকু ও ইসমাইল এ-পাড়ার বাসিন্দা। দুজনকেই চিনতাম। দুজনেই দুজনের পণ্যের খরিদদার। ভাবও ছিল মন্দ নয়। কিন্তু আড়াআড়িরও অন্ত ছিল না। ফেকু চানাচুরের পাত্র কাঁধে নিয়ে দ্রুততালে ছড়া কেটে হাঁক দিয়ে যেত :

চানা বানাওয়ে ধীর
খাতে রাম লছমণ বীর
মারে মেঘনাদকে তীর...

তার পরের ছত্রটা স্মরণ নাই। তবে তার ফলেই যে নিঃসন্দেহে শত্রু নিপাত, তা মনে আছে। ইসমাইল তার ছড়ার উত্তরে বিদ্রূপ করে বলত, ফেকুর চানাচুরের যখন এতখানি পরাক্রম, তখন চানাচুর সমেত ফেকু পাঁড়েকে পুঁতে ফেলাই কর্তব্য। তাতে চানাচুরের গাছ গজানো উচিত আর সে গাছে অবশ্যই গণ্ডা গণ্ডা ফেকু পাঁড়ে ফলবে!

তুচ্ছ রসিকতার উত্তরে গঞ্জিকাসক্ত ফেকুর উষ্ণ মস্তিষ্ক ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়ে উঠত। চলত মর্মান্তিক বচসা, শেষে ফেনিয়ে উঠত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের গরল। মাঝে পড়ে কতবার দুই গোঁয়ারকে থামিয়েছি, তার হিসাব নাই। ওদের মূঢ়তা দেখে হাসিও পেত, দুঃখও হত।

তারা আজ সাম্প্রদায়িক দলাদলি ভুলে, গলাগলি করে দেহত্যাগ করেছে ভূমিকম্পে! এই তো ক্ষণভঙ্গুর জীবন! তবু মানুষ পার্থিব ক্ষমতার দর্পে কত ভুল, কত অন্যায় করে!

মজুরদের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার মিটিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরলাম। টাকাগুলা

পকেটে নিয়ে ভাঙা বাক্সটা ফেলে দিলাম। লছমণ কাপড়ের ট্রাঙ্কটা নিয়ে চলল।

মোড়ের মাথায় পৌঁছেছি, বিপরীত দিক থেকে এক ডুলি চেপে এসে তারিণী মুখুজ্যে উপস্থিত। তার বাঁ হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে গলার সঙ্গে বাঁধা। ডুলি থামিয়ে সে নেমে বললে, "দীনুকাকা, কোথায় ছিলেন এতদিন?"

বললুম। পাল্টা প্রশ্ন করে জানলাম, তার বাড়ীর সবাই প্রাণে বেঁচেছে, তবে অনেকেই আহত। তার বাঁ হাতটা পাঁচিল চাপা পরে ভেঙে গেছে। হাসপাতালে ছিল ক'দিন। আজ ফিরল।

আরও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির ধন-প্রাণহানির খবর দিয়ে সে বললে, "চন্দ্র চাটুজ্যের খবর শুনেছেন? স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানীওলা চন্দ্র চাটুজ্যে? যাঁর লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার কিনেছিলেন আপনি? আর আপনার দেখাদেখি শেয়ার কিনে ডুবেছিলাম আমরা? মনে পড়ে?"

অতিশয় লজ্জিত হলাম। দশ-বারো বছর আগের কথা। দেশপ্রেমের বন্যায় দেশ ভরে গিয়েছিল সেদিন। ভাবপ্রবণতার উদ্দাম দাপটে সেদিন অনেক কিছু অঘটন ঘটে গিয়েছিল। গরীব কেরাণী আমি। বেশী কিছু করার সামর্থ্য ছিল না। ওকালতি ব্যবসায় ব্রতী চন্দ্র চাটুজ্যে ওকালতি ছেড়ে স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, দেশহিতের জন্য খুললেন স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানী, দিলেন দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, তার দ্বারাই দেশের পরাধীনতা ঘুচবে। অংশীদাররা পাবে মোটা লাভ। কেরাণী জীবনের যথাসর্বস্ব পুঁজি দেশোদ্ধারের ব্যবসায় সমর্পণ করলুম। আমার দেখাদেখি পিতৃহীন বালক তারিণীও তার পৈতৃক নগদ টাকাগুলি দেশোদ্ধারে উৎসর্গ করলে।

আরও অনেকে—এমন কি সামান্য অবস্থার ভদ্র বিধবারাও গভীর বিশ্বাসে তাঁদের জীবনের শেষ সম্বল লিমিটেড কোম্পানীর হাতে দিলেন। তারপর কোম্পানীর আর সাড়াশব্দ নাই। চন্দ্র চাটুজ্যেও নিরুদ্দেশ। আইন ভূত বাঁধন ছাঁদন পরিষ্কার ছিল। কোম্পানী ফেল হলে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল—কেউ দায়িক হতে বাধ্য নয়।

দীর্ঘকাল পরে চন্দ্র চাটুজ্যে বিপুল ধনের অধীশ্বররূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি তখন কাউন্সিলের মেম্বার। উত্তর বিহারের বড় বড় শহরে বিস্তর বাড়ী ভাড়া খাটছে তাঁর। একমাত্র বাড়ীভাড়ার আয় তখন বাৎসরিক বারো-চৌদ্দ হাজার টাকা। শোনা গেল কোনও অজ্ঞাত বিদেশে ব্যবসা করে তিনি প্রচুর উপার্জন করেছেন।

কিন্তু স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানী?

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিরক্তভাবে চন্দ্র চাটুজ্যে জানালেন, তিনি সে কোম্পানীর সম্বন্ধে তো কিছুই জানতেন না। নেহাৎ স্বদেশী নেতাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে নাম সহি মাত্র করেছিলেন। সে-সব টাকা নিয়ে নেতারা কি করেছেন না করেছেন তিনি তার কিছুই জানেন না।

নেতাদের ধরে গরীবদের টাকা উদ্ধার করে দেবার জন্য ধরাধরি করা হল। জবাব দিলেন,— এবার বাংলায় নয়, ইংরেজি ভাষায়— "Impossible!"

হতাশ হলাম। আত্মগ্লানির সীমা রইল না। আমার মূঢ়তার ফলে শুধু আমিই সেদিন

সর্বস্বান্ত হইনি, আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেক অসহায় নাবালক ও বিধবা ডুবল! আমার অপরাধ অন্তহীন!

তারপর প্রচুর পরিশ্রমে আমিও সামলেছি, তারিণীও মাথা তুলেছে। বিধবারাও অনেকে মরে বেঁচেছে। নিতান্তই যারা মরতে পারেনি, তাদের দুর্দিনে কিছু কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি কোনদিন।

তারিণীর প্রশ্নে মনে পড়ল সবই!

বললাম, "চাটুজ্যেবাবুর তো ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। এখন তো উত্তরোত্তর উন্নতির অবস্থা। আশা করি তিনি সপরিবারে ভালই আছেন?"

তারিণী বললে, "আজ সকাল পর্যন্ত ভালই ছিলেন। তবে লিমিটেড কোম্পানীর অন্তর্হিত টাকায় যে ইমারৎগুলি গাঁথা হয়েছিল, ভূমিকম্পে তার সবগুলিই কেউ ধ্বসেছে, কেউ গুঁড়িয়ে গেছে। আজ সকালে মিস্ত্রি-মজুরদের নিয়ে একটা ধ্বস্ ছাড়া বাড়ী মেরামত করতে ঢুকেছিলেন। মিস্ত্রিরা একদিকের দালানের ছাদে ঘা দিতেই হঠাৎ ফের ভূমিকম্প! সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকের দালানের ফাটা খিলান হুড়মুড় করে ভেঙ্গে তাঁর মাথায় পড়েছে। মাথার খুলি চুরমার হয়ে মারা গেছেন।"

হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর পকেট থেকে তিনশো টাকার নোট বের করে, তারিণীর পকেটে গুঁজে দিয়ে শ্রান্তকণ্ঠে বললাম, "তোমার হাতটার ভাল করে চিকিৎসা করাও বাবা। লিমিটেড কোম্পানীর টাকাটা থাকলে আজ দুর্দিনে তোমার কত উপকার হত। আমার দোষেই তোমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। উপায় নাই। এ টাকাটা আজ মাটী খুঁড়ে পেয়েছি। তোমার কাজে লাগাও।"

বিস্মিত হয়ে তারিণী বললে, "দুর্দিন তো সবাইকার। আপনারও তো খরচ আছে কাকা। আপনার অসুবিধা হবে যে।"

সহাস্যে হরনাথকে দেখিয়ে বললাম, "এর হাত দিয়েই আমার সুবিধার ব্যবস্থা উপরওলা করে দিচ্ছেন। কিছু ভেবো না। লছমণের মা, ভাই সবাই মারা গেছে। ওকে নিয়ে হরনাথের সঙ্গে আজ বাংলা দেশে চললাম। যাও বাবা, আত্মীয়স্বজনদের দেখ গিয়ে।"

তাকে অন্য প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে পাশের গলির মধ্যে ঢুকলাম।

সর্বনাশা ভূমিকম্প আমার মত বার্ধক্য-দুর্বল অসহায় গরীবের অনুভূতিতে জাগাল মাতৃক্রোড়ের সস্নেহ নির্ভয় দোল খাওয়ার স্মৃতি। আর প্রবল প্রতাপ লক্ষপতি চন্দ্রবাবুর অত স্বাস্থ্যশক্তি, সহায় সম্পদ সত্ত্বেও, অত চমৎকার বুদ্ধিভরা মাথাটা...!

মনের মধ্যে-গুঞ্জন করে উঠল চণ্ডীর শ্লোক! নমস্কার মহামায়ার মায়াকে!

অর্চনা, কার্তিক ১৩৫৩

নিরঞ্জন সর্দার

১

প্রায় একশত বৎসর আগের কথা। তখন বর্ধমান জেলা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বর্ধমানের বিখ্যাত দামোদর নদে তখনও 'বাঁধ' হয় নাই। দেশে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় নাই। দেশের নর-নারীর স্বাস্থ্য ছিল সুদৃঢ় মজবুত। তাহার খাইতে পারিত, এবং সহজেই খাইতে পাইত,—যথেষ্ট নির্ভেজাল খাদ্য। হজম করিতে পারিত নির্বিঘ্নে। হাঁটিতে ও খাটিতে পারিত প্রচুর।

দেশে তখনও রেলগাড়ী হয় নাই। পুলিশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাযেই দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব। অতএব আত্মরক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শারীরিক শক্তি-চর্চা করাটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। লাঠি ও তরবারি চালনার কৌশল শ্রদ্ধার সহিত শিখিত। ধনীগণ ছিলেন কতকটা অলস প্রকৃতির। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের মর্যাদা তাঁহারা বুঝিতেন। তবে স্বহস্তে লাঠি ধরাটা অপমানের বিষয় মনে করিতেন। অতএব তাঁহারা আত্মরক্ষা ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য, পয়সা খরচা করিয়া লাঠিয়াল ভৃত্য বাখিতেন। প্রত্যেক ধনী, ব্যবসায়ী, পল্লী-জমিদারগণ সর্বদা এরূপ দুই দশটি লাঠিয়াল পুষিতেন। ইহাতে সাধারণের চক্ষে তাঁহাদের সম্ভ্রম বাড়িত এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন। এমন কি, ইঁহাদের আত্মীয়, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, ভক্ত, অনুরক্তগণও এই লাঠিয়ালগণের নামের দোহাই দিয়া অনেক সময দুষ্টলোকের উৎপাত হইতে নিস্তার পাইত।

এই লাঠিয়ালগণ সকলেই প্রায় নিম্নশ্রেণীর লোক। পুরুষানুক্রমিক শক্তি-চর্চার ফলে ইহাদের অস্থি-পেশী যেমন সুদৃঢ় সবল ছিল, মনে সাহস ও জেদের প্রাচুর্য ছিল তেমনি প্রবল। কিন্তু রাগিলে ইহাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হইত। তখন ইহাদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সীমা থাকিত না। তুচ্ছ কারণে সে-সময় অপরের কাঁচা মাথা লইতে ইহাদের কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। নিজের মাথার উপরও দরদ থাকিত না। যাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কবিত, তাঁহার আদেশে ইহারা অকুতোভয়ে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইত। যাঁহার অন্ন খাইত, প্রাণ থাকিতে তাঁহার তিলমাত্র ক্ষতি হইতে দিত না।

ইহারা লেখাপড়া শিখিবার কিছুমাত্র সুযোগ পাইত না। সাধারণ যাত্রাগান, কথকতার আসর ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র সুশিক্ষা পাইবার সুবিধা ছিল না। তবু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সরল নৈতিক চেতনা সতত জাগরিত থাকিত। যেমন, প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা এবং আজ্ঞানুবর্তিতা।

ঐই খেলোয়াড় লাঠিয়ালগণের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, তাহারা 'সর্দার' আখ্যা লাভ করিত।

এমনি একজন 'বাছের-বাছ জোয়ান', বিখ্যাত খেলোয়াড় লাঠিয়াল ছিল, নিরঞ্জন সর্দার। সে লম্বায় ছিল, সাড়ে-সাত ফুট, চওড়াও ছিল তদুপযুক্ত। তাহার অস্থি-পেশী ছিল লোহার মত শক্ত। ঝুনা নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া, উপর-উপর তিনটা নারিকেল রাখিয়া সে এক মুষ্ট্যাঘাতে তিনটা নারিকেল ভাঙিত। গোটা সুপারি মুখে ফেলিয়া দাঁতের

জোরে অবলীলাক্রমে সুপারি গুঁড়াইয়া ফেলিত।

জাতিতে সে ছিল ব্যগ্র-ক্ষত্রিয়। চলিত ভাষায় এ দেশে উহাদিগকে 'বাগদী' বলা হয়।

নিজের গ্রাম হইতে প্রায় পনেরো ষোলো ক্রোশ দূরে, এক জমিদারবাবুর বাড়ীতে সে লাঠিয়ালের কাজ করিত। তাহার প্রতাপে সে অঞ্চলে চোর-ডাকাতের দল স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিত।

নিজের গ্রামের বাড়ীতে নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা, নিরঞ্জনের স্ত্রী এবং একটি শিশুপুত্র থাকিত। নিরঞ্জনেব ছোটভাই ঘরে জমিজমা লইয়া চাষ-বাস করিত। তাহারও স্ত্রীপুত্র ছিল। তাহার উপর সংসারের তত্ত্বাবধান ভার দিয়া নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরিস্থানে থাকিত। সহজে সে বাড়ী যাইতে পারিত না। কারণ প্রভুর শুধু জমিদারী সংক্রান্ত কাজে অর্থাৎ, আদায়, তহশীল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র নয়, প্রভুর বাড়ীতে প্রত্যহ রাত্রে তাহাকে প্রহরীর কার্য করিতে হইত। বছরে দু-একবার যখন সে বাড়ী যাইত, রীতিমত বিশ্বস্ত অন্য দুই চারিজন লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া তাহাদের উপর প্রহরা-কার্যের ভার দিয়া তবে নিরঞ্জন ছুটি পাইত।

২

শ্রাবণ মাস।

সেদিন কৃষ্ণা-চতুর্দশী তিথি। জমিদারবাবু বৈকালে সদরবাড়ীর কাছারীতে উপস্থিত হইয়া জমিদারীব কাগজপত্র দেখিতেছেন, এমন সময় গ্রামের পোষ্টঅফিসের ডাকহরকরা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড দিল।

জমিদারবাবু পত্র পড়িয়া দেখিলেন, নিরঞ্জনের ছোটভাই ভোলানাথ দলুই সংবাদ জানাইতেছে, মাতা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, জীবনের আশা নাই। নিরঞ্জন যেন পত্রপাঠ বাড়ীতে চলিয়া আসে। নচেৎ মাতার সহিত শেষ সময়ে তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। মাতা মৃত্যুকালে নিরঞ্জনকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

নিরঞ্জন এবং তাহার ভ্রাতা উভয়েই নিরক্ষর। তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে যখন পত্রালাপ চলে,—অপরকে ধরিয়া তাহারা পত্র লেখায়। সুতরাং পত্রের হস্তাক্ষর যে কাহার, এবং পত্রখানা জাল-না সঠিক—সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই কোন পক্ষ হইতে উঠে না।

আজও উঠিল না। বিশ্বস্ত প্রিয় ভৃত্যের পারিবারিক বিপদ হৃদয়বান প্রভু নিজের বিপদ বলিয়া গণ্য করিলেন। বিশেষত ওলাউঠা রোগ। তখনকার দিনে দেশে এ-রোগের সুচিকিৎসা আদৌ হইত না। এখনও পল্লী-অঞ্চলে হয় না। পল্লীগ্রামের অন্ধ অদৃষ্টবাদী অজ্ঞ জনসাধারণ জানে, এ ব্যাধি ধরিলে আর নিস্তার নাই।

বিচলিতচিত্তে তিনি তৎক্ষণাৎ নিরঞ্জনকে ডাকিয়া পত্রের মর্ম জানাইলেন। মাহিনা-বাবদ কিছু টাকা দিয়া নিরঞ্জনকে বাড়ী যাইবার আদেশ দিলেন।

হাতের কাছে তখন উপযুক্ত লাঠিয়াল মজুত নাই। প্রভুর বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন, গমস্তা, চাকর যতই থাক, চোর-ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের

নাই। প্রভুর বাড়ী অরক্ষিত থাকিতেছে,—এ-কথা তখন কাহারও মনে পড়িল না। অথবা মনে করিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। নিরঞ্জনের পারিবারিক দুঃসংবাদে তখন সকলেই সমবেদনায় ব্যথিত।

তখন বৈকাল প্রায় শেষ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ যাত্রার জন্য নিরঞ্জন প্রস্তুত হইল। সারারাত তাহাকে পথ হাঁটিতে হইবে। মাঝে বর্ষাস্ফীত দামোদর নদ। নদের জলরাশি অবাধে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া দূর-দূরান্তর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখনকার দিনের স্মৃতি স্মরণে আজও বর্ষাস্ফীত নদের প্রস্থ সম্বন্ধে বর্ধমান জেলায় প্রবাদ প্রচলিত আছে, "একা নদী ষোল ক্রোশ।"

অবশ্য এ-জল অধিকাংশ স্থানেই এক হাঁটু, বা কোমর পর্যন্ত। তবে স্রোতের টান অতি তীব্র। সব-চেয়ে ভয়ংকর নদীর মূল-খাদের প্রধান স্রোত। বর্ষায় সেখানে নৌকা ভিন্ন পারাপার হওয়ার উপায় নাই। বন্যাব বেগ উগ্রতর হইলে নৌকা চলাচল অসম্ভব হয়।

উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে নিরঞ্জন লাঠি, লণ্ঠন, পাগড়ী, গামছা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা—ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল।

একে বর্ষার মেঘভরা আকাশ, তায় কৃষ্ণা-চতুর্দশীর অন্ধকার রাত্রি। জনহীন পথ, মাঠ-ময়দান ঝোপ-ঝাড় ডিঙাইয়া, নিরঞ্জন সর্দার উল্কাবেগে নির্ভয়ে ছুটিতে লাগিল। বাঘ ভাল্লুকপূর্ণ জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামের অধিবাসী তাহাবা। কিশোর বয়স হইতে বিপদের সঙ্গে লড়িয়া তাহারা অসমসাহসিক। কিশোর বয়সে মাঠে গরু চরাইতে গিয়া কতদিন তাহারা বাঘের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়িয়াছে। সম্বল মাত্র একটি লাঠি এবং দুই একজন লাঠিধারী সঙ্গী। প্রচণ্ড বলে লাঠি চালাইয়া প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাঘ তাহারা ঠ্যাঙাইয়া মারিযাছে।

সাহস! দুর্জয় তাহাদের সাহস। গায়ের জোর যতই থাক, মনের জোর না থাকিলে সব নিষ্ফল। কিশোব বয়স কাহাকে বলে তাহারা জানে না।

এখন ত তাহার পূর্ণ যৌবন, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য। দুই সন্ধ্যা সে পেট ভরিয়া বাড়া-ভাত খাইতে পায়। মাসান্তে নির্বিবাদে পাঁচটি টাকা মাহিনা পায়। তার উপর জমিদারীর নূতন বিলিবন্দোবস্ত বাবদ, হিসাবানা বাবদ, কিছু উপরি পাওনা আছে। প্রভুর গৃহে পাল-পার্বণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন বাবদ অতিরিক্ত পারিতোষিক আছে। এ সৌভাগ্য তাহার সমশ্রেণীর জ্ঞাতি-গোত্রগণের সকলের অদৃষ্টে জোটে না। তাহারা অনেকেই প্রভূত পরিশ্রমে ইহার অর্ধেকও উপার্জ্জন করিতে পারে না। আর, যাহারা আলস্য বা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করে, তাহাদের ববাতে অন্নের বরাদ্দ শীঘ্র বন্ধ হয়। তখন চুরি-ডাকাতি করিয়া অসদুপায়ে তাহারা অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বিপদে পড়ে।

কিন্তু নিরঞ্জন সেরূপ বোকামি করে নাই। সৎপথে পরিশ্রম করিয়া, অন্ন সংগ্রহে তাহার ক্লান্তি নাই। জীবন তাহার কাছে গৌরববহ, উৎসাহময়।

প্রতি পাদক্ষেপে নিরঞ্জনের মনে হইতেছিল—আজ মুমূর্ষু জননীর অন্তিম-শয্যার পাশে মায়ের বড়-ছেলের মত তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আজ মায়ের জন্য, মাতৃশোকার্ত ছোটভাইটির জন্য—সমগ্র পরিবারের জন্য, তাহার অনেক কর্ত্তব্য।

কর্তব্য-জ্ঞানের তাড়ায় তাহার চরণ ক্রমশ প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সারারাত হাঁটিয়া ভোরের আলো ফুটিতে সে দামোদর নদের মূল-খাদের কাছে পৌছিল। এতক্ষণ লাঠির সাহায্যে জল মাপিয়া কাপড় গুটাইয়া আসিয়াছে, এবার অথৈ জল। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, নদ এখন তিন-পোয়া। স্রোত আজ খুব তীব্র নয়।

বর্ষাকালে এই নদ এবেলা-ওবেলা হঠাৎ বাড়ে, হঠাৎ কমে। এই বিশ্বাসঘাতক পার্বত্য-নদ কোন মুহূর্তে কি মূর্তি ধারণ করিবে, কেহ জানে না।

তিন-পোয়া নদীতে নৌকা চলে। কিন্তু নৌকা ওপারে থাকে। রীতিমত বেলা না হইলে নৌকা এপারে আসিবে না।

অতএব?

মুহূর্তে নিরঞ্জন কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তিন-পোয়া নদী সে অনেকবার সাঁতরাইয়া পার হইয়াছে। সাহসী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাহা পারে। আজও পরপ্রত্যাশায় বসিয়া থাকার সময় তাহার নাই।

নিকটস্থ একটা উচ্চ গাছের ডালে লণ্ঠনটা ঝুলাইয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া রাখিল। তারপর লাঠিটা গামছা দিয়া পিঠে বাঁধিয়া দামোদরের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঠাণ্ডা কনকনে জল ও স্রোতের সঙ্গে বহুক্ষণ যুঝিয়া, শেষে ওপারে পৌছিল। গায়ের জল মুছিয়া পাগড়ীটা খুলিয়া পরিল। ভিজা কাপড় নিঙড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া আবার ছুটিল।

যখন নিজের বাড়ী পৌছিল, তখন বেলা প্রায় এক প্রহর। বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তাহার বৃদ্ধা জননী ঢেঁকিতে প্রচুর চালগুঁড়ি কুটিয়া সেইমাত্র ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহার সুস্থ-সবল দেহে কোথাও বিন্দুমাত্র রোগের চিহ্ন নাই। তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূ দাওয়ায় বসিয়া দুটা ঝুড়ির গায়ে পাকা তাল ঘসিয়া 'মাড়ি' বাহির করিতেছে। ছেলেরা উঠানে নিশ্চিন্ত হইয়া খেলিতেছে! সকলেই নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন!

নিরঞ্জনকে দেখিয়া ছেলেরা সানন্দে কোলাহল করিয়া ছুটিয়া আসিল। বধূরা মাথায় ঘোমটা দিল। ভ্রাতৃবধূ আড়ালে সরিয়া গেল। মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন, "নিরু? এমন হঠাৎ এলি যে? ভাল আছিস ত?"

নিরঞ্জন দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "তোমার অসুখ হয়েছিল? ভোলা যে আমাকে চিঠি লিখেছে, সেই চিঠি পেয়ে ছুটোছুটি করে আসছি।"

"কই, না। আমার তো অসুখ করেনি! ভোলাও তো কোন চিঠি লেখেনি। কে বললে এমন কথা?"

"আমার মনিব। নিজে তিনি সেই চিঠি পড়েছেন। কাল বিকালে যেমন ডাকঘর থেকে চিঠি গেছে, তিনি পড়েই তখুনি টাকা দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

নিরঞ্জন আনুপূর্বিক সমস্ত সংবাদ বলিল। তারপর দম লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অ! বুঝেছি, এ তাহ'লে সেই শালাদের কাজ! তোমার অসুখ বলে লিখে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে—মতলব—আমার মনিব-বাড়ী লুঠবে! না মা, আমি বসব না, এখনি চললুম।"

"সে কিরে? এই এলি, সারারাত হেঁটে। নেয়ে-খেয়ে ঘুমো—"

"না। আজ অমাবস্যে। আঁধার রাত, মনিব-বাড়ীতে কোন লাঠিয়াল নাই। ডাকাতির এমন সুযোগ তারা কক্ষনো ছাড়বে না। আমায় এখুনি বেরুতেই হবে।"

"এখুনি?"

দৃঢ়স্বরে নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ, এখুনি।"

মা এই জেদি ছেলেকে চিনিতেন। প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যাস। বারণ করব না। কিন্তু বোস একটু। আমি ঝপ করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে গোটাকতক তালের বড়া ভেজে দিই। খেয়ে যা। ওই দ্যাখ, পাথরের খোরায় তাল মাড়া রয়েছে, এই দ্যাখ, চালগুঁড়ি কুটে এনেছি। এখুনি হয়ে যাবে।"

অধীর হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা, যাও, তুমি ঝপ করে নেয়ে এস। আমারও বড় খিদে পেয়েছে।"

মাতা স্নান করিতে বাহির হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাতা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, নিরঞ্জন পুনশ্চ শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া, লাঠি ঘাড়ে তুলিয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাব তিন বছরের শিশু-পুত্রটি পিতাকে যাইতে দিবে না বলিয়া কাঁদিতেছে। শিশুর মাতা তাহাকে কোলে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। শিশু ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া মাতার ঘোমটা খুলিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, আঁচড়াইয়া, খামচাইয়া মাতাকে বিব্রত করিতেছে। মাতা হাসিতে-হাসিতে পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পৌত্রের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিরঞ্জনের মাতা বলিলেন, "দেখছিস, নিরু—"

নিরঞ্জন নিরুদ্বিগ্ন মুখে জবাব দিল, "ছোট ছেলে, বায়না এখুনি ভুলে যাবে। তুমি এই টাকাগুলো রাখো মা, খরচ চালিও। ভোলা মাঠে ধান রুইতে গেছে, তার সঙ্গে দেখা হোলো না। তাকে বোলো, এবার যদি তোমার অসুখ হয়, তবে সে যেন নিজে গিযে আমাকে আনে। পরের লেখা চিঠি আমি আর মানব না। পেন্নাম হই মা, আসি তবে এখন।"

ব্যগ্র-উৎকণ্ঠায় মা বলিলেন, "দাঁড়া রে! চারটি তালের বড়া—"

বাধা দিয়া নিরঞ্জন সংক্ষেপে জবাব দিল, "সে হয়ে গেছে।"

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি হয়েছে রে?"

চালগুড়ির শূন্য ধামার দিকে আঙুল দেখাইয়া নিরঞ্জন নির্বিকার মুখে জবাব দিল, "তোমার ওই পাঁচ সের চালের গুঁড়োগুলি—তালের মাড়ির সঙ্গে মেখে কাঁচাই খেয়ে নিয়েছি। বড়া ভাজতে দেরী হোতো, অত সময় নেই আমার।"

রোরুদ্যমান পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে খেলনা কিনিবার জন্য ট্যাঁক হইতে কয়েকটা পয়সা বাহির করিয়া দিয়া মাতার পদধূলি মাথায় লইয়া নিরঞ্জন দ্রুত বাহির হইল।

৩

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দামোদর নদ গোল বাধাইল। ইত্যবসরে নদ ক্রুদ্ধ আকারে ভয়ঙ্কর ফুলিয়া উঠিয়াছে।

নৌকা ছাড়িতে দেরী হইল। স্রোতের ঠেলা সামলাইয়া নৌকা পরপারে পৌছিতে অনেক বেগ পাইতে পাইল। বিলম্ব হইল অনেক।

নির্দিষ্ট গাছের সেই লুক্কায়িত স্থান হইতে লণ্ঠনটি নামাইয়া লইয়া নিরঞ্জন দ্রুতবেগে গন্তব্যপথে চলিল।

প্রভুর গ্রামের প্রান্তে মাঠের পথে যখন নিরঞ্জন পৌছিল তখন রাত্রি প্রায় একটা। চারিদিক তখন নিঝুম নিশুতি। প্রভুর গৃহে পৌছিতে তখনও প্রায় এক-পোয়া পথ বাকী। নিরঞ্জন দ্রুত চলিল।

সহসা গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বহু কণ্ঠের সম্মিলিত একটা কোলাহল কানে আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কোলাহল ভেদ করিয়া প্রভুর বাড়ীর তেতলার উচ্চ ছাদ হইতে প্রভুর উচ্চকণ্ঠের ব্যগ্র আহ্বান শোনা গেল, "নিরঞ্জন, নিরঞ্জন, শীগগির এসো। ডাকাত পড়েছে—"

প্রভুর আহ্বান।

নিরঞ্জনের দেহে যেন দৈত্যবল আবির্ভূত হইল। উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিয়া বলিল, "ভয় নেই কর্তা, আমি নিরঞ্জন—এসে পড়েছি।"

লণ্ঠনটা মাঠে ফেলিয়া, মালকোঁচা বাঁধিয়া নিরঞ্জন বিরাট হুংকার ছাড়িল। লাঠিতে ভর দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল! প্রচণ্ড উত্তেজনায় নিরঞ্জনের চোখদুটা রক্তপিপাসু বাঘের মত জ্বলিতে লাগিল। সারা দেহের শিরায-শিরায় বৈদ্যুতিক-উম্মাদনার তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে জমিদারবাড়ীর সদর দেউড়িতে আসিয়া পৌছিল। দেখিল, ডাকাত-দল তখন ঘাঁটি আগলাইয়াছে এবং সদর দেউড়ি ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া, নিদ্রিত চাকর-গমস্তার দলকে বাঁধিয়াছে। ভিতরে একদল ডাকাত ঢুকিয়া দমাদম শব্দে কুড়ুল চালাইয়া দুয়ার ভাঙিয়াছে। অন্তঃপুরের দ্বিতল পর্যন্ত উঠিয়া লুঠপাট করিতেছে। মশালেব আলোয় দেখা গেল, তাহারা ত্রিতলের সিঁড়ির দুয়ার ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেই দুয়ারে লোহার খিল বন্ধ করিয়া জমিদারবাবু সপরিবারে ত্রিতলের খোলা ছাদে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি তখনও হাঁক দিতেছেন, "নিরঞ্জন? নিরঞ্জন?"

নিয়ম আছে, ডাকাতির সময় ডাকাত-সর্দার না কি ভিতরে প্রবেশ করেন না। তিনি ঘাঁটি আগলান এবং বাহির হইতে সাঙ্কেতিক শব্দে ভিতরের ও বাহিরের দলকে সময়োচিত কর্তব্যের উপদেশ দেন। অর্থাৎ ইনিই সমগ্র দলের মস্তিক-কেন্দ্রের কার্য করেন।

নিরঞ্জনের ইহাও জানা ছিল, দলের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, তাহারাও এ-অবস্থায় সচরাচর বাহিরে থাকিয়া ঘাঁটি আগলায়। অর্থাৎ তাঁরা প্রবেশপথের মুখে পাহারা দেয়। উদ্দেশ্য, বাহির হইতে যেন কেহ আসিয়া তাহাদের কাজে বাধা না দেয়, বা, বাড়ীর ভিতর হইতে যেন কেহ পালাইতে না পারে। দলের মধ্যে যাহারা অল্পশিক্ষিত এবং পাকা খেলোয়াড় নয় তাহারাই সশস্ত্র অবস্থায় মশাল লইয়া অন্তঃপুরে ঢুকিয়া দুয়ার ভাঙে ও লুঠপাঠ করে।

প্রকাণ্ড পুরীর চারি কোণ ঘিরিয়া চারজন সুদক্ষ খেলোয়াড়-ডাকাত ত্রাসোৎপাদক শব্দে ভীষণ হুহুংকার সহ লাঠি ও তরোয়াল খেলিতে-খেলিতে এ-কোণ হইতে ও-কোণ

পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছিল। ডাকাতি-ভাষায় এ-দেশে ইহাকে "কালীর পাক খেলা" বলে।

ছুটিয়া আসিতে-আসিতে নিরঞ্জন শুনিল, এই চারিজন ক্রীড়ারত খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন ভিতরের ডাকাত-দলের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মাছি পড়েছে —জাল গুটো—"

ইহা ডাকাত-দলের সাঙ্কেতিক-ভাষা।

অর্থাৎ "প্রবল শত্রু সম্মুখীন। এবার সকলে পালাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

নিরঞ্জন বুঝিল, তাহার হুংকার ইহাদের কানে পৌঁছিয়াছে। তাহারা নিরঞ্জনকে ঠিক চিনিতে পারুক বা নাই পারুক,—অন্তত এটুকু বুঝিয়াছে, তাহাদের হুংকারের দাপটে সমস্ত গ্রামবাসী যেখানে ভয়ে অভিভূত, নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, —সেখানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থে যে ব্যক্তি আহ্বান জানাইতেছে, সে অবশ্যই প্রবল পক্ষ, অত্যন্ত দুঃসাহসী ও বিশিষ্ট ক্ষমতাবান লোক। অতএব সতর্ক হইয়া পড়া উচিত। আর এখানে ডাকাতি করা নিরাপদ নয়।

মুহূর্তে নিরঞ্জন বুঝিতে পারিল—এই ব্যক্তিই এ-দলেব মস্তিক-কেন্দ্র, অর্থাৎ ডাকাত-সর্দার!

আঁধাব ফুঁড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নিরঞ্জন ছুটিয়া আসিয়া কালান্তক যমেব মত সে-ব্যক্তির মাথায় প্রচণ্ড বেগে লাঠি মারিল! মোক্ষম ঘা!

"বাপ!" বলিয়া সে ব্যক্তি মুখ থুবড়াইয়া দড়াম কবিযা মাটিতে পড়িল। তাহার হাতেব তরবাবি মুষ্টিচ্যুত হইল। অচৈতন্য হইয়া সে গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাগডী ভেদ করিয়া রক্তস্রোত ছুটিল!

ছোঁ মাবিযা ডাকাত-সর্দারের তরবারি কুড়াইয়া লইয়া নিরঞ্জন ডাকাত-সর্দারের পিঠের উপর এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়ী বীরের মত সিংহনাদ করিয়া বলিল, "ব্যস। তোদের মাথা ভেঙে দিয়েছি! আর কাউকে কিছু বলতে চাই না। আমি নিরঞ্জন সর্দার, হুকুম দিচ্ছি, হাতিয়ার রেখে এখনি এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যা সব। কাউকে কিছু বলব না।"

অন্য তিনজন খেলোয়াড় লাঠি ও তরবারি লইয়া নিরঞ্জনকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল,—তাহারা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল!

যাহারা অপরের প্ররোচনায় অন্যায়কার্য সাধন করে, তাহারা যত নৃশংস নিষ্ঠুর দুঃসাহসী হউক না কেন, মস্তিষ্কশক্তি তাহাদের স্বভাবত নিষ্ক্রিয়! ইহারা আদেশ পালনে দক্ষ, আদেশদাতা পরাজিত হইলে, ইহাদের অন্তর্নিহিত কাপুরুষতা ইহাদিগকে ভয়-ব্যাকুলতায় অভিভূত করে।

প্রকৃতপক্ষে ইহারা অতি দুর্বলচেতা, বর্বর, মূর্খ মাত্র! বিচারশক্তি ইহাদের কিছুমাত্র নাই। তাহা থাকিলে ইহারা সদুপায়ে পরিশ্রম করিয়া খাইত, অপরের আদেশে ও পরামর্শে এরূপ অন্যায়ের পথে জীবিকা অর্জনে উৎসাহী হইত না।

নিরঞ্জন সর্দারের প্রতাপ তাহাদের জানা ছিল, হাতে-হাতে প্রমাণও যথেষ্ট মিলিল। অতএব আদেশমাত্রেই লাঠি ও তরবারি নামাইয়া তাহারা বিনাবাক্যে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু মুস্কিলে পড়িল, ভিতরের ডাকাতের দল। সর্দারের কণ্ঠে জাল গুটাইবার সাঙ্কেতিক আদেশ পাওয়ামাত্রই তাহারা বাক্স, ট্রাঙ্ক, ঘড়া, ঘটি, বাসন, কাপড়, যে যাহা লুটিয়াছে সব ঘাড়ে করিয়া দ্রুতবেগে সদরে প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু দেউড়ির বাহিরে ভূপতিত দলপতির পিঠের উপর ও কে? সর্বনাশ! এ যে নিরঞ্জন সর্দার, মূর্তিমান্ শমন!

আর ঘাঁটি-আগলদার রক্ষকগণ? তাহারা যে সকলেই পালাইয়াছে।

হতবুদ্ধি হইয়া তাহারা বিভ্রান্তভাবে দাঁড়াইল।

সিংহনাদ সহ নিজের মাথার উপর বার-দুই লাঠি ঘুরাইয়া নিরঞ্জন বলিল, "যে যা নিয়েছিস, রাখ সব ওই উঠানে, তারপর, যা সব চলে যা। আর কাউকে কিছু বলব না।"

আজ্ঞামাত্রেই তাহারা সব জিনিস উঠানে নামাইল। মায় নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র মশালগুলি পর্যন্ত!

তখন লাঠি নামাইয়া নিরঞ্জন বলিল, "ব্যস, আর কোন ভয় নেই তোদের। যা, চলে যা সব। যা—"

চোখোচোখি চাহিতে, বা, মুখ দেখাইতে কাহারও সাহস হইল না। হেঁট হইয়া প্রায় গুঁড়ি মারিয়া নিরঞ্জনের সামনে দিয়া একে-একে সকলে পালাইল।

উর্ধ্বমুখে চাহিয়া তখন নিরঞ্জন হাঁক দিল, "কত্তাবাবু, আসুন। জিনিসগুলো মিলিয়ে ঘরে তুলে রাখতে হবে। আমি চাকরদের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। ডাকাত-সর্দার এক লাঠিতেই ঘায়েল হয়েছে। ভয় নেই, নেমে আসুন।"

বোকার টুপি

দোতলার ঘরে কান্তি ও মুন্তু খেলা করিতেছিল। কান্তির বয়স আট বছর, তার খুড়তুত ভাই মুন্তুর বয়স সবেমাত্র দেড় বছর। মুন্তু শিশুটি অত্যন্ত নিরীহ ভদ্র, পরম শান্তশিষ্ট। তার দুর্দান্ত ছটফটে 'ঝোল-তাতা' অর্থাৎ 'ছোট-দাদা' কান্তিকে সে অত্যন্ত সমীহ করিয়া চলে। কান্তির আজ্ঞা পালনের জন্য সে সদাই প্রস্তুত। অতএব জ্যেষ্ঠত্ব-সম্মানের গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য কান্তিও সদা সতর্ক। মুন্তুর সকল রকম দৌরাত্ম্য ও দুষ্টামি শিক্ষার গুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কান্তি।

খেলার মাঝে শোনা গেল, বাড়ীর পাশের রাস্তায় দুটা কুকুর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে। ক্রোধ-বিকৃত কণ্ঠে পরস্পরের উদ্দেশে সগর্জনে হাঁকিতেছে—"ভৌ, ভৌ, ভক, ভৌ—"

মুন্তু ভদ্র-চেতা ব্যক্তি। ঝগড়া মারামারি মোটে পছন্দ করে না। কিন্তু দূরত্বের নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবস্থা পর্যবেক্ষণে কান্তির উৎসাহ অসীম। রাস্তায় কুকুরদের ঝগড়া বাধিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া দোতলার জানলায় দাঁড়ায়। বিশেষ আগ্রহের

সহিত যোদ্ধা কুকুরদের রণ-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করে। ছোট-ভাই মুন্তুকেও ইদানিং সে সব সংগ্রাম-কৌশল দেখাইয়া যুদ্ধবিদ্যায় সুপটু করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইয়াছে। কুকুরদের ঝগড়ার শব্দ কানে পৌঁছিলেই, মুন্তুকে টানিয়া আনিয়া জানলায় দাঁড় করায়। ছোটদাদার অনুগত শিষ্য মুন্তু, ব্যাপার দেখিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছে,—যতই অস্বস্তি বোধ হউক, —"ঝোল-তাতার" যখন এত ব্যগ্রতা, তখন কুকুরদের দাঙ্গা দর্শন করা নিশ্চয় পরম পুণ্য কার্য।

অতএব খেলা ছাড়িয়া মুন্তু চকিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। রাস্তার দিকে হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে বলিল, "উই! তাতা, বৌ!"

তাতা কান্তি, দাদা-জনোচিত মুরুব্বিয়ানার সহিত বলিল, "কুকুরগুলো বুঝি? দাঁড়া দেখি।"

মেঝে হইতে হাতখানেক উঁচুতে শার্সি খড়-খড়ির জানলা। কান্তি গরাদে ধরিয়া তড়াক করিয়া এক লাফে জানলায় উঠিল। নীচের রাস্তায় এঁটো পাতা লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ-রত সারমেয় নন্দনগণের বিক্রম দর্শনে মনোনিবেশ করিল।

মুন্তুও জানলার গরাদে মুঠাইয়া ধরিয়া দাদার অনুকরণে এক-লম্ফে উঠিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইল। কিন্তু দেড় বছরের ছোট মানুষটির পক্ষে সেই একহাত উঁচুতে ওঠা, কঠিন শ্রমসাধ্য ব্যাপার। নিষ্ফল চেষ্টায় মুখ লাল করিয়া বেচারা ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। কিন্তু অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই, চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে চলিল।

ইতোমধ্যে রাস্তার যুদ্ধরত বীরগণ আঁচড়-কামড় পর্ব শেষ করিয়া দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল। দাদাকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইল ঘরের দিকে। ছোট ভাইটির নিষ্ফল প্রয়াসের দৃশ্যটা দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র দাদা এক-লাফে জানলা হইতে নামিল। সাগ্রহে বলিল, "ও, উঠতে পারচিস নি?...অমন ক'রে নয়। এই দ্যাখ, এমনি ক'রে। ডান হাতে গরাদে ধর, বাঁ-পা আগে তোল, তারপর,—হুঁ—এইঃ।"

বার-দুই দেখাইয়া দিতেই বুদ্ধিমান ছাত্র তৎপরতার সহিত কৌশলটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। তখন গুরু-শিষ্যের সাধনপর্ব চলিল। ক্রমাগত জানলায় ওঠা-নামা হইতে লাগিল।

এমন সময় ঘরে ঢুকিল, কান্তির চেয়ে দু-বছর বয়সের বড় দিদি—রন্তু। যদিচ বয়সে বড়, কিন্তু গায়ের জোর নিতান্তই কম। কান্তিকে সে কোন ক্ষেত্রেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অতএব তার নির্দোষ দুর্দান্ত-পনাগুলাও রন্তু কোনদিন ক্ষমার চক্ষে দেখে না।

ভর্ৎসনা-বর্ষী দৃষ্টিতে ক্ষণেক ভাইদের কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া রন্তু গৃহিণীজনোচিত কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "বলি, হ্যাঁ কান্তি, ওকে ওইসব দস্যি-বিত্তি শেখায়? একে ও মাথা-ভারি ছেলে। পিছলে ধড়াস ক'রে পড়ে তো, মাথা ভেঙে যাবে যে। তখন তুমি—"

ভর্ৎসনা সমাপ্ত হওয়ার ত্বর সহিল না। ঘোরতর তাচ্ছিল্য ভরে কান্তি বলিল, "আরে, য্যা-য্যাঃ! আমরা বলে সার্কেস করছি! পড়বে কেন? ব্যাটা ছেলে! তোমার মত মেয়েমানুষ নয় ত!"

দিদি রন্তু নিষ্ফল-ক্রোধে স্তব্ধ! গায়ের জোরে ত নয়-ই, বাচনিক সংগ্রাম-কৌশলেও সে কান্তির কাছে পদে-পদে পরাস্ত হয়। বিশেষত রাগের সময়। সে-সময় সব খেই হারাইয়া যায়, দেখা যায়, চোখা-চোখা বচনগুলা সব ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেও একটা লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে নাই। কান্তি অবহেলায় জয়লাভ করিয়া সদর্পে রণক্ষেত্র হইতে পিটটান দিয়াছে। দিদিত্ব-সম্মানের কোন মূল্য দিতে কান্তি প্রস্তুত নয়।

অতএব বিপদের আশঙ্কায় যথাসাধ্য সমীহ করিয়া চলাই কর্তব্য। ক্ষুব্ধ-দৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া থাকিয়া সক্ষোভে রন্তু সম্ভবত স্বগতোক্তি-ই করিল, "ছেলে তো নয়। যেন আস্ত গুণ্ডা।"

সহিয়া থাকিবার পাত্র কান্তি নয়। তদ্দণ্ডে রন্তুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া সদর্পে বলিল, "মেয়ে তো নয়; যেন আস্ত গুণ্ডি!"

রন্তু মর্মাহত! বিপদের গুরুত্বটা যে এমন বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া নির্মম পাল্টা আক্রমণের আকারে আসিবে, তা কে জানে? অবশ্য রাগের সময় মানুষ-বিশেষে, অনেক ব্যাকরণ, অভিধান-বহির্ভূত শব্দই ব্যবহার করে। বিশেষত কান্তিটা। তা বলিয়া... গুণ্ডি!

ছল-ছল নেত্রে চাহিয়া আহতস্বরে রন্তু বলিল, "আমি গুণ্ডি? আমি কি বামুনঠাকুরের পানের বটুয়ায়, দোক্তার কৌটোয় থাকি?"

দিদিকে মর্মাহত হইতে দেখিয়া মুন্তুর ভদ্র-চিত্ত সমবেদনা বোধ কবিল। কান্তি কিছু উত্তর দিবার আগেই গুটি-গুটি চরণে আসিয়া দিদির হাত ধরিল। সান্ত্বনার স্বরে টেলিগ্রামের মত সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলিল, "তিত্তি, মতোর... এ্যাঁ?"—সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন প্রত্যাশায় ঘাড় কাৎ করিল।

অর্থাৎ—দিদি, শান্ত হও। খেলার মোটরগাড়ীটা লইয়া তোমার সঙ্গে খেলিব। দাদা যখন বাক্য-বাণে তোমায় আহত করিয়াছে, তখন দাদার সঙ্গে...আর নয়।

মুন্তুকে বিপক্ষপক্ষে যোগ দিতে দেখিয়া কান্তির যুদ্ধোৎসাহ দমিয়া গেল। সন্ত্রস্ত হইয়া, "আয়, আয়, আমি তোর মটোরে দম দিয়ে দিচ্চি।"

দু-হাতে মুন্তুকে তুলিয়া ধরিয়া দিদি রন্তু বলিল, "ককখনো না। মুন্তু মটোর নিয়ে আমার সঙ্গে খেলা করবে।"

কান্তি ভীষণ ব্যস্ততায় আপত্তি জানাইল—"কিছুতেই না, ও আমার ভাই।"

"আহা-হা! আমার যেন ভাই নয় রে!"

ভ্রাতৃসত্ত্বের দখল সাব্যস্ত করিতে তৎক্ষণাৎ ভাই-বোনে হাতাহাতি আরম্ভ হইল।

২

দাদাদিদির এই অশোভন কাণ্ড দেখিয়া, ক্ষোভে দুঃখে মুন্তুর কান্না পাইল। কিন্তু স্বভাবত সে আত্ম-সংযমী, প্রচ্ছন্ন অভিমানী এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে জানে না। অতএব দিদির হাত ছাড়াইয়া নামিয়া পড়িল। অভ্যস্ত-প্রথায় ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। দু-হাত চোখের সামনে তুলিয়া, দুই বুড়া আঙুলের নোখে-নোখে ঠেকাইয়া, একদৃষ্টে যেন নোখ

দেখিতে লাগিল দাদা দিদির হাতাহাতি চলিতে লাগিল, মুস্তু দৃষ্টি তুলিয়া সে-দিকে চাহিল না। কিছু বলিল না।

সম্ভবত বড়দের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে এটা তার নিজস্ব ভঙ্গির নির্বাক প্রতিবাদ। কিন্তু ক্রমে নিরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অলক্ষিতে ঠোঁটদুটি ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। দাদা দিদির মল্ল-যুদ্ধ যে একান্ত অসহনীয়!

কান্তি ততক্ষণে নির্দয় বিক্রমে দিদিকে সুকৌশলে দেয়াল ঠাসা করিয়া ধরিয়াছে। দিদি প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে করিতে বিপন্ন-রুষ্ট কণ্ঠে বলিল "দূর হ',...বেরো গুণ্ডা—"

বাহুবলে বলিয়ান কান্তি আরও কায়দার সহিত দিদিকে দেয়ালে ঠাসিয়া ধরিতে-ধরিতে প্রসন্ন স্মিতমুখে বলিল, "আর চালাকি করবে গুণ্ডি? ভাই,—আমার!"

প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিতে-দিতে রস্তু বলিল, 'আমার!'

"ফের?"

"ফের?"

পুনশ্চ নবোদ্যমে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল।

অকস্মাৎ দুয়ারের কাছে হইল পিসীমার আবির্ভাব! ধমক দিয়া তিনি বলিলেন, "আবার মারামারি হচ্ছে?"

মুহূর্তে রণোন্মাদনা স্তব্ধ! দু'জনে পরস্পরকে আক্রমণ ছাড়িয়া, ছিটকাইয়া দু'পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। রস্তু অভিযোগের সুরে বলিল "এই দেখুন না! কান্তেটা—"

কান্তি সরোষ কটাক্ষ হানিয়া নতশিরে অতিশয় সংযতস্বরে বলিল, "আর, নিজে?"

মুস্তু ছুটিয়া আসিয়া পিসীমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলিল, "মা, মা"—

পিসীমাকে সে মা বলিয়া ডাকিত। পিসীমা সান্ত্বনাচ্ছলে তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে মুস্তু? তুমি বল ত?"

মুস্তু শর্ট-হ্যাণ্ডের সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রহার ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টায় শূন্যে মুঠি ছুড়িতে-ছুড়িতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "তাতা, তিত্তি—উম! উম!"

পিসীমা তাহার মুষ্টি আস্ফালনের দিকে কান্তি ও রস্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেখচিস? ছোট ভাইটাকে মার-ধোর শেখাচ্চিস তো? দেখিস, এবার এ-ও তোদের ধরে-ধরে মারবে। বিশেষ ক'রে—ওই কান্তেটাকে।"

কান্তি প্রবল অবিশ্বাস-ভরা আপত্তির সুরে অতিশয় নিম্নকণ্ঠে বলিল, "হুঁ, মারবে বই কি! আমি না ওর বড় ভাই!"

রস্তু তৎক্ষণাৎ শ্লেষের সহিত তারস্বরে বলিল, "আহা-হা, আর আমি যেন তোমার বড় বোন নয় গো!"

নিজের যুক্তির ফাঁদে নিজেই ধরা পড়িয়া কান্তি অপ্রস্তুত। অতিশয় অস্বস্তির সহিত এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল, রাস্তার দাঙ্গাবাজ কুকুরদের দাঙ্গার লীলা দেখিয়া রণোল্লাসে মাতিয়া ওঠা, অকর্ত্তব্য হইয়াছে। ভ্রাতৃসত্ত্বের দখল লইয়া জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর

জ্যেষ্ঠত্ব-সম্মানটা বাহুবলের সাহায্যে ধূলিসাৎ করাটাও তার নিজের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। সত্যই ত, অদূরেই তার ছোট ভাই দণ্ডায়মান! তাহাকে সে কি শিক্ষা দিল?

আর পিসীমা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছেন, সে কথাটাই বা এতক্ষণ কোন সাহসে ভুলিয়াছিল? পিসীমাকে যতই ভাল লাগুক, দাঙ্গার পর তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়। বিশেষত রন্তুর গায়ে হাত তোলার পর।

মনে-মনে অনুতাপ বোধ হইল এবং এই দণ্ডে কান মলিয়া নাক খৎ দিয়া রন্তু-দিদির কাছে ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হইল! নাঃ, বর্বরতা সে আর কখনও করিবে না।

নির্বাক তিরস্কার-বর্ষী দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া পিসীমা বিচার ও শাসনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কিশোর-ভৃত্য ভোলা আসিয়া গম্ভীর মুখে স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "পিসীমা, কাকাবাবুকে বলবেন, মনিহারী দোকানে পুলিশ কেসের কাগজ নাই।"

পিসীমা অবাক! আসামী কান্তির শাসন-বিচারের কথা ভুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "পুলিশ কেসের কাগজ! তাঁর মানে কি?"

ভোলা অধিকতর বিজ্ঞভাবে বলিল, "কাকাবাবু পুলিশ কেসের কাগজ কিনতে দিয়েছিলেন কিনা! তাই আনতে গেছনু। পেনু না।"

"পুলিশ কেসের?"

"আঁগগে হ্যাঁ। পুলিশ কেসই বলেচেন।"

ফরিয়াদি রন্তু, আসামী কান্তির দুর্বৃত্ততার কথা ভুলিয়া গেল!

ভোলার কথা শেষ হওয়া মাত্র সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কান্তিও বোকার মত না-বুঝিয়া হাসিল। দাদা-দিদিকে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া হাসিতে দেখিয়া মুন্তুও পরম খুসীর সহিত কচি ঠোঁটদুটিতে দু-হাত চাপা দিয়া, স্ফূর্তির সহিত "হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ—" করিয়া মোলায়েম হাসি হাসিল!

রন্তু হাসি থামাইয়া দম লইয়া বলিল, "পুলিশ কেস নয় পিসীমা, ফুলসক্যাপ কাগজ!"

কান্তি মীমাংসার সূত্র পাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া সোৎসাহে বলিল "কা—আ আনতে দিয়েছিলেন তো? আরে! সে ত' আমাদের সামনেই! ভোলা আনতে গেছে পুলিশ কেস!"

ভোলা অটল গাম্ভীর্য্যে বলিল, "সেই তো পুলিশ কেস!"

কান্তি ও রন্তু হাস্যাবেগে অধীর হইয়া পুনশ্চ লুটাপুটি খাইতে লাগিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া পিসীমা বলিলেন, "ভোলার বিজ্ঞতার জন্যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। ফুলস্‌ক্যাপ থেকে পুলিশ কেস!"

ভোলা সুগম্ভীর মুখে বলিল, "ওই—একই কথা।"

কান্তি মুচকি হাসির সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "দিদি, ফুল মানে বোকা, ক্যাপ মানে টুপি। ফুলস্‌ক্যাপ মানে কি হয় বল্ দেখি?"

রন্তু সৌহার্দ্য শীতল কণ্ঠে বলিল, "মানে? বোকার টুপি! নয় ভাই?"

বিগলিত কণ্ঠে কান্তি বলিল, "ভোলাকে একটা তাই দিলে হয়। না, ভাই দিদি?"

নিজেদের মামলায় পূর্ণচ্ছেদ পড়িল! ভোলার বুদ্ধিকে পুরস্কৃত করিবার ফন্দি আবিষ্কারে মাতিয়া উভয়ে তদ্দণ্ডে নিবিড় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। কলহ-কুশল দাদাদিদির সম্প্রীতি দর্শনে মুস্তু অতিশয় আরাম বোধ করিল। যাক, দাদাদিদির ঝগড়া যখন মিটিয়াছে, তখন দুজনেই এবার খেলাধূলা হুড়াহুড়ি করা চলিবে। কেউ আপত্তি করিবে না। ভ্রাতৃ-সত্ত্বের দখল লইয়া মারামারিও করিবে না। তাহার 'ঝোল্-তাতা' ও 'ঝোল্-তিত্তি' অতঃপর ষোলআনা অংশে মুস্তুর-ই! কি আনন্দ!

কচি ঠোঁটদুটির উপর দুহাত চাপা দিয়া স্ফূর্তির আতিশয্যে পুনশ্চ সে সুমিষ্ট হাসি হাসিল—"হুঁ—হুঁ,—হুঁ হুঁ!"

মৃদু হাসিয়া পিসীমা নীরবে স্থানত্যাগ করিলেন। ছোট ভাইটিকে লইয়া দাদাদিদি মহোৎসাহে 'বোকার টুপি' প্রস্তুত করিতে বসিল!

তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব!

(রঙ্গচিত্র)

আড়াই বছরের ক্ষুদে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণীর কচি কণ্ঠের গর্জন শুনে প্রপিতামহী চমকে উঠলেন।

কাকে হচ্ছে?...তোকে মেলে মেলে ইয়াইয়া খাঁ কলব।

ব্যাপার কি? আবার শোনা গেল, সেই সগর্জন শাসন-বাক্য!

অনুসন্ধানে জানা গেল, ব্যাপার দুঃসহ!

রান্নাঘরে রুটি বেলতে বেলতে মা উঠে গেছেন। অতএব তিনি নির্দ্বিধায় চাকি বেলুন দখল করে রুটি বেলতে বসেছেন। ময়দার ডেলা চটকে চাকি বেলুনে পেন্ট করে শিল্পকর্ম সম্পাদন করেছেন। বিশ বছর বয়সের পাচক যজ্ঞেশ্বর শিল্পের মহিমা বোঝেনি। চাকিটা সরিয়ে নিয়েছে। কাজেই বেলনা তুলে প্রহারোদ্যত হয়ে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী গর্জন জুড়েছেন, "তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কল্‌ব!"

যজ্ঞেশ্বর রান্নাঘরের এদিক ওদিকে সরে তার নাগালের বাইরে পালাচ্ছে। হাসছে। ইনি তত রাগছেন। তত আক্রমণ করতে ছুটছেন।

. চণ্ডী-উপাসক দাদু, আদর করে নাম রেখেছেন বিষ্ণুমায়া। উনি সেটা কচি কণ্ঠে উচ্চারণ করেন 'বিচ্ছু মায়া'। দাদুর দাদা নাম রেখেছেন 'দেববর্ণা'। পিসীমায়েরা নাম রেখেছেন 'মুনমুন'। কারণ ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই চাঁদে মানুষ নেমেছে যেদিন, সেই রাত্রে উনি পৃথিবীতে এসেছেন। আরও গণ্ডাকতক ভালমন্দ নাম আছে।

দাপট খুব। দাদু থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর বাচ্চা চাকরগুলি পর্যন্ত সবাই তাঁর কাছে ধমক খায়। কিন্তু আশ্চর্য, তারা খেতে বসলে, দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ায়। সস্নেহে প্রশ্ন করে, "পেৎ ভলেছে ত?" পেৎ মানে পেট।

সবাইকে খাওয়াতে খুব ভালবাসে বিষ্ণুমায়া।

তার নিজস্ব সম্পত্তি—'নোনো'। নোনো তার প্রপিতামহী। নোনোর রাতের খাবার মিষ্টটুকু রোজ ক্ষুদে হাতে বয়ে আনে।

বিষ্ণুমায়ার স্কন্ধে মাঝে মাঝে মহিষাসুরমর্দিনী আবির্ভূতা হন। পাশের বাড়ীর ছয় বছরের সর্বাণী এসে যদি প্রপিতামহীর কাছে বসে, একটু গল্প করে, তবে অসহ্য! দূর থেকে তাকে ইসারা করে ডাকে। আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে শাসিয়ে সতর্ক করে, "তুই যদি নোনোর সঙ্গে আর কথা বলবি, তবে তোকে খাম্‌চে দেব। কামলে দেব। এমন মাল্ মাল্‌ব যে কাঁদতে কাঁদতে পালাবি!"

সর্বাণী হাসতে হাসতে এসে নোনোর কাছে গোপনে রিপোর্ট দিয়ে পালায়।

প্রপিতামহী দাদুর নতুন কাকীমা। দাদু নতুন মা বলে ডাকেন। দাদুর ছেলেমেয়েরাও তাই বলে। উনি কচি বেলা থেকে প্রপিতামহীর ঘাড়ে চড়া মুরুব্বি হয়েছেন। এক বছর বয়স থেকে শর্টহ্যাণ্ডে নাম দিয়েছেন 'নো-নো'।

'নো-নো'-কে অত্যন্ত ভালবাসে। পাশাপাশি বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এসে পাছে কেউ তার নোনোকে আত্মসাৎ করে সেই ভয়ে সর্বদা সতর্ক থাকে। কেউ বেশীক্ষণ নোনোর কাছে থাকলে তাকে স্পষ্ট বলে, "যা, এবাল বালী যা।" অর্থাৎ, "যা, এবার বাড়ী যা।"

অনেক খোঁজখবর নেওয়া হোল।

আজকের দুর্ঘটনার হেতুটা বোঝা গেল।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ক'দিন আগে পাক-সেনাপতি কিছু-কম লাখ খানেক সৈন্যসামন্ত ও পাহাড়প্রমাণ অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছেন।

রেডিওতে খবর প্রচার হবামাত্র আসানসোলের স্থানীয় ছেলেরা মহোল্লাসে বাড়ীর সামনে তেমাথার মোড়ে মাইক বসিয়ে রাত আড়াইটা পর্যন্ত গান-বাজনা করেছে। পরদিন বৈকালে ইয়াহিয়া খাঁ ও জনাব ভুট্টোর মূর্তি গড়ে মিলিটারী পোশাক পরিয়ে, বিরাট শোভাযাত্রা সহ ব্যাণ্ড বাজিয়ে পথে পথে ঘুরিয়ে মহাসম্মানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছে।

বৈকালে ঘুম থেকে উঠে, বিষ্ণুমায়া তন্ময় হয়ে সে শোভাযাত্রা দেখেছে। অতএব ইয়াহিয়া খাঁকে সে চিনে নিয়েছে।

পরদিন প্রাতঃকালে এক ফুলঝাঁটা, দু হাতে উঁচু করে ধরে তুড়ুক তুড়ুক করে নাচতে নাচতে প্রপিতামহীর ঘরে আবির্ভূত হলেন।

প্রপিতামহী চমকিত! কি ব্যাপার?

ঝাঁটা দেখিয়ে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী গম্ভীর মুখে বললেন, "এতা ইয়াইয়া খাঁ।"

প্রপিতামহী সানুনয়ে বললেন 'ছি, বলতে নেই। ভগবানের জীব।'

প্রপৌত্রী দমবার পাত্রী নয়। দু হাতে ঝাঁটা উঁচিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগলেন। মুখে নানা শব্দের অনর্গল আবৃত্তি। যেন তাঁর 'ছড়া-ছবির' বই পড়ছেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র—দাদু। তারপর পর্যায়ক্রমে পিতামহী 'আম্‌মা', —পিসীমায়েরা, নোনো, আর ঝি-চাকররা এবং মেথরাণী ও তার বাচ্চা ছেলেটি।

সকালে দাদুর স্কন্ধে উঠে পাড়া পর্যটন, নিত্যকর্ম। তারপর নোনোর কাছে গিয়ে পঞ্জিকা খুলে ঠাকুর-দেবতা দর্শন। ছবিতে কার্ত্তিক ঠাকুর ময়ূরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। অতএব ইনিও কার্তিক ঠাকুরের মত 'নোনো'র গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালবাসেন।

একদিন রান্নাঘরে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী বসে নোনোর খাওয়া দেখছিলেন। আম্‌মাও সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় নোনো বললেন, "কার্তিক ঠাকুরের মত মুন্‌তু আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। আমি মুনতুর ময়ূর। মুনতু আমার কার্তিক ঠাকুর।"

প্রপিতামহী আদর করে ওকে 'মুনতু' বলতেন। তাঁর মন্তব্য শুনে যজ্ঞেশ্বর মাঝখান থেকে রসিকতার সুরে বললে, 'ময়ূর নয়। নোনো—অসুর!'

দেবদেবীদের এবং তাঁদের বাহন ও শত্রুগুলির পরিচয় মুনতু উত্তমরূপে চিনেছে। মা দুর্গার অসুর তার অপরিচিত নয়। সেই অসুরকে নোনো বলা!

বিনা বাক্যে মুনতু লাফিয়ে উঠল। জানালা থেকে রান্নাঘরের পাখাটা টেনে নিয়ে এক লাফে যজ্ঞেশ্বরের পিছনে হাজির।

কেউ কিছু বোঝার আগেই যজ্ঞেশ্বরের মাথায় সশব্দে পাখার বাঁটের এক ঘা।

বেচারা যজ্ঞেশ্বর মেঝেয় বসে হেঁট হয়ে ভাত বাড়ছিল। চমকে উঠে হাঁ হাঁ করে পাখাটা কেড়ে নিলে। নিরস্ত্র মুন্‌তুর মনে পড়ল, তার নোখ আছে। দাঁত আছে।

হাঁ করে যজ্ঞেশ্বরের পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল! উদ্দেশ্য, কামড় দেওয়া।

আমমা, নোনো বাধা দেওয়ার জন্য চেঁচিয়ে উঠলেন। বালক ভৃত্য জগদীশ ছুটে এসে ছোঁ-মেরে মহিষমর্দিনীকে শূন্যে তুলে নিয়ে দে-ছুট!

মুনতু রাগে ফুসতে ফুসতে সগর্জনে বললে, "নোনোকে ওচুল বল্‌বি না।"—("অসুর বলবি না!")

জগদীশ পর মুহূর্তে রাস্তায়। মোটর, বাস, ট্রাক, লরীর ছুটোছুটির ভিড়ে মুনতুর রাগ জল হয়ে গেল।

মস্ত গুণ। যতই রাগ হোক, যতই জেদ ধরুক, চট করে ভুলে যায়!

অনেক কষ্টে জোজো সে যাত্রা ক্ষমালাভ করলে।

দিনকতক পরের কথা।

যজ্ঞেশ্বর ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল। দশদিন পরে ফিরেছে। রাত তখন ন'টা। মুন্‌তুর ঘুমের সময় হয়েছে। মা ঘুম পাড়াবার জন্য ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু উহুঁ। এখন যাবে কি? দশদিন জোজোকে দেখেনি। খুব মন কেমন করেছে। অতএব তার কোলে চেপে গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চালাচ্ছে, "তুই কি খেয়ে এলি? তোর মা কি রেঁধেছিল?..." ইত্যাদি।

জোজো বিব্রত। এতবড় পাকা গিন্নীকে সে কি করে থামাবে? ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বরের সংগ্রহশালায় অনেক সিনেমার ছবি আছে। অনেক ফটো আছে! সেগুলা দেখতে দেখতে মুন্‌তু মুগ্ধ মোহিত! সাগ্রহে প্রস্তাব করলে, "জোজো, তোর কাছে দড়ির খাটিয়ায় আমি আজ ঘুমুব।"

দশদিনের পর জোজো বাড়ী থেকে এসেছে। মুন্তুর বাৎসল্য-স্নেহটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে।

অবশ্য দাদুর কাছে, নোনোর কাছে শুয়ে ঘুমোবার ইচ্ছা প্রায়ই হয়। মা ধরে-বেঁধে দোতলায় নিয়ে যান। সেজন্য প্রায়ই এক ঝলক কাঁদতে হয়।

আজও কাঁদতে হোল।

জোজো ভাত খেতে গেল। অদর্শনের শোকে কান্নার ঝোঁকটা খুব বেড়ে উঠল। শুধু মা নয়, আম্মা নয়, স্বয়ং দাদু এসে বুকে করে ভোলাবার জন্য কত চেষ্টা করলেন, কিছুতে থামল না। সাইকেল রিকশায় চড়িয়ে সেই রাত্রে পথে পথে তাকে নিয়ে দাদু ঘুরলেন। তবু কান্না থামে না। দাদু হিমসিম খেয়ে গেলেন।

অপরিসীম শোকাবেগ!

বেড়িয়ে এসেও আবার কান্না। "জোজোর ঘরে দড়ির খাটিয়ায় ঘুমুব।" এক বায়না চলল।

মা ক্রুদ্ধ হয়ে শাসালেন, "যাও, জোজোর ঘরে দড়ির খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোও গে। আমি আর কোনদিন তোমাকে কাছে নিয়ে ঘুমোব না।"

তবু বিষ্ণুমায়ার মায়াজাল ছিন্ন হোল না।

বাড়ীসুদ্ধ লোক ব্যস্ত বিব্রত।

প্রপিতামহী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কান্নার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভাঙল। উঠে এলেন। ব্যাপার দেখে-শুনে হতভম্ব।

এক পাশে বসে বিষ্ণুমায়ার কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

দাদু নাস্তানাবুদ হয়ে নাতনীকে সামলাতে সামলাতে বললেন, "তুমি ঘুমোও গে নতুন মা। রাত জেগো না।"

দাদু ডাক্তার মানুষ। ব্লাডপ্রেশারের রোগী নতুন মাকে সাবধানে আগলে রাখেন।

নতুন মা কাতর কণ্ঠে বললেন, "যাচ্ছি বাবা। কিন্তু আমার মুনুকে এত রাগিয়ে দিলে কে? এত রাগ ভাল নয়। কাঁদতে কাঁদতে বমি করে ফেল্‌বে যে! কান্না থামুক আগে।"

আমমা—অর্থাৎ মুনুর পিতামহী বললেন, "ও ঝোঁক ধরেচে জোজোর ঘরে গিয়ে, দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমুবে।"

নিরীহভাবে নতুন মা বললেন, "বেশ ত। যাক না। কিন্তু হয়ত খাটিয়ায় ছারপোকা আছে। সারা রাত কুটকুট করে কামড়াবে। মুনু ঘুমুতে পারবে না। তাছাড়া খাটিয়ায় 'মাকা' থাকে ত। তারা সুড়সুড় করে মুনুর মুখে-চোখে ঘুরে বেড়বে। তখন?"

'মাকা'—অর্থাৎ মাকড়সা। মুনুর পরম প্রিয় দুই সদ্যঃ-গ্র্যাজুয়েট পিসীমা সব বিষয়ে অকুতোভয়। কিন্তু দেয়ালে একটা 'মাকা' দেখলে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালান। চাকররা এসে 'মাকা'টা মারলে তবে সুস্থ হন।

অতএব? কিছু না বুঝেই মুনু 'মাকা'কে ভীষণ খাতির করে। হক্‌চকিয়ে গেল। ফ্যাল্‌ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

অধিকতর করুণ কণ্ঠে নতুন মা বললেন, "হাঁরে মুনুয়া, তুই সেদিন 'মেলে মেলে'

জোজোকে 'ইয়াহিয়া খাঁ' করতে চেয়েছিলি, নয়? সেই জোজোর দড়ির খাটিয়ার জন্যে আজ তোর এত শোক।"

চকিতে মুনতুর কান্না স্তব্ধ। আশ্চর্য হয়ে নোনোর দিকে চেয়ে রইল। মনে পড়ল ইয়াহিয়া খাঁর প্রতিমূর্তি গড়ে কেমন করে বাঁশের ডগে বসিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ছেলেরা শোভাযাত্রা করে কবর দিতে নিয়ে গেছল, সেই অপরূপ বর্ণাঢ্য দৃশ্য।

মনে পড়ল, পরদিন সকালে সেই অনুকরণে মুনতু নিজে এক ফুল-ঝাঁটা উঁচু করে ধরে নাচতে নাচতে নোনোর ঘরে গিয়ে সস্মিত মুখে পরিচয় দিয়েছিল, "এতা ইয়াইয়া খাঁ।"

চাকি কেড়ে নেওয়ার জন্য তাই ত দুর্বৃত্ত জোজোকে মেরে ধরে ইয়াহিয়া খাঁ বানাবার সদিচ্ছা মনে জেগেছিল। সিনেমাভক্ত জোজোর ঘরের সিনেমার ছবিগুলা যতই সুন্দর লোভনীয় হোক, দড়ির খাটিয়াটা নিশ্চয় আহামরি গোছের আরামদায়ক পদার্থ নয়। সেটার জন্য কান্নাকাটি করে এই রাত্রে দাদুকে নাস্তানাবুদ কবা সুবিবেচনা নয।

মুনতু কান্না ভুলে গেল। ভাবনায় পড়ল।

জোজোকে কদিন দেখতে না পেয়ে খুবই মন কেমন করেছিল। সে কথা ঠিক। কিন্তু জোজোও সব সময় সুবিধার মানুষ নয়। চাকি যে কেড়ে নেয, সে ইয়াহিয়া খাঁব মতই দুর্বৃত্ত।

ফোঁপানি বন্ধ হোল। হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হোল। কান্না ততক্ষণে সম্পূর্ণতম রূপে বন্ধ।

জোজো খেযে এসে আবার মুনতুকে কোলে নিল।

কিন্তু মুনতুর আব সেজেগুজে কাঁদতে বসাব উৎসাহ নেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে নোনোর দিকে একটু চেয়ে থেকে বললে, "ঘয়ে যান।"

রাত্রের দিকে নোনো ঘর থেকে বেরিয়ে এলে, দাদু ব্যস্ত হন। বাত, ব্লাডপ্রেশার বার্ধক্যগ্রস্ত অপটু বৃদ্ধা পাছে কোথাও পড়ে যান, পাছে হাত পা ভাঙেন, সেজন্য সবাই সন্ত্রস্ত থাকেন। মুনতুও তাই শিখেছে। রাত্রে তাকে বেরুতে দেখলেই ব্যস্ত হয়ে বলে, "ঘয়ে যান।" অর্থাৎ, ঘরে যান।

বোঝা গেল এবার মুনতু ওরফে বিষ্ণুমায়া ওরফে দেববর্ণা ওরফে মুনমুন ঠাকরুণ, ধাতস্থ হয়েছেন।

মা এসে তাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। দাদু নিজের বিছানায় গেলেন। নোনো ও অপর সবাই যে যাঁর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জিদটা বেশ শক্তিশালী বটে! এই জিদটা মুনতু যদি সুবিবেচনার সঙ্গে পরবর্তী জীবনে কোনও ভাল কাজে লাগায়, কিংবা লেখাপড়া শেখার ঝোঁকে নিয়োজিত করে, তবে ওর মোহড়া নেয় কে?

এইসব 'জিদেল' শিশুকে অভিভাবকরা ধৈর্যশীল হয়ে সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যদি সৎপথে চালনা করেন, তবে, এরা জীবনে অনেক—অনেক বড় হবে।

অন্যথা?

হে মা মহিষাসুর-মর্দিনী। তুমি বিষ্ণুমায়াদের স্কন্ধে আরূঢ় হয়ে জগতের অনিষ্টকারী গণ্ডা গণ্ডা ইয়াহিয়া খাঁদের দমন কর। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক।

পরদিন সকালে দেখা গেল, বিষ্ণুমায়া এক মাসিক পত্রিকা খুলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুন্দর মূর্তিটি দেখছেন। সাদরে ছবির মুখে হাত বুলিয়ে সকৌতুকে সখিত্বের সুরে বলছেন—

এই মেয়েতা, এই মেয়েতা
আমাদেল বালী যাবি?
এক পয়সাল ছোলা দেব
বচে বচে তাবি?

অর্থাৎ বসে বসে খাবি।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৭৯

উ প ন্যা স (বর্ণানুক্রমিক তালিকা, প্রকাশতারিখসহ)

অবাক!। (উপন্যাস)। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফাল্গুন [১৩৩৪?]। মূল্য : দেড় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৪। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৬।

অরু। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস। ৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৪৬। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৫। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২৫।
উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। পুত্র-প্রতিম স্নেহাস্পদ শ্রীমান চিন্ময় সুন্দর রায় বি. এল, নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—শুভার্থিনী—মাসিমা। মেমারি ৬ই জুন, ১৯৩৯।

ইমানদার। শৈলবালা ঘোষজায়া। [আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫৫০। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ৩৪।

গ্রন্থের শেষে পুস্তক সমালোচনা অংশে আছে :

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত
সেখ আন্দু
দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

যে বহির সারবত্তা বিচার করিয়া বসুমতী, বেঙ্গলী প্রভৃতি বহু বহু বিখ্যাত পত্রিকা এবং সমুদয় উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রিকা উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বহু গণ্যমান্য বিজ্ঞগণ যাহা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দুই চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

দি ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার, সুবিখ্যাত "মোসলেম ভারতের" সম্পাদক—"মহর্ষি মনসুর"—"ফেরদসী চরিত" "সাহনামা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কবিবর মোজাম্মেল হক বি, এ, লিখিতেছেন ;—

8th April, 1921

"...You have broken new grounds in the field of Bengali literature by depicting the human side of the Mahammedan character and the Mahammedan community is under obligation to you for your sympathetic attitude..."

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতির মুখপত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" (কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩২৮) এগার পৃষ্ঠা ব্যাপী "সেখ আন্দু" সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ

সমালোচনার কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"আমরা সচরাচর উপন্যাসে ও অন্যত্র যে ভালবাসার সহিত পরিচিত হই, উহা সকাম, উহা অতি তুচ্ছ, অতি হেয় জিনিষ। উহাতে আমাদের রিপু-জয়ের কাহিনী নিনাদিত হয় না। কিন্তু পুরুষের যে ভালবাসা নারীর সম্মানকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় না, নারীর গৌরবকে, নারীত্বকে অটুট রাখিয়া নিজেকে নিঃস্বের মত জগতে বিলাইয়া দিতে সক্ষম হয়, সেই ভালবাসাই পরম গৌরবের জিনিষ, তাহারই নাম ভালবাসা। সুখের বিষয় 'সেখ আন্দু' উপন্যাসে আন্দু-চরিত্রে আমরা সর্ব্বত্র এই ভালবাসারই বিকাশ দেখিতে পাই।"

এই সমালোচনা দেশের জনপ্রিয় সংবাদপত্র
"Servant"
দ্বারা
সাদরে সমর্থিত হইয়াছে।

গঙ্গাপুত্র। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫২। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৫। উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। কল্যাণীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শুভেন্দু কুমার নন্দী দীর্ঘজীবেষু।

স্নেহের মুন্তু,

তুমি যখন দেড় বছরের শিশু, তখন তোমার কাছ থেকে ভাব ও ভাষা ধার করে নিয়ে, কল্পনার কারখানায়, সদ্য রোগমুক্তা জ্ঞানহীনা "লক্ষ্মীকে" গড়েছিলাম।

আজ তোমার বিদ্যারম্ভের শুভলগ্ন স্মরণ করে তোমার নামেই "গঙ্গাপুত্র" উৎসর্গ করছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—শিক্ষা সার্থক হোক। জ্ঞানবান, হৃদয়বান, কর্ম্মবীর হও—দীর্ঘজীবী হও। ইতি—

শুভার্থিনী
তোমার আদরের
"পিতিমা"

মেমারি
১৯৩৯

চৌকো চোয়াল। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী। ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য : আড়াই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫২। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৪। উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। সুদক্ষ চক্ষু-চিকিৎসক কল্যাণীয় শ্রীমান্ চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ এম. বি. দীর্ঘজীবেষু।

স্নেহাস্পদ,

আমার মরা-চোখকে তুমি পরম যত্নে ঐন্দ্রজালিক-ক্ষিপ্রতায় পুনর্জীবন দিয়েছ! আমার দৃষ্টিশক্তির উপর তোমার চিকিৎসা নৈপুণ্যের প্রথম ফল—এই "চৌকো-চোয়াল!"

কৃতজ্ঞতার বাণী তুমি ক্ষমা করবে না, তাই নিরুপায় হয়ে, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ সহ, তোমার চিকিৎসা-সাফল্যের এই নিদর্শন—তোমার সেবা-ধর্ম্মপূত করকমলে সস্নেহে অর্পণ করলাম। ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভ কর, শ্রীভগবানের চরণে এই প্রার্থনা। ইতি মঙ্গল প্রার্থিনী তোমার নতুন কাকিমা। চৈত্র, ১৩৫২, বর্দ্ধমান।

জন্ম-অভিশপ্তা। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আশ্বিন ১৩২৮। মূল্য : ১৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৩২। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৩।
অষ্টম পরিচ্ছেদ 'ক' থেকে 'ট'—এই ১১টি উপবিভাগে বিভক্ত (পৃ ৪৪-৯৬)।

বিনির্ণয়। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। শ্রীরাধারমণ দাস। ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস। ৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম : দেড় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০০। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২২। উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়।

অমানুষের অত্যাচার পীড়িত, বিপন্ন নর-নারীর যাঁহারা সহায়তাকারী—সেই সৎসাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশভ্রাতা ও দেশভগিনীগণের শ্রীকরকমলোদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—
বর্দ্ধমান বিনয়াবনতা
মহালয়া, ১৩৪৭ লেখিকা

মঙ্গল-মঠ। "সেখ আন্দু", "জন্ম-অপরাধী", "নমিতা" প্রভৃতি প্রণেত্রী শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। কর, মজুমদার এণ্ড কোং। মূল্য ২৷৷০ টাকা। উপন্যাসটি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ১৭টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫টি পরিচ্ছেদ আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪০৯।

উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। "শুভ-বিবাহে—শুভাশীর্ব্বাদ"। কল্যাণীয় পুত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ দীর্ঘজীবেষু। স্নেহাস্পদ, জ্ঞান-সাধনা-উজ্জ্বল, তরুণ-জীবনে আজ তোমার সংসার-পথ-যাত্রার শুভ-মুহূর্ত্তে সকল পূজনীয় গুরুজনদের, পুণ্যময়-আশীর্ব্বাদ-শেষে—আমার একান্ত আগ্রহময় সাধনার দান "মঙ্গল মঠ" মঙ্গল আশীর্ব্বাদরূপে, গভীর স্নেহভরে তোমায় উপহার দিতেছি। প্রার্থনা করি—মঙ্গলময়ের কৃপায় সংসার-জীবনের, মহান-সাধন-ক্ষেত্রে—সকল দুঃখ, ক্ষতি, শোক, ব্যথা, সুখ সম্পদের ভিতর দিয়া সহস্র শিক্ষা, লক্ষ সাধনার ধারা বহিয়া সত্য চেতনার মাঝে আত্ম-উদ্বোধনে সিদ্ধকাম হও বৎস। ইতি চির-মঙ্গল-প্রার্থিনী। তোমার—মাসীমা। আষাঢ়, ১৩২৮।

উপন্যাস শেষে বিজ্ঞাপন অংশে আছে :
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

মঙ্গলমঠ

বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রধান সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের অভিমত নিম্নে লিখিত হইল—

রাজবাটী, বর্দ্ধমান
২৬শে বৈশাখ ১৩২৯।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শৈলবালা সরস্বতী
বিদগ্ধচরিতাসু—

শুভাশীঃ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন—

ভক্তির সহিত উপহৃত তোমার "মঙ্গলমঠ" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম, নিরঞ্জনের নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র অঙ্কনে তুমি নিজের অসাধারণ মনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনার পরিচয় দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়াছ—যে ভাবে তাহার মানসিক গতি বিশ্লেষণ করিয়া পাঠক পাঠিকাকে অপূর্ব্ব আনন্দরসে উৎফুল্ল করাইবার চেষ্টা করিয়াছ, তোমার তৎসুমদয় চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে, আমি সানন্দ অন্তঃকরণে তোমার শিক্ষানৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি। মায়াকে তুমি মর্ত্ত্যের মানবীরূপে অবতীর্ণ করাইয়াও বাস্তবিক দেবীরূপে তাহাকে পরিচিত করাইয়াছ, সাময়িক অধীরতা নিরঞ্জনের চিত্তকে অনেকসময় চাঞ্চল্যক্ষুব্ধ করিলেও মায়া কোন দিনই সুকোমল নারীচরিত্রের মর্য্যাদাকে আহত করিয়া আপনার অধীরতার পরিচয় প্রদান করে নাই। তুমি এই দুইটী চরিত্রই নিজের অনুপম শক্তিবলে মনোনুরূপে অঙ্কিত করিয়া যথার্থই কবিযশোভাগিনী হইয়াছ। বহুতর প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম-চিন্তার অবতারণায় তোমার মন যে কিভাবে লীলাময়ের বিচিত্র সৃষ্টিলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। তুমি কত যত্নে এই সমস্ত আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুশীলনসামর্থ্য লাভ করিয়াছ, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া তোমার উদদৃপ্ত সাধনার অগণিত প্রশংসা করিতেছি। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবিনী

করিয়া তোমার মানসিক বৃত্তিনিচয়কে অধিকতর উন্নতিপথে পরিচালিত করুন, তোমার সদুপদেশ পাইয়া সংসারের অপরিণতবুদ্ধি নরনারীগণ সমাজের আদর্শস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হউক, হিতৈষী ব্রাহ্মণের এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মানসিক উন্নতিকল্পে অবধানবতী থাকিয়া আয়তিতে মঙ্গলমঠের যথার্থ অধিকারিণী হও ইহাই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ। ইতি—

একান্ত শুভার্থী
শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন

মিষ্টি সরবৎ। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। মাঘ, ১৩২৬। মূল্য দেড় টাকা। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় আছে : প্রকাশক—শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রিণ্টার—শ্রী বিহারীলাল নাথ, এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৭২ [আখ্যাপত্র ১, উৎসর্গপত্র ১]। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২০।
উৎসর্গ : আমাদের পরম পূজনীয়া। লক্ষ্মীরূপা স্নেহময়ী। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া দেবী। শ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম,

বৌদি, তোমার অসীম স্নেহ-করুণার চিহ্ন হাড়ে হাড়ে আঁকা আছে, ওর জন্য মুখে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু তোমার ঐ দুষ্ট-কৌতুক-প্রিয় রসনাটির জ্বালায় পাদপদ্মে চিরকৃতজ্ঞতায় বিকাইয়া গিয়াছি,—এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ না করিয়া কোনদিন অকৃতজ্ঞের মত মরিয়া যাই,—সেই ভয়ে দিন থাকিতে এই সরবৎটুকু তোমার তৃপ্ত্যর্থে উপহার দিয়া রাখিলাম—প্রণাম। তোমাদের স্নেহের —"তুল্লু"।

উপন্যাসের শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে একটি উপ-শিরোনাম আছে : মিষ্টি সরবৎ (কৌতুকাবহ গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

রঙীন ফানুস। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আড়াই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৫১, ১ [উৎসর্গপত্র], ১ [শুদ্ধিপত্র]। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ৩৪।
উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। কল্যাণীয়া কুমারী শ্রীমতী অপরাজিতা রায়, নিরাপদাসু।

স্নেহের খুকু,

কলেজের পাঠশ্রম-শ্রান্ত, রুগ্ন দুর্ব্বল দেহের দারুণ অবসন্নতা উপেক্ষা করে, —সেই জ্যৈষ্ঠের ঠিক-দুপুরে চুঁচড়া থেকে মেমারি ছুটে এসেছিল,—এই অপদার্থ মাসিমাকে দেখতে! মনে পড়ে সে দিনের কথা? ...কাহিল মেয়ের দুঃসাহসে আমি যখন ভয়ত্রস্ত, শুশ্রূষার আয়োজনে উদ্বেগ ব্যস্ত,—হতবুদ্ধি হয়ে দেখি মেয়ে-আমার তখন পরম নিরুদ্বেগে,—"রঙীন ফানুসের" অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পাঠে তন্ময়

বিভোর! আজও মনে পড়ে সেই অবসাদক্লান্ত ছোট্ট মেয়েটির—অপূর্ব্ব সুন্দর ধ্যানমগ্নতার ছবি! ধন্য আমি, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি!

অন্তর ভরা স্নেহের সঙ্গে আজ "রঙীন ফানুস" তোমার নামে উৎসর্গ করছি।

আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের মহৎ কর্ত্তব্যক্ষেত্রে নিজগুণে মহত্তর হও। তোমাদের জ্ঞানসাধনা যেন বিশুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠিত—সুন্দর কর্ম্মযোগে পূর্ণ সাফল্য লাভ কর। দীর্ঘায়ু হও। ইতি—একান্ত শুভার্থিনী, তোমাদের আদরের 'সন্ন্যাসিনী মাসিমা'। ৭ই শ্রাবণ। ১৩৪১, মেমারি।

শান্তি। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২২। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৭।
উৎসর্গ : কল্যাণীয় পুত্র শ্রীমান গৌরহরি ঘোষ ও কল্যাণীয়া পুত্রবধূ শ্রীমতী রেবারাণীর করকমলে—।

প্রিয় স্নেহের গৌরাঙ্গ দেব, বাবা, ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্টেই তোমাদের এই কাকিমাটিকে "মানুষ-মুনুষ" করেছ! দৌরাত্ম্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সমাদরে বাবার আসন দিয়েছি। শিক্ষা-মন্দির থেকে শ্রেষ্ঠ-সাফল্য আদায় করে এখন উচ্চতর জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সাগর পারে চলেছ,—পিতৃ-গৌরবে আজ তোমার কাকিমা সত্যই ধন্য। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধ হোক। নিরাপদে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে এস। নীতি ও ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হও।

পঞ্চকোট পাহাড় থেকে একদিন অজগর সাপের খোলস ঝড়ে উড়ে আমাদের সরবরির বাসায় এসেছিল। তার পুচ্ছটি দিয়ে চুপি চুপি আমার কলমটা অলঙ্কৃত করে আমায় চমকে দিয়েছিলে মনে আছে? সেই কলমেই এই শান্তি উপন্যাসখানা লিখে তোমাদের হাতে দিলাম। হিংস্র বিষাক্ত সর্পহননে তুমি চিরদিন সিদ্ধহস্ত; —সমাজের অনিষ্টকারী মানুষের অকল্যাণকারী কতকগুলা বিষাক্ত সর্পের সন্ধান দিলাম। জ্ঞান ও কর্ম্মবলে এই মানব-শত্রুগুলা সংহার করে তোমার মত কৃতী কর্ম্মবীররা দেশের কল্যাণ ও শান্তি আনয়ন করুন এই কামনা। অন্তরভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি শুভার্থিনী তোমাদের—কাকিমা। বর্দ্ধমান, ভাদ্র, ১৩৩৬।

সেখ আন্দু। (উপন্যাস)। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। আশ্বিন—১৩২৪। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ৩৩। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০৭, আখ্যাপত্র [১], উপহার [১], উৎসর্গ [১], ভূমিকা [১]।
উৎসর্গ : কল্যাণীয় দেবর—শ্রীমান শচীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি, এল সমীপেষু। শুভাকাঙ্ক্ষিণী —বৌঠান।

[আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়]

প্রকাশক—শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রী বিহারীলাল নাথ
"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা :

নমো নারায়ণায়

সবিনয় নিবেদন,

১৩২২ সালের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় "সেখ আন্দু" উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

যাঁহাদের উৎসাহ, সহানুভূতি, এবং যত্নানুকূল্যে আজ "আন্দু" সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে সাধারণে প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের মহানুভবতার চরণে কৃতজ্ঞ আনন্দে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান জানাইয়া,—জাতীয় উন্নতিকামী, উদারচেতা, হিন্দু মুসলমান হিতৈষী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তে আমার স্নেহের "আন্দু" সাদরে অর্পণ করিলাম। ইতি

মেমারি, বর্দ্ধমান
১৩২৪, আশ্বিন।

বিনীতা
লেখিকা

লেখিকার ভূমিকা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

"শেখ আন্দু" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রয়োজন বোধে এবার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম।

আমার উদ্দেশ্য বিচার করিয়া,—যাঁহারা আমার স্নেহের মানস-সন্তানকে সন্দেহ-করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন,—তাঁহারা আমার কৃতজ্ঞ-অন্তরের, সবিনয় শ্রদ্ধাভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি—

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বাং।

তৃতীয় সংস্করণ

"আন্দু" যখন বাংলা ১৩২২ সালে "মাসিক প্রবাসীতে" ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি একটি পত্র পাই। লেখক চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান ও সহকারী শিক্ষক, জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব! তাঁহারা দুজনেই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। একই পত্রে দু'জনের দস্তখত। তারিখ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ ইং। অবাক হই তাঁহাদের অযাচিত অনুগ্রহ এবং আন্তরিক অভিনন্দনে। আলোচ্য পত্রের সারাংশ "গোজারেশে" দ্রষ্টব্য। লেখক মহোদয়গণের বিদগ্ধ মনের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের পত্রে। আন্তরিক আকুতি মাখানো এবং বেদনা ব্যাকুল, তবে সংযত ভাষায় লেখা। আজ তাঁহারা জীবনের পরপারে। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেছিলাম যথা সময়ে। তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আবার নিবেদন করছি মঙ্গলময়ের দরবারে প্রার্থনা। মরণশীল মানুষ, তবে থেকে যায় সুরভিত স্মৃতি। ব্যর্থ হয় না প্রাণের আকুতি। মরহুমদের মিনতিও ব্যর্থ হয়নি। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতি তার প্রমাণ। কেটে গেছে কালো মেঘ। দেখছি সুদিনের সুন্দর প্রভাত। স্থায়ী হোক, উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হোক শুভ প্রভাত। সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর "আন্দুর" একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার" ৪র্থ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৮ বাং)। সমালোচক জনাব সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব। ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী সরস সমালোচনার শেষে সৈয়দ সাহেব বলেন—"লেখিকা আন্দুর ভিতর দিয়া একটি সরল, সবল, প্রেম-প্রবণ সত্যসন্ধ মুসলমান চরিত্র আঁকিয়াছেন।—আমরা আশা করি দাদাজীর মত উদার হিন্দু চরিত্র এবং আন্দুর মত ও আন্দু হইতে উৎকৃষ্ট আরও বহু মুসলমান চরিত্রের আবির্ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষ চির উদ্ভাসিত হইয়া, এই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলনকে সম্ভাবিত এবং নিকটবর্তী করিয়া দিবে।...হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লেখকদেরই এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত।" নিশ্চয়ই। সৈয়দ সাহেবের সহিত সুর মিলাইয়া আমিও বলি—"হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইবে। রাজনৈতিক কলোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া এ মিলন সম্ভবপর নহে। প্রকৃত মিলন প্রাণে—মনুষ্যত্বের পট-ভূমিকায়। ভৌগোলিক সীমারেখায় তাহা সীমাবদ্ধ নহে, সঙ্কুচিত বা বিঘ্ন-সঙ্কুলও হতে পারে না। অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। সুবিস্তৃত দুনিয়া আজ সুদূর-প্রসারিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। দৃষ্টি-কোণের প্রসার ও পরিবর্তন আবশ্যক। মনুষ্যত্বের আবেদন আমাদের সকলের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করা উচিত। প্রেমের পথই প্রকৃত পথ। অ-প্রেমের পিচ্ছিল পথে পদস্খলন ও পঙ্কিলতার বিড়ম্বনা। সকল দেশ, ধর্ম এবং সমাজেই রয়েছে মনুষ্যত্বের উপাদান ও অবদান। শেখ আন্দু ও দাদাজী নিয়মহীন ব্যতিক্রম নহে—সবে-ধন নীলমণিও নহে। ইহা আমার আন্তরিক অনুভূতি এবং আকীদা।"

"আন্দুর" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৮ বাং অগ্রহায়ণ মাসে। চৈত্র মাসের মাসিক "সহচরে" আন্দুর সমালোচনা করেন জনাব আবুল হোসেন সাহেব। ১২ পৃষ্ঠা

ব্যাপী সুদীর্ঘ সমালোচনায় তিনি "আব্দু" চরিত্রের নানা দিক বিশ্লেষণ করেন এবং অত্যন্ত সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সহিত মুসলমানী শব্দের বানান এবং ভাবধারা সম্পর্কিত কয়েকটি ভুল দেখিয়ে দেন। জনাব আবুল হোসেন সাহেবের গভীর জ্ঞানবত্তা এবং প্রখর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে অভিভূত হই। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধনে কৃত সঙ্কল্প হই। মুসলমান সমাজের বিদগ্ধ মনে "আব্দু" এতটা শ্রদ্ধা লাভ করতে পেরেছে জেনে গৌরব অনুভব করি।

১৩৫৩ সনে "আব্দুর" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের মনস্থ করি। তাঁহার প্রদর্শিত ভুল যথাযথ সংশোধনের জন্য জনাব আবুল হোসেন সাহেবের ঠিকানা অনুসন্ধানে উদ্যোগী হই। সাপ্তাহিক জাগরণের সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান সাহেব আমাকে জানালেন—"জনাব আবুল হোসেন সাহেব বাংলা সাহিত্যের একজন চিন্তাশীল লেখক ও সমঝদার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করে তিনি প্রথমে ঢাকা জজকোর্টে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। স্বল্প সময়ে তিনি ওকালতীতে বেশ নাম করেছিলেন। মুসলিম বাংলার তিনিই প্রথম 'এম-এল্—মাষ্টার ওফ ল'। ১৯২১-২৩ সনে ঢাকা ইউনিভারসিটির ছাত্র হিসাবে আমরা আবুল হোসেন সাহেবকে অধ্যাপক রূপে দেখি। এমন অধ্যয়ন-প্রিয় এবং অধ্যয়ন রত অধ্যাপক আমরা কমই দেখেছি। তিনি ছিলেন সত্যিকার জ্ঞান-সাধক। দুঃখের বিষয় আজ তিনি পরলোকে।"

১৩২৮ বাং (১৯২১ ইং) সালে যাঁর প্রজ্ঞা প্রোজ্জ্বল সমালোচনা পাঠে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ হয়েছিলাম, পঁচিশ বছর পরে পেলাম তাঁর পরিচয় ও শেষ ঠিকানা। দুর্ভাগ্য আমার। বেদনাহত চিত্তে লোকান্তরিত সুপণ্ডিত সমালোচক মহোদয়ের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে সংশোধিত "শেখ আব্দুর" তৃতীয় সংস্করণের সঙ্গে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য উৎসর্গ করছি। মঙ্গলময়ের দরবারে প্রার্থনা করছি তাঁহার মহান আত্মার সদগতি। মরহুম বেঁচে থাকলে তাঁহার প্রদর্শিত ভুল-ত্রুটি হয়তো তিনিই সংশোধন করতেন। সংশোধন হয়েছে, তবে সংশোধনের সদিচ্ছা যিনি প্রকাশ করেছিলেন প্রথমে, আজ তিনি জীবনের পরপারে। তাঁহার মহান স্মৃতির স্মরণে এবং সম্মানেই নিবেদন করলাম এই কথাগুলি।

সাহিত্য সেবা-সূত্রে লব্ধ পুত্র-প্রতিম পরম স্নেহাস্পদ মীজানুর রহমান আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বহু পূর্ব হতেই "আব্দুর" সহিত পরিচিত। দ্রষ্টব্য—"গোজারেশ"। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজের ঝামেলা এবং বিরল অবসরের মধ্যেও পরম অনুরাগে তিনি তাঁর স্নেহ-ধন্য "আব্দুকে" দেখে দিয়েছেন। অনভিজ্ঞ অপটু শিল্পীর হাতে "আব্দুর" আচার-ব্যবহার, বাচনিক ও পত্রালাপে যা-কিছু ত্রুটি ঘটেছিল এবার তা বাবাজীর শিল্প-নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হলো। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁহাকে বিপন্ন করবো না। অন্তরের স্নেহাশিস্ তাঁহার প্রাপ্য। জানাচ্ছি তা সর্বান্তঃকরণে।

উপসংহারে বাবাজীর মূল্যবান ও সুলিখিত "গোজারেশের" প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যরসিক সকলকেই এই বিষয়ে অবহিত হ'তে অনুরোধ জানাই। সাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণে অবাঞ্ছিত ব্যবধান সৃষ্টি নেহায়েৎ অসঙ্গত। পঙ্কিল, পিচ্ছিল, অশুভ সে পথ।

রাজনৈতিক অবস্থার আওতায় পড়ে "শেখ আন্দুর" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে অনেক দেরী হয়ে গেল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপর মানুষের হাত নেই। সংশোধিত "শেখ আন্দু" স্নেহাস্পদ মীজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানেই প্রকাশিত হলো এই আমার সান্ত্বনা। ইতি —জানুয়ারী ১৯৫৪ ইং।

বিনয়াবনতা—
শৈলবালা ঘোষজায়া

গোজারেশ*

১

শ্রদ্ধেয়া শৈলবালা ঘোষজায়া মহাশয়ার "শেখ আন্দু" সাগ্রহে পড়তাম যখন মাসিক প্রবাসীতে বাহির হতো মাসে মাসে। সাম্প্রদায়িক কোন্দল-কোলাহল কণ্টকিত সাহিত্য-আসরে "শেখ আন্দুর" অন্তর্নিহিত আদর্শ ও সুরটুকু ভাল লাগত। সে আজ ৩৫।৩৬ বৎসর আগেকার কথা।

ছাত্র জীবনেই পড়ি বঙ্কিম বাবুর প্রায় সব-গুলি উপন্যাস। মুগ্ধ হই তাঁর বিরাট সাহিত্য প্রতিভায়। তবে সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য যে, বঙ্কিম বাবুর কোন কোন উপন্যাসে মুসলমান সমাজের প্রতি অযথা ও অশোভন আক্রমণে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চিত হয় ক্ষোভ ও বেদনা। অন্য দিকে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত প্রভৃতির লেখা পড়ে রোমাঞ্চিত হই পুলকে। রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "ইসলাম কাহিনী" পড়ে অবাক হই মহানুভবতায়। উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ হই নিশ্চয়ই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি সার্ব্বজনীন সাহিত্যক্ষেত্র হ'তে সাম্প্রদায়িক দুষ্ট-ব্রণের প্রতিরোধে, পাল্টা আক্রমণ অনুদারতা বা অবিচারে নয়,—সুবিচারে ; অপ্রেমের পঙ্কিল পথে নয়,—প্রেম প্রীতির অধিকতর কার্যকরী পন্থায়। ডেপুটী বঙ্কিম বাবুর যুগ-প্রভাবিত—তথাপি অন্যায় আক্রমণ ও অবিচারের প্রতিকারের বাসনা আরো প্রবল হয়। তাই, সরকারী কাজে বাংলা দেশের যেখানেই গিয়েছি, সুযোগ মত সাহিত্য আসরে আনাগোনা করেছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পের বিদূরণে, নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে।

সাবেক জমানার ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সত্য হিসাবে "শেখ আন্দুর" "মাননীয়া মহোদয়া" লেখিকার নিকট লিখিত ২৩/২/১৯১৫ ইং তারিখের এক পত্র হতে কিছুটা উদ্ধৃত করি। "বিনয়াবনত" লেখক সাহেবান হ'চ্ছেন চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ হাই স্কুলের তদানীন্তন প্রধান সহকারী শিক্ষক, মরহুম মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন এবং মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। শেষোক্ত মরহুমই সুবিখ্যাত "শান্তিধারা" "নূরনবী" প্রভৃতির স্বনামধন্য লেখক।

*[১৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা—১৩৬০ বাং আশ্বিন মাসের মাসিক "মন্দিরা-র" শারদীয় সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত]

"....প্রবাসীতে আপনি সম্প্রতি 'আব্দু' নামে যে উপন্যাসখানি সমাপ্ত করিয়াছেন, ইহা আমরা গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। পাঠে, প্রাণে যে পরম পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পত্র তাহারই পরিচয় মাত্র। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষার উপন্যাস-সাহিত্য পাঠ করিতে বসিলেই, আমাদিগকে গভীর ব্যথা অনুভব করিতে হইয়াছে। আমরা এ যাবৎ দেখিয়া আসিয়াছি, মুসলমান নায়ক বা নায়িকা মানবোচিত মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে জানে না।...বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে হিন্দু লেখকের লেখনীমুখে মুসলমানের যে চরিত্র ফুটিয়াছে, তাহা ঘৃণা, লজ্জা ও পরিতাপেরই উত্তেজক।

"হিন্দু মুসলমানের মিলন পথে বঙ্গসাহিত্যের সুর যে কিরূপ বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। বোধ হয় গরু কোরবানীর অপেক্ষাও এই ব্যাপারটি অধিক মারাত্মক। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে সম্মানভাজন মোগল সম্রাট ও সম্রাট-তনয়াগণের জঘন্য চরিত্র চিত্র যখন মুসলমান যুবকের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তখন প্রতিহিংসার হলাহল তাহাদের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হয় এবং এইরূপে তাহা সমগ্র সমাজদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখন পর্য্যন্তও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকগণ দিল্লীর বেগম-মহল লইয়া যে লীলা খেলা প্রকট করিতেছেন, তাহা মুসলমানের পক্ষে অতীব বেদনাদায়ক ও অপমানজনক।

"এমতাবস্থায় আপনার 'আব্দু' উপন্যাস আমাদের নিকট কি আনন্দ ও গৌরবের দীপ্তি লইয়াই না উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু ঔপন্যাসিকের চিরাভ্যস্ত হিংসা-কালিমার পথ পরিত্যাগ পূর্বক আপনি মানবতা ও ভারতব্যাপী জাতীয়তার উদার সমতলে দাঁড়াইয়া 'আব্দু' চরিত্রের যে মাধুরী প্রদর্শন করিয়াছেন, মুসলমান যুবকের মধ্য দিয়া মানুষের প্রেমের যে বিচিত্র বর্ণরাগ ফুটাইয়াছেন, সবল ও সুমহান মনুষ্যত্বের যে প্রখর জ্যোতি উদভাসিত করিয়াছেন, তাহা যে কি ভাস্বর কি আনন্দ ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।....

"আজ আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে চাই যে, সামান্য মুসলমান যুবকের মধ্যে সর্বাবয়বপুষ্ট আদর্শ মানব-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া এবং 'দাদজীর' মধ্যে গোঁড়ামি স্পর্শ-মুক্ত নির্মম নিষ্কলঙ্ক উদারতার বিকাশ ঘটাইয়া আপনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাহিত্য-ক্ষেত্রে, জাতীয় সমবেত শ্রদ্ধার মধ্যে গৌরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া আপনার আসন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও উর্ধ্বে, বহু উর্ধ্বে। আপনার লেখনী ধন্য ও আপনার সাধনা জয়যুক্ত হউক। মঙ্গলময়ের নিকট আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।"

২

আটত্রিশ বৎসরের আগেকার লেখা, বাংলা-সাহিত্যের স্বনামধন্য সেবক ও সাধকের এই পত্রখানা নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সে যুগের বিক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজ-মনের ইহা সুন্দর, সাবলীল ও সংযত প্রকাশ। সময়ের আবর্ত্তনে আজ পট-পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিই আমার ইশারা। পাকিস্তানে অ-মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ।

মুসলমান সাহিত্যিকগণকে হুঁশিয়ার হতে হবে। "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি" হয়তো ঐতিহাসিক সত্য। তবে অন্যায়ের অনুবৃত্তি অন্যায়। অনুদারতা অবিদগ্ধ মনের বিকার। মোহর্‌রমের পবিত্র দশম দিবসে লিখ্‌ছি এই কথাগুলি। মনে পড়ছে বাংলার প্রাণ-চঞ্চল কবি, আদুরে দুলাল নজরুল ইসলামের কথা—

"বেটাদের লহু-রাঙা পিরাহান হাতে আহ্‌,
আরশের পায়া ধরি কাঁদে মাতা ফাতেমা—
এয় খোদা বদলাতে বেটাদের রক্‌তের
মার্জ্জনা কর গোনাহ্‌ পাপী কম্‌-বখ্‌তের"

মা ফাতেমার নয়ন-মণি ঈমাম হোসেনই শহীদ হয়েছিলেন কারবালা প্রান্তরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অনুচর সহ। মুস্‌লমানদের 'মোহর্‌রম' এই ঘটনারই স্মৃতি। হজরত ফাতেমা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফারই মেয়ে। মা ফাতেমার আদর্শ শুধু কবিকল্পনা নহে। ইষ্টকাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় হজরত মোহাম্মদও দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাৎ করেছিলেন এই বলে—"মাফ করো জালিমগণকে। জাহেল তারা। জানে না জুলুমের প্রতিফল।" শত্রুর প্রতি এমন ধারা উদারতার জন্যই কোরান শরীফে হজরতকে বলা হয়েছে—"রহ্‌মতুল্‌-লীল্‌-আলামীন"—বিশ্বসমূহের করুণা। এই করুণাময়, মানবতার মহাগুরুর মহান আদর্শ মুসলমান আমরা কতখানি পালন করি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, জানেন তা' আল্লাহ্‌-তালা। আরো জানে ভুক্তভোগী বোকার দল, উত্তেজনার অঙ্কুশ-তাড়নায় যারা করে বসে কেলেঙ্কারী এবং আখেরে যায় জেলে, মরে শুকিয়ে। তবু বুঝে না, শেখে না বোকার দল। কাঁদে ইসলাম। কাঁদে মানবতা।

হিন্দু সমাজের অবস্থাও তাই। ধর্ম্ম এবং রাজনীতির পণ্ডিত এবং পাণ্ডাদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হ'য়ে বোকার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে নষ্টামীতে। গো-মাতার নামে নিহত হয় 'নর-নারায়ণ'। গো-দেবতার কাল্পনিক বেদীতে উৎসর্গিত হয় সৃষ্টির-সেরা, "সবার-উপরে-সত্য-তাহার-উপরে-নাই" মানুষ। দুর্দৈব আর কাকে বলে? পরাধীন ভারতের এমনধারা অভিনয় বা অভিশাপের পুনরাবৃত্তি হবে স্বাধীন ভারতের এবং সত্যিকার আজাদীর অপমান। মনুষ্যত্বের অবমাননা ত বটেই। 'গরু মেরে জুতা দানের' চেয়েও 'নর-নারায়ণকে' নিধন করে 'গো মাতার' সংরক্ষণ অনেক বড় 'ট্রাজেডী'; গো-মাতাকেই প্রতিপালক-হীন করা! পাগলের দেশেই এমন পাগলামী সম্ভব।

৩

১৯৩৩-৩৪ ইং সনের কথা। রাজনৈতিক হট্টগোলে দেশের আকাশ বাতাস ভরপুর। গোলটেবিল বৈঠক হয়ে গেছে। একবার নয়—তিনবার। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। মজবুর হয়ে "রোয়দাদ" দিয়েছেন মাননীয় রামজে ম্যাকডোনাল্ড—শ্রমিক দলের নেতা এবং বৃটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। একাধারে 'হাঁ এবং না' এর নৈয়ায়িক নাযক এবং নাকের-ডগার বাইরে দেখতে নারাজ স্বার্থ সর্বস্ব সকলকে সন্তুষ্ট ক'রে রায় দেওয়া সালিশের পক্ষে সুকঠিন। বেচারা ম্যাকডোনাল্ড। গালি খেলে সবার কাছে। শোরগোলে

ভরে গেল দেশ, বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ বাংলা দেশ। তবে নিক্ষিপ্ত তীরের ফলা আর ফিরে এলো না। হজম করতে হলো রোয়দাদ সবাইকে।

রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডার প্রবল বন্যা সাহিত্য-সায়রেও প্রবিষ্ট হলো। অকারণে উঠলো কলরোল। 'প্রবাসীর' প্রবীণ সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে আপত্তির আরজী পেশ করলেন, "বাংলা ভাষায় শতকরা ৫৪টি মুসলমানী শব্দের আমদানীর অনুত্থাপিত দাবীর বিরুদ্ধে।" ভিত্তিহীন অভিযোগ। প্রতিবাদ করলুম "সাহিত্যের শরাফৎ" প্রবন্ধে। প্রকাশিত হলো মাসিক "মোহাম্মদীতে" সম্ভবতঃ ১৩৪২ বাং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। (কাগজখানা কাছে নেই। মাসের ভুল হতে পারে।) আলোচনা করলুম বাংলা ভাষার জাতি, গতি ও প্রকৃতি। প্রতীক্ষমান প্রতিবাদ চোখে পড়লো না। ভাবলুম—"কেল্লাহ্ ফতেহ্। তলিয়ে গেছে অহেতুকী আলোড়ন।" সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তারপর, এলো ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা। পাশ হলো আইন। শুরু হলো নিবাচনের তোড়জোড়। আসরে নামলো কংগ্রেস এবং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ। কিছুদিন পর ১৩৪৩ বাং বৈশাখ মাসে অধুনালুপ্ত মাসিক "বুলবুলে" প্রকাশিত হয় কথাসাহিত্যের যাদুকর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "অবাঞ্ছিত ব্যবধান"। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির আমদানী অবাঞ্ছিত, ইহাই ছিল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। প্রসঙ্গতঃ শরৎবাবু এমন কয়েকটি কথা বলেন, যার আলোচনা আবশ্যক মনে হয়। জ্যৈষ্ঠের "বুলবুলে" লিখি একটি আলোচনা। পরে জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ আরো কয়েকজন শরীক হন আলোচনায়।

আমার আলোচনার উপসংহারে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের খেদমতে সসঙ্কোচে একটি আরজ পেশ করি এই বলে—"সদিচ্ছা-প্রণোদিত কষাঘাতও অম্লানবদনে সহ্য করবে মুসলমান সমাজ। কথাসাহিত্যের সম্রাট শরৎবাবুকে তা পরখ করে দেখতে অনুরোধ করি।" কিছুদিন পর শরৎবাবু যান ঢাকায়। "ঢাকা সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে" সভাপতিত্ব করেন। আমি তখন কলিকাতায়। থাকি পার্ক সার্কাসে। অফিসফেরৎ কিনলাম আনন্দবাজার পত্রিকা। পড়লুম শরৎবাবুর ঢাকা অভিভাষণ। চোখে পড়লো শরৎবাবুর জওয়াব : "সদিচ্ছা প্রণোদিত নির্মম কষাঘাতও অম্লানবদনে সহ্য করবে মুসলমান সমাজ। মীজানুর রহমান সাহেবের এই মন্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করে যাব মৃত্যুর পূর্বে।" অবাক হলুম সাহিত্য-সম্রাটের এই অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতি এবং মহানুভবতায়।

শরৎবাবুর সহিত তখনো সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। সানন্দে পড়েছি তাঁর বহু উপন্যাস। শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাঁহার বিরাট প্রতিভাকে। অবশ্য নীরবে। সে জমানায় চাকুরি করি সমবায় বিভাগে। ১৩৩৪-৩৭ সালের কথা বলছি। অনেক হিন্দু সমবায়ীর সহিত আলাপ পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার গাঙুলি তাঁদের অন্যতম। পুরো নাম মনে পড়ছে না। আসলেন তিনি মোলাকাতে। কথায় কথায় বললুম শরৎবাবুর কথা। সাক্ষাতের বাসনা জানালুম, অপরিচয়ের অসুবিধার কথাও বললুম। ডাক্তার গাঙুলি শরৎ বাবুর অন্যতম

স্নেহভাজন। বললেন,—"আমি ব্যবস্থা করছি। চলুন এক সাথেই যাব। শরৎবাবু সুখী হবেন নিশ্চয়ই।"

কিছুদিন পরে কাগজে দেখলুম, শরৎ বাবু পরলোকে প্রস্থান করেছেন। ডাক্তার গাঙুলি আগেই বলেছিলেন—"শরৎ বাবু অসুস্থ। আছেন বালীগঞ্জ নার্সিং হোমে। ইদানীং সাগ্রহে পড়ছিলেন মুসলমান সমাজ সংক্রান্ত বহু পুস্তক। ওয়াকেফহাল হবার কোশেশ করছিলেন মুসলমানদের হালচাল সম্বন্ধে।" মনটা মুসড়ে গেল, দুঃখ হলো জীবনে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হলো না বলে। শরীক হলুম তাঁহার শোক সভায়। নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসলুম তাঁর পরলোকগত মহান আত্মার উদ্দেশে।

চাকুরীর চক্রায়মান চাকার আবর্তনে ১৯৪৪ ইং সালে গর্দানে চাপলো "Provincial Organizer, National War Front, Bengal" পোস্টের দায়িত্ব। দ্বিতীয় মহা-সমর তখনো চলছে। হতভাগ্য বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে ১৩৫০ বাংলা সনের মহামারীর নির্মম চাকা। মরেছে লক্ষ লক্ষ নর নারী। লড়াইয়ের লেঠা চোকেনি। বে-সামরিক জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক—নবজ বা নাড়ীও ঠিক রাখা চাই। জার্মান নায়ক হিটলারসাহেবের সহনায়ক Dr. Goebbels কুপোকাৎ করবার কোশেশ করছেন মিত্র শক্তিকে প্রচারণার ঘূর্ণিপাকে। দুনিয়ার সর্বত্র প্রবর্তিত হয়েছে Ministry of Publicity— প্রচারণার মন্ত্রিত্ব। ভারতের নানা প্রদেশেও প্রবর্তিত হয়েছে প্রচারণার নতুন প্রতিষ্ঠান—'National War Front' জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট।

২নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতায়, বাংলা ফ্রন্টের অফিস। দেখানো বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান—আসলে রাজনৈতিক বিভাগের লেজুড়। বেনামীতে বের হচ্ছে সাপ্তাহিক "নিবেদন" এবং আরো অনেক কিছু প্রচার পত্র। বে-নামী "নিবেদন" হলো সনামী "জাগরণ"। সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই পড়লো আমার উপর। তরুণদের জন্য খোলা হলো "সবুজ মহল" "দরদীর" তত্ত্বাবধানে। এক চালকেরই দুই দিক! সাড়া পড়লো সারা দেশে। দরদীর দফতরে আসতে লাগলো দৈনিক শতাধিক চিঠি, দামোদরের বন্যার মত। "দরদী" ভেসে গেল তরুণ প্রাণের প্লাবনে। বাহির হলো "জাগরণের" সবুজ সংখ্যা পহেলা জানুয়ারী ১৯৪৫ ইংরাজি তারিখে।

অক্টোবরে গিয়েছিলুম বাঁকুড়া—জাতীয় ফ্রন্টের পরিদর্শনে। দেখতে গেলুম "সত্যাশ্রম"। মোলাকাৎ হ'লো শরৎ বাবুর আত্মীয় ও জীবনীকার গাঙুলী মহাশয়ের সহিত। কথায় কথায় উঠলো 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' এবং পরবর্তী ঘটনার কথা গাঙুলি মহাশয় বললেন—"দরকারী কথা লিখে দিন। কাজে লাগবে জীবনচরিতে।" লিখলুম "ঋণ পরিশোধ"। প্রকাশিত হ'লো "জাগরণের" সবুজসংখ্যায়। "শেখ আন্দুর" উল্লেখ ছিল প্রসঙ্গতঃ। শ্রদ্ধেয়া শৈলবালা ঘোষজায়া মহাশয়ার নজরে পড়লো। তাঁর একটি গল্পও বেরিয়েছিল সবুজ সংখ্যায়। পত্রালাপের সূত্রপাত হ'লো। "শেখ আন্দু" তখনো "সেখ আন্দু"—পাঠিয়ে দিলেন মুসলমানী শব্দ ও ভাবধারার অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটিগুলি সংশোধন করে দিতে। সানন্দে রাজী হলুম। "গোজারেশের"ও অনুমতি দিলেন। বাকী কথা তাঁর ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। সংশোধিত 'শেখ আন্দুর' জন্যই এই গোজারেশ।

এইবার আসল "গোজারেশ"। অগ্রকথায় বয়ান করলুম বুনিয়াদ, উদ্দেশ্য-সাধনের

সহায়রূপে। কথাগুলির কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। কোন কোন সাহিত্যিকের অজ্ঞতা অবিবেচনায়, অবিমৃষ্যকারিতায় বা অবিদগ্ধ মনের অংকুশ-তাড়নায় দেশের, দশের এবং সাহিত্যের যথেষ্ট লোকসান হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি কোন্দল কলহ বেড়েছে। অবাঞ্ছিত অতীতের অধিকতর আলোচনা অনাবশ্যক।

অতল তলে তলিয়ে যাক অপ্রেমের আবর্জনা। অতীত হোক অবাঞ্ছিত অতীত। ঘুচে গেছে গোলামীর গ্লানি। আজাদ দেশের আজাদ বাশেন্দা আমরা। সৃষ্টি করবো নতুন ভবিষ্যৎ। আনবো রাঙা প্রভাত। বদলাবো দৃষ্টি কোণ। কেন, সংক্ষেপে নিবেদন করি।

সাহিত্য দেশ ও জাতির সমষ্টিগত চিত্র বা প্রতিবিম্ব। অন্ততঃ হওয়া সংগত। সুদৃশ্য, আনন্দকর। কুদৃশ্য, বিরক্তিকর। অবশ্য সু ও কু নিয়েই জীবন। আলো ও আঁধার প্রকৃতির নিয়ম। আঁধার আছে বলেই আলোর সার্থকতা। কেবল সু নিয়েই সাহিত্যর কারবার নয়। হওয়াও উচিত নয়। তবে, গোলমাল বাঁধে অঙ্কনের ধারা বা মনোবৃত্তি নিয়ে। সদিচ্ছাপ্রণোদিত কষাঘাতও সহ্য, এমন কি কাম্য, প্রতীকারের উদ্দেশ্যে, প্রেম প্রীতির প্রলেপে। অপ্রেমের উপর বিদ্বেষের বিড়ম্বনা হলেই লেঠা। লেঠা হতে লেগে যায় লাঠালাঠি। প্রেমের পরশেই পবিত্র হয় পঙ্কিল পরাণ। সাহিত্যে সু ও কু এর প্রতিবিম্ব থাকবেই। চিত্র নয়—চিত্রাঙ্কনের ধারা এবং উদ্দেশ্যই আসল কথা। অন্য কথায়—দৃষ্টিকোণ।

বাংলা সাহিত্য আজও সমগ্র দেশের সমষ্টিগত জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হ'তে পারেনি। অধিকন্তু অপ্রেম এবং অবাঞ্ছিত ব্যবধানেরও আকর হয়েছে, অন্তত অতীতে, অনেক কারণে ; তন্মধ্যে অজানার অপরিচিতি অন্যতম। অজানা বা অজ্ঞতা অগৌরবের। জানাই জীবন। পরিচিতির পরশ-পাথরেই ব্যবধানের বিভীষিকা সত্যিকার সম্প্রীতির সোনালী বন্ধনে পরিণত হওয়া সম্ভব। সাহিত্যসেবীগণকে এ কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। আগুন জ্বালানো সহজ—নিভানোই মুশকিল। অসির চেয়েও মসীর শক্তি বেশী। কলমের কৌশলে ও কালিমায় স্বচ্ছ, সুন্দর, উজ্জ্বল এবং প্রোজ্জ্বলকেও কলুষিত করা যায়।

সদিচ্ছার মাপ-কাঠিতে "শেখ আন্দু" বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য অবদান। লেখিকার সংকীর্ণতামুক্ত দারাজ দিলের দর্পণ। দৃষ্টান্ত—দর্জী দুলাল, মটর ড্রাইভার 'শেখ আন্দু' (আনোয়ারুদ্দীন) এবং চতুষ্পাঠির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক "দাদাজী" বা পণ্ডিত রামশঙ্কর চৌবের সম্পর্ক, সৌহৃদ্য, সহনশীলতার সুন্দর শিক্ষণীয়, প্রাণস্পর্শী চিত্র। সাহিত্যের মারফতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপন এবং অবাঞ্ছিত ব্যবধান নিরসনের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য লেখিকাকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ।

"শেখ আন্দুর" সাহিত্যিক আলোচনা আমার কাম্য নহে, প্রথিতনামা সাহিত্যিক জনাব আবুল হোসেন, এম-এ, বি-এল, এম-এল (মরহুম) এবং জনাব সৈয়দ ইমদাদ আলী সাহেবানদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। পঠিত পুস্তকের সত্যিকার বিচারক পাঠক-গোষ্ঠী। ভাল লাগা না-লাগা অনেকটা ব্যক্তিগত রুচি এবং দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভরশীল। নানা মুনির নানা মত এবং নানা লোকের নানা রুচি। আমার কাছে যা সুখকর, অন্যের কাছে সুখকর নাও হ'তে পারে। "শেখ আন্দুর" অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের উপর সুন্দর আলোকপাত করেছেন মরহুম এয়াকুব আলী চৌধুরী ও মরহুম মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী। আবয়বিক

এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথার আলোচনাই আমার কাম্য।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা "সেখ আব্দুকে" "শেখ আব্দু" করেছেন সানন্দে। মুসলমানী শব্দগুলির সংশোধনেও তিনি রাজী হয়েছেন সাগ্রহে। ইহা তাঁর বিদগ্ধ মনের পরিচায়ক। মনই মানুষের সাম্রাজ্য। ভুল ত্রুটি অস্বাভাবিক নহে। সংশোধনের প্রবৃত্তি প্রশংসনীয়। ধরুন "শেখের" কথা। "শেখ" আরবী শব্দ ; মানে "সরদার" "মোরশেদ" (ধর্মগুরু)। "সেখ" বা "শেক" "শেখের" অর্থহীন বিকৃতি—জাত মারাও বলা যেতে পারে। একটা ভাল শব্দের জাত মেরে লাভ কী? মেহ্মানের অমর্যাদা অত্যন্ত অন্যায় এবং অশোভন। তবে, মেহ্মানদারী বা মেহ্মান নওয়াজী—আতিথেয়তা, নেহায়েৎ শোভন এবং শরাফতের নমুনা।

দুনিয়ার কোন ভাষাই 'কাফী' বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ভাষার দরবারে আমদানী রফতানী শুধু পুরাণো রীতি নয়—জরুরী। ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাষার তথা-কথিত জাত বা বিশুদ্ধতা নিয়ে বাড়বাড়ি বোকামী। নজরুলের কথায় "জাতের নামে বজ্জাতি" আর "জালজালিয়াতী যাক জাহান্নামে।"

যাক সে কথা। কোন ভাষাই কারো খাস মীরাস বা তাল্লুক নহে। আমদানী-রফতানীর প্রচলন এবং আবশ্যকতা অবশ্যস্বীকার্য। আয়েব নেই এতে। পরকে আপন করে নেওয়া অন্যায় নয়—উদারতা। তবে, দরকারে ডেকে এনে অঙ্গহানি করা অন্যায়—অনুদারতা ; অতিথিব অপমান। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা ভাষাবিশেষের সাবলীল বিকাশেরও পরিপন্থী। আমদানীতে বৃদ্ধি পায় ভাষার শক্তি ; সূচিত হয় সজীবতা। তবে, আগেই বলেছি, আবার বলছি—অতিথির অপমান অন্যায়। মুসলমানী শরীয়ত মতে তিন দিনের বেশী থাকলে 'মুসাফির' বনে যায় মুকীম—অতিথি হয়ে যায় গৃহী, মেহ্মান হয় মেজবান। আরবী-ফারসী হতে আমদানী শব্দগুলি বহু বৎসরের দখলী স্বত্বে স্বত্ববান।

জমানার জরুরাতে, অবস্থার প্রভাবে, দরকারের দায়ে বাংলা ভাষাকে শত শত শব্দ গ্রহণ করতে হয়েছে অন্যান্য ভাষা হ'তে। আসলে, ভাষাই পাঁচমিশালী! নানা ঘাটের পানীতেই পূর্ণ হয়েছে বাংলা ভাষার মঙ্গল ঘট। তবু জাত গেল রব। সুখের বিষয়, সে আবদারের দফা রফা হয়েছে। তবে, মেহ্মান বনাম মেজবানের অপমান শেষ হয়নি। অজ্ঞতার জন্যই হোক, কিম্বা অসাবধানতার জন্যই হোক, ত্রুটী দেখিয়ে দেবার পর সংশোধন করা সংগত:

'শেখের' দুর্দশা বয়ান করেছি। আরো কয়েকটি নিত্য-প্রচলিত শব্দের দুর্দশার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

শুদ্ধ বা কম অশুদ্ধ		**অশুদ্ধ বা বিকৃতি**
ইসলাম, ইছলাম	...	ইশলাম, ইস্লাম
মুসলমান, মুছলমান	...	মুশলমান,
মুসলিম, মুছলিম	...	মুশলিম, মুস্লীম
মোহাম্মদ, মুহম্মদ	...	মাহাম্মদ, মহাম্মদ
আহ্মদ, আহমাদ	...	আহাম্মদ, আমেদ

শুদ্ধ বা কম অশুদ্ধ		অশুদ্ধ বা বিকৃতি
মোকদ্দমা	...	মোকর্দমা, মোকর্দ্দমা
মোখতার	...	মোক্তার
এশতেহার, ইশতেহার	...	ইস্তাহার
জওয়াব	...	জবাব
শরীয়ৎ, শরা'	...	সরিয়ৎ, সরা
হাদীস, হাদীছ	...	হদীশ
আহ্‌মক, আহমকী	...	আহাম্মক, আহাম্মকী

আরো বহু নজীর পেশ করা যেতে পারে। পুঁথি বাড়ানো অনাবশ্যক। বিদেশী শব্দের বানান নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে ; তবে বিকৃতি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। ইস্‌লাম, মুস্‌লিম, মোহাম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মীয় শব্দগুলিকে ইশলাম, মুশলিম, মাহাম্মদ রূপে দেখলে বিদগ্ধ মুসলমানের চোখে অত্যন্ত অশোভন লাগে। অহেতুক কষ্টেরও কারণ হয়। যেমন কোন 'হিন্দুকে' 'হিঁদু', ব্রাহ্মণকে "ভ্রাম্মন", সেনকে "শেন" লিখলে শুধু ভুল করা হলো না. তাঁদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হ'লো। হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস দৈনন্দিন ব্যবহৃত ধর্ম্মীয় পরিভাষার মূল শব্দগুলির মানে-মতলব এবং বানান-প্রণালীতে অজ্ঞতা এবং বিকৃতিকে সমর্থন করা চলে না। যাঁদের পরিভাষা তাঁদের ভাষাবিদ বিদগ্ধ লেখকদের অনুসরণ করলেই লেঠা চুকে যেতে পারে। সকলের খেদমতে এই আরজটুকু পেশ করেই হোক গোজারেশ বা নিবেদনের পরিসমাপ্তি।

আরজ গোজার—
মীজানুর রহমান

"সেখ আন্দু"
(প্রতিবাদ)

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত ১৩২২ বঙ্গাব্দের "বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে বাৎসরিক হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষের সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের ভারপ্রাপ্ত বিবরণ প্রস্তুত-কারক, সুতরাং—অন্ততঃ আমরা মানিয়া লইতেছি,—তাঁহার মতামতের গুরুত্ব অবশ্যগ্রাহ্য, কিন্তু তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য পালনে অসতর্কতার ত্রুটি সম্বন্ধে, তাঁহার নিজের ভাষায় কথিত কৈফিয়তটুকু* উপলক্ষ্য করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে আমি এই ব্যবকলনে অগ্রসর হইয়াছি।

* "এই সাহিত্য বিবরণীতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা দুই চারি কথা বলা হয় তাহারও একটা পরোক্ষ ফল সাহিত্যের উপর ফলে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে চেষ্টায় যদি কেহ ত্রুটি দেখেন তাহা আমার ত্রুটি বলিয়া বুঝিবেন, পরিষদের নয়।" —*মানসী ও মর্ম্মবাণী*—কার্ত্তিক।

উপন্যাস-সাহিত্য-প্রসঙ্গে শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া মহাশয়ার "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "সেখ আন্দু" উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন,, তাহা কি যথার্থ যুক্তিযুক্ত ও ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য? বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেখ আন্দু" পাঠে মুসলমান মোটর চালকের *"সহিত"* ...প্রেমে পড়ার সংবাদটুকু কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য সবিনয় প্রশ্ন করিতেছি, "সহিত" শব্দটুকু ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহার অর্থ এবং প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁহার একটু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না কি?

তিনি বক্র-শ্লেষোক্তির সহিত প্রশ্ন করিয়াছেন,—"সহিস ও মুসলমান মোটর চালকের সহিত শিক্ষিতা বঙ্গবালার প্রেমে পড়ার চিত্রটা কি এতই স্বাভাবিক?"—তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া আমরাও স্তম্ভিত হইয়াছি! তীক্ষ্ণদর্শী বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি উপন্যাস পাঠে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে লেখিকা উহা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন? ভাল, তাহাই প্রচার করা যদি লেখিকার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার 'আন্দু' ঘৃণার ধিক্কারে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল, কিসের আক্ষেপে?

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথিত "প্রেমে পড়ার" অভিযোগটা প্যাঁচাল ফাঁদে ঘুরাইয়া দেখিতে গেলে অবশ্য একেবারে 'না' বলিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইলেও লতিকার—অর্থাৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহাকে "বিশেষতঃ লাবণ্যের" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—চরিত্র প্রসঙ্গে বচন-বাজির কারদানী দেখাইতে চেষ্টা করা আদৌ সমীচীন নহে; কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, "বিশেষতঃ লাবণ্যের" চরিত্র তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটনের জন্যই লেখিকা অঙ্কিত করিয়াছেন। —স্ত্রীলোকের জাতিগত বিশেষত্ব প্রকটন করাই যদি লেখিকার উদ্দেশ্য থাকিত, তবে লতিকাকে আমরা কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী, মাতা—বা যে কোন অবস্থাতেই হউক—এমনতর অদ্ভুত খাপছাড়া মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতাম না।

তবে জ্যোৎস্নাকে লইয়া যদি বিচার করিতে বসা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—এ প্রেম, প্রেম বটে, কিন্তু সেই মামুলী গতে বাঁধা বিলাস বিভ্রমের হাব-ভাব তৃষ্ণা, লালসা এ প্রেমের কোন অংশকে কুৎসিত ও পঙ্কিল করে নাই। এ প্রেমের উদ্ভব আত্ম-বিস্মৃতিতে, এ প্রেমের পরিপালন আত্মদ্বন্দ্বে আত্মত্যাগের চেষ্টায়, —আর এ প্রেমের পরিসমাপ্তি—আত্মজয়ে। —লেখিকা দেখাইয়াছেন, এ প্রেমের চরম বেদনাই, পরম সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ! চোখের জল ও বুক ভরা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসেই ইহা আদ্যন্ত পরিপূর্ণ, —তাই সকলের শেষে আমরা 'আন্দু'র মুখেই স্পষ্ট কৈফিয়ত শুনিতে পাই,—'এ হৃদয়হীন ছেলেখেলায় পরিতাপের কুটুম্বিতা নয়, ...এ প্রাণের গোপনে প্রাণের আদর্শ পূজার উন্মাদ সাধনা,...!' বিদ্যাভূষণ মহাশয় তথাপি ইহাকে "জঘন্য চিত্র" ঠাহরাইলেন কি হিসাবে বলা কঠিন।

সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুতকারক মহাশয় দায়ের পাট সাবিবার জন্য যথেচ্ছভাবে দুই এক কথা বলিবার উদ্দেশ্য মাত্র সম্বল করিয়া "সেখ আন্দু" প্রভৃতি উপন্যাসের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা ঠিক জানি না,—কিন্তু তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধহীন অসংলগ্ন বাক্যালোচনা যে শোভনীয় নহে, এটুকু

তাঁহার মনে রাখা অবশ্য উচিত ছিল।

সদৃশ চিত্রাঙ্কনে "বাহাদুরীবোধ"কারী পুরুষ লেখকের সংবাদটুকু "আন্দু" উপন্যাস প্রসঙ্গে না গুঁজিয়া দিলেও বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যের কোন মারাত্মক ক্ষতি হইত না, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পদমর্য্যাদারও বোধ হয় তাহাতে কিছুমাত্র হানি হইত না। বরং এ বিষয়ে তাঁহার ভাষা আর একটু সংযত হইলেই ভদ্রতা ও শিষ্টতা বেশী প্রকাশ পাইত।

সংক্রামক রোগের ভয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শঙ্কিত হইয়াছেন দেখিয়া, আমরাও বাস্তবিক বড় দুঃশ্চিন্তায় পড়িয়াছি। এবং বড় দুঃখেই প্রশ্ন করিতেছি যে কেবলমাত্র জাতি, ধর্ম্ম, ব্যবসায় এবং উন্নত সামাজিক মর্য্যাদার গণ্ডীর ভিতরই কি মানবজাতির সমস্ত মানবত্ব, মহত্ত্ব, ও বিশেষত্ব নিহিত আছে? তাহার বাহিরে কি কিছুই নাই—এবং থাকিলেও, তাহার দিকে চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টিপাত করা কি এতই দূষণীয় কাজ? মানবাত্মার সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, মর্ম্মবেদনা, এ সকল অনুভূতি কি শুধু বিলাসী ধনী সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া? পরিশ্রমী দরিদ্রের আত্মার পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব? বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখিকাকে bold বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন ; তথাপি তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, "লেখিকা বঙ্গমহিলা হইয়া বঙ্গমহিলার সম্বন্ধে কেমন করিয়া এই জঘন্য চিত্র অঙ্কন করিলেন?"

তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে এখনই দেশী বিদেশী এমন অনেক লেখক লেখিকার নাম করিতে পারা যায়, যাঁহারা স্বরচিত কাব্য বা উপন্যাসের নায়িকাকে নিছক দেবীত্বের ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করেন নাই। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকাগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, রামলীলার অভিনয় কেবল মাত্র রামচন্দ্রকে লইয়া চলিতে পারে না,—আরও অনেককেই প্রয়োজন হয়। রাবণ না থাকিলে, রামচন্দ্র অমন পরীক্ষাসঙ্কটে না পড়িলে, —তাঁহার সেই অতুলনীয় চরিত্রস্ফূর্ত্তি আমরা কি দেখিতে পাইতাম?

তবে একটা কথা—নিজের হাতে নিজের হৃদপিণ্ডের উপর অমন শক্ত জোরে ছুরি চালানর সাহস সকলের থাকে না একথা শতবার স্বীকার্য্য। —এ সাহস যে কঠোর দুঃসাহসিকতা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে লেখিকার এ দুঃসাহসিকতার উদ্দেশ্যটা কি? ইহা কি বাস্তবিকই কেবল বাহাদুরী, না মর্ম্মান্তিক সন্তাপে মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ? —যাহার অন্তরে আত্মপ্রত্যয়-বোধ জাগ্রত হইয়াছে, অনিষ্টকর আত্মাভিমানের অন্ধপূজা তাঁহার নিকট হয়ত লোভনীয় নহে। সত্য, শিব, সুন্দরের জন্য কল্যাণের চরণে আত্মাভিমান বলি দিতে তিনি হয়ত দ্বিধা বোধ করেন না। "সেখ আন্দু" রচয়িত্রী গতানুগতিকের বিধি সাহস পূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যথেচ্ছ মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না কি?

মামুলী প্রেমের বাঁধিগৎ আমাদের মগজের মধ্যে এমনই জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছে যে, জগৎ চিরদিন গতানুগতিকের পথে চলে নাই, চলিবেও না, এই সত্যটা আজকাল আমরা কোন মতেই ধারণা করিতে পারি না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেখ আন্দু" উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যটুকু বাদ দিয়া তাহার হাড় ও চামড়া লইয়াই শুধু নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, বাস্তবিকই কি এ উপন্যাসে দেখিবার বিষয়, বুঝিবার বিষয়, শিখিবার বিষয় কিছুই নাই? "সাহিত্য যুগ ধর্ম্ম অবলম্বন করে বলিয়া ইহা লোকশিক্ষা ও সমাজগঠনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়"—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আন্দু উপন্যাসের মধ্যেও আমাদের দেখিবার বিষয় কিছু আছে বৈকি। দাদাজীর চরিত্রের মধ্যেও কি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখিবার কি বলিবার মত কিছু পান নাই?

শুধু অংশকে লইয়া অনাবশ্যক তর্ক কোলাহল এবং অসার ও অযৌক্তিক মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত ব্যক্তির পক্ষে, দায়িত্বজ্ঞানের মর্য্যাদা স্মরণ রাখিয়া, সমগ্রকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা একান্ত উচিত ছিল। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার নিরবচ্ছিন্ন কুৎসা সৃষ্টির জন্যই "সেখ আন্দু" রচয়িত্রী উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেখ আন্দু" পাঠে কি ইহাই বুঝিলেন? —যদি বাস্তবিকই তাহাই বুঝিয়া থাকেন, তবে ইহা যে একান্তই দুঃখের বিষয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, লেখিকা মহাশয়া নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া দেখাইয়াছেন, স্ত্রী হোক পুরুষ হোক—ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা-সার্থকতা গৌরবের জিনিষ, কিন্তু অসার শিক্ষাগর্ব্ব তাহার আত্মার অপমানেব হেতু! তাই অলীক কল্পনার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্যা লতিকাকে আমরা এমন দৃষ্টিবিক্ষোভ ও চিত্তগ্লানি-উৎপাদনকারিণী বেশে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার জন্য লেখিকাকে অপরাধী করা কি ন্যায়সঙ্গত বিধি?

বিশ্বের মানব-প্রকৃতি বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মানুষ মন্দ নহে, প্রকৃতির পাকচক্রে মানুষ নিজের হাতে ভালমন্দের শৃঙ্খল পরে এবং খুলে। সংঘর্ষণ ব্যতীত মহত্ত্বের বিকাশও সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই 'আন্দু'র পাশে ঐ নারী-চরিত্র দুইটি আমরা আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। তথাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথিত "জঘন্যতা" আমরা মানিয়া লইতে পারি না। "প্রেমে পড়া" আর উন্নত চরিত্র মাধুর্য্যের গুণমাহাত্ম্যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে অজ্ঞাতে মুগ্ধ হইয়া পড়া কি একই ব্যাপার? কখনই না!

যদি বলেন, একজন সামান্য শোফেয়ারকে এরূপ মহৎ করিয়া আঁকিয়া লেখিকা ভাল করেন নাই, তবে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে—জাতি বা ব্যবসায়ের অপরাধে মানুষের ব্যক্তিত্বের গুণগৌরবও নামঞ্জুর হওয়া কখনই উচিত নহে।

আসল কথা, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের উপর ঝোঁক দিয়া, মাত্র সেই আদর্শের পরিমাপে বিশ্বের বিচিত্র আদর্শ ও বিভিন্ন বিশেষত্বকে মাপজোক করিতে বসিলে, তাহার ফলে স্বেচ্ছাতৃপ্তিকর বাক্যালোচনা সুন্দররূপে চলিতে পারে, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যালোচনা তাহাতে খর্ব্ব ও আহত হয় ; সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩২৩

উ প ন্যা স (বর্ণানুক্রমিক তালিকা, প্রকাশতারিখ-বিহীন)

.

ঘৃণাহতা। কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির। ১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪৬। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৩। উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। বঙ্গবাণীর বরেণ্য-সেবক—আমার আন্তরিক-সম্মান-ভাজন, স্নেহের সন্তান—শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী দত্ত ও শ্রীমান শরৎচন্দ্র পাল শ্রীকরকমলেষু—। চির-মঙ্গল প্রার্থিনী, 'মা'। শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

.

উপন্যাসের শেষে বিজ্ঞাপন অংশে লেখা আছে :

আমাদের স্থায়ী লেখিকা
সরস্বতী—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত
আর একখানি উপন্যাসের রাণী
সই
আমাদের 'কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' হইতেই
প্রকাশিত হইবে।
"কোন সংখ্যায়?" "কৃপায় থাকুন প্রতীক্ষায়।"

জন্ম-অপরাধী। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। কর মজুমদার এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিলডিংস, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২২৭, [১]। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২৫। প্রতিটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম-যুক্ত। নিচে ক্রমানুসারে প্রতি পরিচ্ছেদের শিরোনামের তালিকা দেওয়া হল :

'বরের চিঠি', ডাক্তার বাবু, শ্বশুরালয়ে, যাত্‌-সমাগমে, বিনোদলাল, দাম্পত্য 'প্রেম', বড়বউ, পূর্ব্বকথা, বিধুর যত্ন, গার্হস্থ্য বিধান, চরম মাধুর্য্য, অন্য-পক্ষে, প্রবাসে, সৌভাগ্যের দর্প, হতভাগ্যের লাঞ্ছনা, কুমুদের আগমন, কুমুদের সংবাদ, দেবতার কর্ত্তব্য, তারপর নিয়তি, অপরিসীম ঔদার্য্য, বৈষম্যের স্কন্ধে, বড় আক্ষেপ, ডেঁপোমীর দণ্ড, চরম নৈরাশ্যে, শেষ কথা।

. .

সই। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির। ১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৭০। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৫। উপন্যাসের শেষে সর্বশেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে : Copyright reserved by the Publisher.

তেজস্বতী। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৯। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২৫।

উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উল্লেখ আছে :

উপন্যাসটির প্রথমাংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "তৃপ্তির সাধনা" নামে কাশীধামের

"প্রবাস-জ্যোতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা আমূল সংশোধিত করা হইল—লেখিকা।

নমিতা। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৫৯। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ৩১।

বিভ্রাট। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে : প্রকাশক—শ্রী গোপালদাস মজুমদার ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম : দেড় টাকা [All rights reserved to the Publisher.]। প্রিন্টার—শ্রী গোবর্দ্ধন মণ্ডল, আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭ জি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৬। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৫।

বিনীতা-দি। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২১। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৩।

মহিমা দেবী। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৪। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৬।

আমাদের ব্যবহাব কবা কপিতে প্রথম দশটি পবিচ্ছেদ-সংখ্যার নিচে কলমে প্রতি পরিচ্ছেদের এক-একটি শিরোনাম লেখা আছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	প্রতিহিংসা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইন্ধন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	জাল বিস্তার
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বিহঙ্গ পালে পড়িল
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	নবাব মহাবুর খাঁ
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	বিদায়
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	চক্রান্ত
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	দ্বন্দ্ব
নবম পরিচ্ছেদ	:	হত্যা
দশম পরিচ্ছেদ	:	সম্রাটের "চাল"।

লীনার শিক্ষা। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। মূল্য ১ টাকা বারো আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা . ১৫০ পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ১৭। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

স্নিগ্ধা। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে : দুই টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পক্ষ হইতে শ্রী নরেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৬৮ [আখ্যাপত্র ১, উৎসর্গপত্র ১]। পরিচ্ছেদ সংখ্যা : ২৫।
উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা রায় শ্রীকরকমলেষু—। স্নেহের কবি,—/স্নেহের দৌরাত্ম্য তব, আছে,—আছে মনে। /লহ এ বেদনা স্মৃতি—আশীর্ব্বাদ সনে।। ইতি স্নেহধন্যা শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া।

গ ল্প স ং ক ল ন (বর্ণানুক্রমিক তালিকা, প্রকাশতারিখসহ)

অকাল-কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি। (আট আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষড়শীতিতম গ্রন্থ)। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চৈত্র ১৩২৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৩২।
সূচি : অকাল-কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি, বিজয়ার নমস্কার, সূক্ষ্ম-ধর্ম্মজ্ঞান, লোকসানের সন্ধ্যায়।

থিয়েটার দেখা। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৪/১বি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ [প্রথম সংস্করণ]। দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৯, [১১]।
সূচি : থিয়েটার দেখা, মনীষা, আদেশ পালন, অভিনেতার একরাত্রি, ঐন্দ্রজালিক।

মুচি। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০ আষাঢ়, ১৩৪০। দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৪।
আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

প্রকাশক—শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি। ১৪/১বি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। প্রিণ্টার —মিহিরচন্দ্র ঘোষ, নিউ সরস্বতী প্রেস, ২৫/এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি : মুচি, প্রেতাত্মার জবান-বন্দী, কার্য্য-কারণ

রুদ্রকান্ত। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে : প্রকাশক—শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়। ১৪/১বি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ। নিউ সরস্বতী প্রেস। ২৫/৩/এ শম্ভু চ্যাটার্জিব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জুলাই ১৯৩৪। দু' টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫১।
সূচি : রুদ্রকান্ত, দাদা-মশায়ের বে, লাফো, উপযুক্ত শিষ্টাচার, শূরের শৌর্য্য।

গ ল্প সং ক ল ন (বর্ণানুক্রমিক তালিকা, প্রকাশতারিখ-বিহীন)

অভিনেত্রীর একরাত্রি। শৈলবালা ঘোষজায়া। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯৪।
সূচি : অভিনেত্রীর একরাত্রি (পৃ. ১-২৫), প্রেতাত্মার জবান-বন্দী (পৃ. ২৬-৮৭), মুচি (পৃ. ৮৮-১১৩), থিয়েটার দেখা (পৃ. ১১৪-৪৮), ঐন্দ্রজালিক (পৃ. ১৪৯-৬৫), উপযুক্ত শিষ্টাচার (পৃ. ১৬৬-৬৯), শূরের শৌর্য্য (পৃ. ১৭০-৯৪)।

আড়াই চাল। (গল্প ও উপন্যাস)। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। কলিকাতা, ৯নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেলড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী। মূল্য : ১৷৹ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯০।
সূচি : আড়াই চাল, বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল (নক্সা), বীণার সমাধি, পয়সার প্রতাপ, কর্পূরের মালা, মাতৃ-স্নেহ, একাদশী, ননী খানসামার ছুটি যাপন।
আড়াই চাল গল্পসংকলনের একটি সমালোচনা *মানসী ও মর্ম্মবাণী*-র ভাদ্র ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে সেটি মুদ্রিত হল :

> **আড়াই চাল**। (গল্প ও উপন্যাস)। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। কলিকাতা, ৯নং নন্দকুমাব চৌধুবীর ২য় লেন, এমাবেলড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ২০১ নং কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী। ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য : ১৷৹
> একখানি ছোট উপন্যাস। "আডাই চাল" এই গ্রন্থেব উপন্যাসাংশ, তা ছাড়া সাতটি গল্প ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। "আডাই চাল" উপন্যাসখানি ইতঃপূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তেই প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই—পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন।
>
> গ্রন্থনিবদ্ধ গল্প কয়টিই আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। "ননী খানসামার ছুটি যাপন" একটি উৎকৃষ্ট গল্প। লেখিকা এই গল্পে পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর লোকের একটি নিখুঁত এবং অবিকল গার্হস্থ্য চিত্র অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। অধিকাংশ গল্পেই লেখিকা লিখনভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও রচনাশক্তি প্রশংসনীয়।
>
> গ্রন্থেব কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

করুণা দেবীর আশ্রম। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায এণ্ড সন্স্। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬০।
সূচি : করুণা দেবীর আশ্রম, ক্ষমতার জয, পাহাড়ের পথে, গোলাপ সিংহ, স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল, দীপ্তি, বজ্র-ঝঙ্কার, শঠে শাঠ্যং, কোন রোগ?, জামাইবাবু।

মনীষা। শৈলবালা ঘোষজায়া। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮০।
সূচি : মনীষা, আদেশ-পালন, কার্য্য-কারণ, লাফো, রুদ্রকান্ত, দাদা-মশায়ের বে (কথায় কথায় দ্বন্দ্ব!)

স্মৃতি-চিহ্ন। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। শিশির পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৮, [৪]।
সূচি : শিশুর স্মৃতি, দুষ্টু ছোট ভাই, নাৎনী, আয়েসা।
মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩০ সংখ্যায় গল্পসংকলনটির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে সেটি মুদ্রিত হল :

> **স্মৃতিচিহ্ন**। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০।
> এই পুস্তকখানিতে লেখিকা মহাশয়ার চারিটি গল্প অথবা সামাজিকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের স্মরণ হয়, কয়েকমাস পূর্ব্বে এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড আমরা কলিকাতার রাস্তায় দেখিয়াছিলাম। সেই প্লাকার্ডে যেন লেখা ছিল ইহা ইন্দ্রিয়লালসা, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতির জ্বলন্ত-চিত্র। প্লাকার্ডের নকল রাখি নাই, স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। এই প্লাকার্ড পড়িয়া অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জা অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা পুরুষেরা দুইটা পয়সার জন্য অনেক সময় নানারূপ দুষ্কার্য্য করিয়া থাকি ;—তাহা সহ্য হয়। চুরি, ডাকাতী, জাল, মিথ্যা মোকদ্দমা করি, তাহা পেটের দায়েই করি ; এবং মদনানন্দ মোদক জাতীয় উপন্যাস লিখি—তাহাও ঐ কারণেই। কিন্তু একজন পুরমহিলাকে ওরূপ কার্য্য করিতে দেখিলে, লজ্জা রাখিবার যে ঠাঁই থাকে না। সম্প্রতি সমালোচনার্থ পাইয়া বহিখানি পড়িলাম ; পড়িয়া, আমাদের মন হইতে সে গ্লানি বিদূরিত হইল। প্রথম গল্পটিতে ব্যভিচার ভ্রূণহত্যার উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু উহা ঐ সকল কদর্য্য ব্যাপারের জ্বলন্ত চিত্র নিশ্চয়ই নহে। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, গল্পের একজন পাত্রী (লেডি ডাক্তার) ঐরূপ দুষ্কার্য্যকারী একজন পুরুষের প্রতি কষিয়া চাবুক চালাইয়াছেন ;—কোথাও মদনানন্দ মোদকের ছিটাফোঁটা পর্য্যন্ত নাই। —তবে, এ রচনাটিকে ঠিক গল্প বলা যায় না এ কথা যথার্থ, অনেকটা বক্তৃতার মতই। অপর তিনটি গল্প সুখপাঠ্য।

না ট ক

মোহের প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। [ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে]। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩২০। পঞ্চম অঙ্ক : পঞ্চম দৃশ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি।
উৎসর্গ : নমো নারায়ণায়। কল্যাণীয় স্নেহের সোদর, শ্রীমান্ কমলকুমার নন্দী দীর্ঘজীবেষু। শুভার্থিনী—তোমার—নূতন দি।

শি শু সা হি ত্য

রঘু সর্দার। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী। রত্নপ্রভা, সাহিত্য-ভারতী। দাম—দেড় টাকা মাত্র। দেব সাহিত্য-কুটীর। ২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। রাখী পূর্ণিমা ১৩৫৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪৫।
সূচি : রঘু সর্দার, ভূমিকম্প, গবেষণা, বিদায়-গ্রহণ, সৎসাহসের পুরস্কার, নিরঞ্জন সর্দ্দার, বোকার টুপি।

'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে আছে :

> আমাদের দেশে যে-সব চিন্তাশীল মনীষীরা কথা গেঁথে-গেঁথে সাহিত্যের সু-উচ্চ প্রাসাদ তৈরি করে তার উপর থেকে নানা ভাবে, নানা দিকে, নানা পথের সন্ধান দেখিয়ে দিয়েছেন,—বহুখ্যাত সুলেখিকা শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁহাদের অন্যতম। তাঁর অমর লেখনী আজও যে স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের চোখের সম্মুখে সোনার দুয়ার খুলে দিতে পারে, এ বইখানি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
>
> কোন উপায়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ সুগম করে নেওয়া যায়, বাংলার তরুণেরা এই পুস্তকে তারই ইঙ্গিত ও প্রেরণা পাবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
>
> বিনীত
> প্রকাশক,
> দেব সাহিত্য-কুটীর

জয়পতাকা। শৈলবালা ঘোষজায়া। দেব সাহিত্য কুটীর। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের চতুর্বিংশ গ্রন্থ। পৃষ্ঠাসংখ্যা : [৪], ৮৪। সচিত্র।

বা রো য়া রি উ প ন্যা স

ভাগের পূজা। [আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। সমবেতভাবে লিখিত উপন্যাস। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ শৈলবালা ঘোষজায়া লিখিত। জলধর সেনের ভূমিকা, 'যমুনা'-সম্পাদক চারুচন্দ্র মিত্র-লিখিত 'দুটো কথা' এবং বিজয়রত্ন মজুমদারের লেখা 'নিবেদন' সহ। উৎসর্গ : বঙ্গসাহিত্যে অমর কীর্ত্তি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৫২।

অন্যান্য যাঁরা এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ লিখেছেন তাদের নাম : শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীমতী সরসীবালা বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীমতী চারুবালা বসু, শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন, শ্রীমতী লীলা দেবী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীমতী স্নেহশীলা বসু চৌধুরানী, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ভোটযুদ্ধের জের

(নক্সা)

১

প্রলয় গ্রামের প্রাচীন পত্তনীদার-গোষ্ঠী বহু সরিকে বিভক্ত হইয়া এখন দুর্ব্বল। ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা ও মামলা-বিলাসিতা বাবদ ঋণের দায়ে কাহারও কাহারও মাথা বিকাইয়া আছে। তবু পত্তনীদার! অতএব জমিদারী সমৃদ্ধ করিতে হইলে যে সকল সুকৌশল,—অর্থাৎ পরস্বহবণ-প্রতিভা প্রভৃতি আবশ্যক, এই পত্তনীদার গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য দক্ষতায় সুনিপুণ ছিলেন। এই দক্ষতাই ছিল, তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব। অবশ্য জবরদস্ত প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়িলে, অর্থদণ্ড লাগিত অতি বিশ্রী রকম।

এ হেন পত্তনীদার গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিদ্বয় যখন কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছেন শোনা গেল, তখন গ্রামের লোক বিস্ময়বোধ করিল। বোঝা গেল, তাঁহাদের পত্তনী মহল-রূপ মহাসাম্রাজ্যের বাহিরেও যে এ পৃথিবীর কিঞ্চিৎ অংশ আছে, সেটা এবার তাঁহারা মানিযা লইলেন।

এই অভিনব সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। প্রজাকুল সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইল! যাহারা প্রজা নয়, তাহারা কৌতুকবোধ করিল।

প্রধানদ্বয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু অমর চক্রবর্তী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক, এতদিনে বাবুদের বোম্বেটে বখাটে ছেলেদুটির হিল্লে হ'ল।"

সবিস্ময়ে সত্যানন্দ মুদি বলিল, "কি রকম?"

চক্রবর্তী হুঁকায় টান দিয়া বলিল,—"চুক্তি হ'য়ে গেছে, কংগ্রেসকে হারাতে পারলেই, ওদেব ছেলেদুটি—ওপরওলা জমিদারের এষ্টেটে দেওয়ানী পাবে।"

যদু ময়রা বলিল,—"জমিদারের ভাগ্য ভাল। এমন সব গুণমণি চোট্টারাজ দেওয়ানেব হাতে পড়লে সে এষ্টেট তিনদিনেই ডানা মেলে উড়ে যাবে।"

"সে কি তোর দোকানের সন্দেশের খোলা?"

"হ'তে কতক্ষণ? উঠতি মূলো পত্তনেই চিনে রেখেছি মশাই!"

মধু গয়লা ছানার বাঁক কাঁধে তুলিতে তুলিতে করুণ স্বরে বলিল—"আমাদেরই মরণ। মানীর মান রাখতে হবে। দেব একটা ভোট ওদের। অত ক'রে বলছেন যখন—কিন্তু বাকীটা—"

"বাকীটা নিয়ে বাহাদুরী কর্ত্তে যাসনি বে, ওদেরই দিস। তিন তিন টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে তোদের গাঁয়ে গাঁয়ে ভোট সেধে এসে, বাবুরা ওপরওলা জমিদারের ম্যানেজারকে ফর্দ্দ ধরিয়ে দিয়েছে নগদ দশ দশ টাকার। একটা ভোট হাতছাড়া হয় তো, সবাইকার 'ছাদ্দ' করবে।"

"বলেন কি মশাই, তিন তিন টাকার ট্যাক্সি ভাড়া,—হ'য়ে গেল দশ দশ টাকা?"

"দালালির মেহনৎটা পোষানো চাই বই কি?"

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল—"পত্তনী স্বত্বের আইন রে বাপু, আইন! ঘরের নাবালক, বিধবা আর বোকা-সোকা সরিকগুলোকে ফাঁকি দিয়ে খারিজ সেলামি থেকে বাগানের ফল-পাকড়টা পর্য্যন্ত গ্রাস করা এবং বাগে পেলেই পরহিতৈষণার জাক দেখিয়ে ঐসব ট্যাক্স! মানী লোক বলে একেই!"

"জমিদার সন্দেহ করবেন না?"

"নিঃসন্দেহে।"

"তারপর? বাবাজীবনদের দেওয়ানী পদলাভ?"

"চিন্তার বিষয় বটে।"

২

নিরীহ সরল দরিদ্র কৃষক-কুলের সশ্রদ্ধ ত্রাস-বিস্ময় উৎপাদন করিয়া একদিন মহাসমারোহে ভোটযুদ্ধ শেষ হইল।

কংগ্রেস অনেকেব মন ভাঙাইয়াছিল। অথবা ঘা খাইয়া অনেকেব মন পূর্ব্ব হইতে ভাঙা ছিল। পত্তনীদারদের সম্মান লঙ্ঘন কবিযা, অনেকে বিপক্ষ দলে যোগ দিল,—এমন কি, প্রধানদ্বয়ের প্রাধান্য নিঃশব্দে অগ্রাহ্য করিবার মত দুই চারিজন বিদ্রোহী সরিকদের মধ্যেও দেখা গেল।

এই সবিকদের মধ্যে যাহারা জবরদস্ত এবং পুরুষ, ক্ষমতার অভাবে প্রধানদ্বয় তাঁহাদের বিনাবাক্যে ক্ষমা কবিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই দলে ছিলেন এক পতিপুত্রহীনা নিরপেক্ষ নারী। কংগ্রেস, কাউন্সিল কিছুই তিনি বুঝিতেন না ; কিন্তু প্রধানদ্বয় মধ্যস্থ সাজিযা উর্দ্ধতন জমিদার হইতে দেশের ও দশেব সঙ্গে শঠতা, চাতুবী, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায যাহা অসাধু উপায়ে উপার্জ্জন করিতেছেন সেগুলার খবর টের পাইলেন। ঘৃণায তিনি ইহাদের কার্য্যপদ্ধতির সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কোন পক্ষকে ভোট দিলেন না।

অপমান-ক্ষুব্ধ প্রধানদ্বয় পরামর্শে বসিলেন।

অচিরাৎ জানা গেল বিদ্রোহীদের প্রবল নির্য্যাতন সুরু হইয়াছে। ভোট ব্যাপারে যাহাবা স্বাধীন বিবেচনাব বশবর্ত্তী হইয়া প্রধানদ্বযেব খাতিব লঙ্ঘন করিযাছিল, তাহাদের কাহারও ভিটা উচ্ছেদ, কাহারও জমিজমা খাস, কাহারও খাজনা-বৃদ্ধি হইল। কাহারও সপ্ত পুরুষানুক্রমিক ব্যবহৃত পথ বন্ধ হইল, কাহারও ঘাট বন্ধ হইল। আরও কত কি হইল, তাহা না বলাই ভাল।

প্রজাদের হাহাকাবে অপ্রধান সরিকগণের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া প্রধানগণের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিল। বিধবা সরিকও সসম্মানে আপত্তি জানাইলেন।

পুরুষ সরিকগণের প্রতিবাদ সসম্মানে রক্ষিত হইল। কিন্তু পতিপুত্রহীনা সরিকের মূঢ়তা-স্পর্দ্ধায় প্রধানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন! চক্রবর্ত্তী-কথিত সেই 'ছান্দ' ব্যাপারটা এই অসহায় দুর্ব্বল নারীর উপর চালানই কর্ত্তব্য স্থির হইল!

তুমুল বিক্রমে গুপ্ত মন্ত্রণা চলিল। ভোটযুদ্ধের যোদ্ধারা এবার বিধবা ভ্রাতৃবধূ বধের জন্য বীরদর্পে তাল ঠুকিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন!

হায় ভোট! অমানুষের হস্তে তুমি কি সাংঘাতিক মারণাস্ত্র! বিধবার সামান্য অংশের কতকগুলা শাঁসালো বিষয় অকস্মাৎ দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে বাজেয়াপ্ত অর্থাৎ প্রধানদ্বয়ের জঠরগত হইল। খারিজ সেলামি ইত্যাদি অনির্দ্দিষ্ট আদায়ের সমুদয় অংশ 'ডানা মেলিয়া' শূন্যে এমন অদৃশ্য হইল যে, সেগুলার কোন চিহ্ন কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না। শেষে দেখা গেল—বিধবার ক্ষুদ্রতম বিষয়ের ক্ষুদ্রতম অংশের ধান-খড় কয়টি রাখিবার স্থান সেই বিশাল পত্তনীদার গোষ্ঠীর সুবৃহৎ বাড়ীর মধ্যে কোথাও এতটুকু নাই। অজুহাত—ইঁদুর নামক এক ভয়াবহ প্রাণী নাকি বিধবার ধানের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ী, দালান খাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

কোনও দয়ালু প্রতিবেশিনী পরামর্শ দিলেন,—"নিজের একটা গোলাঘর করাও।"

খরচপত্র করিয়া অত কষ্টে সেই ব্যবস্থার চেষ্টা হইল। বিধবা জানিতেন না,—'ছাদ্দ'-কর্তৃগণ সে বিষয়েও প্রস্তুত হইয়া ওৎ পাতিয়া আছেন। তাঁহাদের উদার দৃষ্টি সর্ব্বত্র।

বিধবার যে কর্ম্মচারী দুইটি এতদিন বিশ্বস্ততার সহিত বিষয় রক্ষা কবিতেছিল, এইবার গোপনে ঘুষ খাইয়া তাহাদেব একজন বিশ্বাসঘাতক হইল। দরাজ হাতে বড় বড় চুরি আরম্ভ করিল। প্রধানগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। বিধবা ঠকিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মালমশলা লইয়া মিস্ত্রীরা যখন গোলার বেদী বা তলা গাঁথিতে আসিল, তখন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচাবী আসিয়া পরম ভালমানুষীর সহিত জানাইল—"বড়বাবু বলছেন ওখানে আপনার গোলা কবতে দেবেন না।"

সেদিন ভৈমী একাদশীর উপবাস। বিধবা জপাহ্নিকে নিমগ্ন ছিলেন।

সংবাদ শুনিয়া অতি ক্লেশের সহিত মনকে বাহ্য ব্যাপারে ফিরাইয়া আনিলেন। ভাবিয়া বলিলেন,—"সেকি? আপনি যে বলেছিলেন—বড়বাবু ওইখানে গোলাবাড়ীর মধ্যে অপর সবিকদের গোলার পাশে আমার গোলা করবার জায়গা নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"সে ত দু'মাস ধরে বলাবলি ক'রে রেখেছেন। আজ মাটী খুঁড়ে মিস্ত্রীবা যেই গাঁথতে বসেছে অমনি বললেন, 'দেওয়া হবে না'।"

হাসিয়া বিধবা বলিলেন,—"নইলে সুচারুরূপে জব্দ করাটা হবে কেন? সেদিন ধানগুলি আমার টেনে ফেলে দিলেন, বৃষ্টির জলে ভিজে বিস্তর লোকসান হ'ল। ওদের উৎপাতের ভয়ে খড়গুলি আধা দামে বিক্রী করতে পথ পেলাম না। রাঁধতে ঠাঁই পাইনি, খেতে ঠাঁই পাইনি, দাঁড়াতে স্থল কূল দেননি। সেসব দিনের কথা যারা না জানে, তাদের না জানানই ভাল। আজ এ বিচিত্র নয়। তাহ'লে এখন?"

"মিস্ত্রীদের মজুরি মিটিয়ে বিদেয় দিন।"

"জায়গা কোথাও দেবেন না?"

"না।"

"কোথা—ও না?"

"না। সতীশবাবুও একটা নতুন গোলার তলা তৈরী করবার জন্য মিস্ত্রী আনিয়েছেন—"

"ওহো, সতীশ ঠাকুরপো কলকাতা থেকে এসেছেন, নয়? তাঁকে বলুন গিয়ে, তিনিই আমার গোলার জায়গা একটা ঠিক ক'রে দিন। জানি, তিনি মানুষ—মানুষের ন্যায্য দাবী তিনি স্বীকার করতে পেছ-পা হবেন না; সে ছাতি আছে তাঁর।"

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে কর্ম্মচারী বলিল, "সতীশবাবুকে বলব? সতীশবাবুকে?"—বেচারার চক্ষু বিস্ফারিত!

"হ্যাঁ। সে ভদ্রলোকের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আছে। তাঁকে জানান চাই।"

হঠাৎ উষ্ণ হইয়া—যেন কোন গুপ্ত আঘাতে আচমকা রুষ্ট হইয়া কর্ম্মচারী বলিল, "ওই বুড়ো-ঘুঘু বিরূপাক্ষবাবুটি কি কম? আপনার একটা গোলা হচ্ছে দেখে ওঁর বুক চড়চড়ানি যেন সব চেয়ে বেশী। কাল সতীশবাবু আসা-ইস্তক তাঁকে কেবল আপনার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ওস্কাচ্ছেন, 'সতীশ, তুমি এইখানে গোলা কর। সতীশ, এই জায়গাটা সব চেয়ে ভাল।' যতই উনি খোঁচাচ্ছেন, সতীশবাবু ততই বলছেন, 'না, ওখানে বৌদির গোলা হবে ঠিক হয়েছে, ও জায়গা আমি নেব না।—' বিরূপাক্ষবাবুর ততই ধড়ফড়ানি বাড়ছে। শেষে মোটা তরফের তহশীলদারকে ডেকে এনে আপত্তি দেয়ালেন; —কি না—'এখান দিয়ে কালে ভদ্রে আমাদের মজুররা দু এক বোঝা খড় বয়ে নিয়ে যাবে, তার জন্যে এ জায়গায় গোলা হ'তে দেব না'।"

"বুঝুন,—এই এক মনোবৃত্তি আর ওই এক মনোবৃত্তি! থাক, যাতে ওঁরা সন্তুষ্ট হন, তাই করতে দিন। আমি মনে রাখতে চাই, ওঁরা বড়, আমি ছোট। অন্য জায়গা দেখে নিন।"

ঠিক সেই সময় নগদী অর্থাৎ পাইক বিক্রমচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইল। রোষ-তিক্ত কণ্ঠে বলিল "বেশ মা, ছোট আছেন, ছোট হ'য়ে ঘরে থাকুন। ছোট বলে আপনাকে কি মাঠে ঘাটে খেদিয়ে দিতে হবে?"

"হবে বৈ কি। দেশটা যে বাংলা। এখানে নিরাশ্রয়, অসহায়, গরীব আর বিধবাকে ফাঁকি দেওয়াই পরম পুরুষার্থ। অন্ততঃ আমার পূজনীয় গুরুজনদের কাছে তো বটেই।—"

বিক্রম ঘৃণার স্বরে বলিল, "তাই দেশী মিস্ত্রীগুলা হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর পাঞ্জাবী মিস্ত্রীগুলো 'ছি ছি' করছে। বলছে 'এই তুচ্ছ ছুতা নিয়ে বাড়ীর আওরাৎ লোকের সঙ্গে বাবুরা বিবাদ করছে! এরা বাবু? আমাদের দেশ হ'লে লোকে এদের এমন শিক্ষা দিত যে, এরা কখনো ভুলত না'।"

"তাদের বলে দাও, এ দেশে সেরকম লোক খুব কম আছে। তাই দেশের অবস্থা এই। বাংলা বাংলাই,—পাঞ্জাব নয়। সেখানে একটা অসহায় স্ত্রীলোককে লাঞ্ছিত হ'তে দেখলে গ্রামশুদ্ধ পাঞ্জাবী রাগে ক্ষেপে ওঠে,—এখানে একটা অসহায় স্ত্রীলোককে লাঞ্ছনা করার সুযোগ পেলে গ্রামশুদ্ধ বাঙালী আহ্লাদে নেচে ওঠে। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম, ওই সতীশ ঠাকুরপোর মত আছেন জনকতক। যাও, তাঁকে জানাও।"

বিধবা আবার পূজায় মন দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল!—

৩

আধ ঘণ্টা পরে কর্ম্মচারী আবার ফিরিয়া আসিয়া ডাকাডাকি জুড়িল, "মা,—অ মা, ঘরে আছেন?"

পূজার্চ্চনা তখনও শেষ হয় নাই। বিধবা আসনে ফিরিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

কর্ম্মচারী বলিল, "সতীশবাবু এসে আপনার জন্য জায়গা খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু হ'ল না। আপনার নাম ক'রে যেখানেই হাত দিতে যাচ্ছেন, সেইখানেই আপত্তি। সতীশবাবুর তর্কাতর্কির তাড়ায় এতক্ষণে ওঁরা বলছেন পোড়ো গোয়ালবাড়ীতে, কিংবা পায়খানার ওইদিকে আপনার গোলার জন্য জায়গা দিতে আপত্তি নাই।"

"সেখানে ওদের কারুর গোলা নাই। একা আমার গোলা থাকলে ধান চুরি যাবে, কিংবা কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নির্ব্বিঘ্নে আগুন লাগিয়ে দেবেন।"

পরম নিরীহভাবে কর্ম্মচারী বলিল, "তাহ'লে তো আপনার গোলা হয় না। সতীশবাবু কোথাও জায়গা আদায় করতে পারছেন না। এঁরা এত মতলববাজ আগে জানতাম না।"

গুটি গুটি চরণে অন্য এক সরিক-পুত্র প্রবেশ করিল। কলেজ ফেরৎ বটে, কিন্তু বাড়ীতে বেকারভাবে বসিয়া থাকার ফলে বহুবিধ সদগুণে বিভূষিত। সঙ্কীর্ণতা, নীচতা ও কুটিলতার জীবন্ত প্রতীক সেই ছেলেটিকে পাড়ার ছেলেরা 'ঘড়িয়াল ঘুঘু' বলিয়া ডাকিত।

ঘুঘু খুব মোলায়েম সুরে বলিল, "সতীশকাকা পোড়ো পাইখানাবাড়ীতে গোলা বসাচ্ছেন! তিনি সেখানে গোলা বসালে আপনার বসাতে আপত্তি নাই তো? বলুন তাহ'লে, জ্যাঠামশাইদেব বলি,—আপনাকে ওইখানে জায়গা দিতে আপত্তি নাই।"

বিধবা সরল চিত্তে তাহা বিশ্বাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হ্যাঁ, সতীশ ঠাকুরপোর গোলা যেখানে যাবে, আমার সেখানে যেতে আপত্তি নাই।"

সহসা দৃঢ়স্বরে কে বলিল, "কোথাও যেতে হবে না আপনাকে। ওইখানেই জায়গা ঠিক ক'রে দিলাম।"

সকলে চমকাইয়া চাহিয়া দেখিল,—স্বয়ং সতীশবাবু উপস্থিত।

উপযুক্ত দেবর। তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে মাথার কাপড়টা চোখ পর্য্যন্ত নামাইয়া বিধবা বলিলেন, "আপনাব গোলা পোড়োবাড়ীতে হচ্ছে?"

"কে বল্লে?"

"এই যে—এই ছেলে বলছে।"

দৃঢ় স্বরে সতীশবাবু বলিলেন, "মিথ্যে কথা। কেউ আমরা পোড়োবাড়ীতে যাবো না। আমার জন্যে যে জায়গা ওঁরা দিয়েছিলেন, সেই জায়গা আপনাকে আমি দিলাম। আমি নিজে ওইখানেই আলাদা জায়গা দখল করলাম।"

"তবে যে—", বিধবা হতবুদ্ধি হইয়া জ্ঞাতি-পুত্রের দিকে চাহিলেন। এও কি ছলনার ফাঁদে ফেলিতে আসিয়াছিল?

শিকার-হারা বকের মত তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরাইয়া জ্ঞাতি-পুত্রটি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া

দ্রুত অদৃশ্য হইল। অন্যান্য জ্ঞাতির পুত্র-কন্যাগণ নিকটে ছিল। তাহারা মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া হাসিতে লাগিল।

গোলাবাড়ীতে কর্ণিক হাতে তখন মিস্ত্রী-মজুরের দল গোপনে বলাবলি করিতেছিল —"ছি ছি,...!"

তাহাদের বাকী মন্তব্য উহ্য থাকাই ভাল!

হায় ভোট!—*

পূজারিণী

* শ্রীমতী সুদক্ষিণা ঘোষের আনুকূল্যে প্রাপ্ত।